পশ্চিমের জানলা

দেবেশ দাশ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা : বারো

আমার

প্রথম

পাঠিকাকে

এই লেখকের ঃ

ইয়োরোপা

প্রথম ধরেছে কলি

রাজোয়ারা

অর্ধেক মানবী তুমি

রোম থেকে রমনা

রাজসী

রক্তরাগ

সেই চিরকাল

সুদূর বাঁশরী

শ্রীমতী কমলা দাশ

আর মানবিকতার সীমানা নেই। সেই মানবিকতার টানে পশ্চিমের পানে অহরহ তাকিয়ে থেকেছি। চেয়েছি নিজের দেশের মানুষকেও পশ্চিমের মত দাম দিতে। সম্মান দিতে।

সেইজন্যেই ত তন্দ্রাহারা চোখে আমাদের এগিয়ে যাওয়াটুকুর কথা ভাবছি।

গভীর রাতে জানলার বাইরে অন্ধকার ভেদ করে কিছু দেখা যায় কি না দেখছি। কোন্ পথে প্রথম দেখব ভোরের আলো? হিমালয়ের চূড়ার চেয়ে উঁচু এই শূন্য থেকে কতখানি আলো প্রথমে নজরে পড়বে? বিরাট আমার দেশের বিপুল সংখ্যার মানুষ এতদিন অশিক্ষায় অস্বাস্থ্যে অন্ধকারে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম এখন ছুটেছে, তবু টুটেনি তন্দ্রা পুরোপুরি। তার জন্যে চাই আলো, আকাশ-ভরা ঘুম-হরা আলো।

পূব মহাদেশের দিকে আসতে আসতে সন্ধ্যায় দেখেছিলাম নীচের নীল আকাশ গাঢ় বেগুনি হয়ে গেল। তারপর চাঁদ এল দুধের বানে শূন্য ভাসিয়ে। তারাগুলি ক্রমে ক্রমে জেগে উঠল। আকাশ ভরে উঠল হাসতে। আর এখন মনে হচ্ছে পূব আকাশে অরুণোদয়ের দেরি নেই।

ব্যাকুল হাত দিয়ে দু'পাশের জানলারই পর্দা সরিয়ে রেখেছি।

॥ সমাপ্ত ॥

সূচী

পশ্চিমের জানলা

আমার পশ্চিমের জানলাটা সব সময়ই খোলা।

আজ রাতেও ছিল।

এরোপ্লেন রাতের বুক চিরে হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরে আকাশের মধ্যে গুমরে-ওঠা কান্নার মত একটু আওয়াজ। আর কোন শব্দ নেই। নেই বাতাসের এতটুকু দোলা। অসীমের মধ্যে আমরা যেন ভেসে আছি। নিঃঝুম নিস্পন্দ। কে বলবে যে সুপার কনস্টেলেশন প্লেন মিনিটে ছ'মাইল করে পাড়ি দিয়ে চলেছে।

নীচে পৃথিবী ঘুমোচ্ছে। উপরে তারাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্লেনের ছোট ছোট আলোর ফোঁটাগুলো মিটমিট করছে। যাত্রীরা কেউ জেগে নেই। শুধু আমি বাদে।

অনেক ক্ষণ থেকে শেষ রাতের হাল্কা হাসি দেখছি। এই মিনিটে এখানে ছিল ভোর সাড়ে পাঁচটা। আর তার মায়াময় আলো-আঁধারি। পনের মিনিটে আরো নব্বই মাইল এগিয়ে গেছি। তবু সেই সাড়ে পাঁচটার আলো-আঁধারি। ঘড়ি যে কথা বলছে, আকাশ কিন্তু সে কথা বলছে না।

পৃথিবী ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে ঘড়ির কাঁটাকে অস্বীকার করছে। আমার পশ্চিমের জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিলাম ভাল করে। এই রহস্যটা ভাল করে অনুভব করছি। আর ভাবছি।

আমার ওপাশের সীটে একটি তরুণী ঘুমোচ্ছিলেন। একেবারে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। কিন্তু বোধ হয় পাশ ফিরতে গিয়ে ঘুম ভেঙে

গেল। হাই তুলতে তুলতে নজর করলেন যে আমি জেগে আছি। একমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। মৃদু কণ্ঠে তিনি আমায় সময় জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, ভোর সাড়ে পাঁচটা।

অবিশ্বাসে তিনি হেসে উঠলেন। মিষ্টি হেসে বললেন—চমৎকার ঠকাচ্ছেন ত। এই দেখুন আমার ঘড়ি বলছে এখন সাড়ে আটটা।

এতক্ষণে ওর দিকে ভাল করে তাকালাম। বোম্বাইয়ে রাত বারটায় যখন সবাই ঘুমে ভরা চোখে প্লেনে উঠল তখন কে আর সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়েছিল? এখন ভাল করে দেখলাম। মানে, পুরোপুরি তাকালে অসভ্যতা হবে। অথচ চোরা চাহনী হানলেও হবে অভদ্রতা। দুটোর মাঝামাঝি কিছু একটা করাই হচ্ছে নাকি স্বাভাবিক।

একেবারে যাকে বলে বসন্তের রূপসী। হালের বিলেতী পত্রিকায় তার বর্ণনা পড়ে ধন্য হয়েছিলাম। এইবার চোখে দেখলাম। মৃদু সুরভির স্রোতের মধ্যে তিনি থাকবেন ভেসে। তাঁর লিপস্টিক হবে গোলাপী, কিন্তু মধুর মত একটু 'ট্যান্' অর্থাৎ রোদে পোড়া রঙের। খড়ের টুকিটাকি দিয়ে সাজানো হবে কেশবাস আর ভ্যানিটি ব্যাগ। পরণে থাকবে সাদা সুতীর শার্ট-ঘেঁষা জ্যাকেট। চরণে হাল্কা রঙের দরবারী চপ্পল। মাথার চুলে থাকবে রাইনস্টোনের পিন। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাসন্তী সুন্দরী নিজেও ঝকমক করবেন।

ব্যস্! খুব সোজা অনুপান।

মিলে গেল বর্ণনাটা। প্রায় হুবহু।

অতএব ওকে ঝকমক করতে দেওয়াই উচিত। তা না হলে সহযাত্রীর কর্ত্তব্যে গাফিলতী হয়ে যেতে পারে।

হেসে বললাম—আপনার ঘড়িটা আমার মত পেছিয়ে নিয়ে লোক্যাল টাইম করে নিন। এই দেখুন আপনার বয়েস সঙ্গে সঙ্গে তিন ঘণ্টা কমে গেল।

উনিও হেসে উঠলেন—বাঃ। অ্যাজ ইজি অ্যাজ অল ছাট? এত

সহজেই এত সব ঘটে যায়? আপনি বুঝি রাত জেগে জেগে তাই নিজের বয়েস কমিয়ে নিচ্ছেন?

এর পরেও যদি আমি একটু শিভ্যালরী না দেখাই তাহলে বৃথাই হবে আমার আধুনিক লেখাপড়া। মিছে হয়ে যাবে নতুন স্বাধীন দেশের লোকের ইন্টারন্যাশন্যাল মেকআপ।

মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে বললাম—আমি তাহলে রাতের পর রাত জেগে থাকতে রাজী আছি—যাতে এমনি করে আপনার বয়েস পাঁচ বছর কমে যায়।

মহা মজার ব্যাপার ত'। খুশী হয়ে উনি প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠেন আর কি। বললেন—সত্যি? পাঁচ বছর কমিয়ে দেবেন আমার বয়েস? উঃ সে কেমন একখানা কাণ্ড হবে!

ওকে এত খুশী দেখে আমিও খুশী হয়ে উঠলাম। মনের আগল কেমন করে আলগা হয়ে গেল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম—হ্যাঁ, পাঁচ বছর। আচ্ছা, বলুন ত' পাঁচ বছর আগে আপনি কোথায় ছিলেন এমন দিনে?

তরুণীর মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল। চট করে তাঁর নিজের পাশের জানলার পর্দাটা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলাম যে চোখদুটি তার কেমন যেন ছলছল করছে। মুখে পড়েছে একটা ছায়া।

তার পরেই আবার তিনি সহজ ভাবে কথাবার্তা শুরু করলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমি সারা ইয়োরোপ ঘুরতে যাচ্ছি নাকি। আমেরিকাতেও যাব নাকি। এমনি সব কথা। নেহাৎই মামুলী ভদ্রতার বাঁধা বুলি।

কিন্তু সে কথার মধ্যে নেই রঙ, নেই কোন ভাব। সুর যে কেটে গেছে তা বুঝতে পারা শক্ত নয়। দুয়েকটা কথার পর আমরা দুজনেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বেশ খানিকটা পরে আবার ওর দিকে চাইলাম। না, উনি ত ঘুমিয়ে পড়েননি। বাইরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মুখখানি গম্ভীর। চিন্তার কোন্ গভীরতার অতলে তলিয়ে গেছে বেচারী।

প্লেনে একটুখানিও দোলানী নেই। নেই কণামাত্র অশান্তির ছায়া। পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের উপর যেন ভেসে রয়েছি আমরা। কিন্তু আমার সামান্য একটা প্রশ্নের ধাক্কায় তরুণীকে স্মৃতির কোন্ 'এয়ার পকেটে'র মধ্যে টেনে নামিয়ে আনলাম?

মন সহানুভূতিতে ভরে গেল। আমিও আমার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলাম। সেই পশ্চিম পৃথিবী। উনিশ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য তীর্থযাত্রা করেছিলাম।

কিন্তু শুধু লেখাপড়াই নয়। কত জানাশোনা, কত মানুষের মনের পরিচয়। অন্তর দিয়ে অনুভব। আকাশে যেন মাথা উচু করে চলেছি। স্বপ্ন দিয়ে যেন স্বর্গকে ছুঁয়েছি। পৃথিবী এড়িয়ে, পৃথিবী ছাড়িয়ে। আজ আর স্বপ্ন দেখবার না আছে সময়, না পরিবেশ। মাটিতে পা মেপে মেপে হাঁটতে হয়।

তা ছাড়া আরো কথা আছে। আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব অনেক বেশী। অনেক বেশী জীবনের কাছে দায়, মনের কাছে দাবী। আজ জীবনের যে উজ্জ্বল বিকাশ, যুদ্ধের ধ্বংসকে ছাপিয়ে যে সৃজনশীল শক্তিকে পশ্চিম জগতে দেখব তার ছবি তুলে নিয়ে যেতে হবে নিজের দেশে। শুধু শোভা নয়, চাই শক্তি। শুধু স্রোত নয়, চাই উৎস। তারই সন্ধানে আজ আমার অন্বেষী মন। পশ্চিমের জানলায় তৃষিত হয়ে খুঁজছি নতুন ছবি। নতুন জীবনের সংসার-সার্থক-করা জীবনী শক্তির ছবি।

* * * *

তবু সেই ছাত্রজীবনের কথাগুলি ওই জানলার মধ্যে দিয়ে মনের ভিতরে উঁকি মারছে। মনের ভিতরে একেবারে।

হঠাৎ একটা কাহিনী মনে হল। সেই অচেনা স্কচ মেয়েটির কথা। তার ধার এ জীবনে শোধ করতে পারব না। আশ্চর্য! কি করে এত দিন সেই তরুণীর কথা ভুলে ছিলাম?

আমি তখন বিলেতে যে পরীক্ষাটা দিয়েছি সে-ও তার 'হোম' সংস্করণ পরীক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ পাস করলে সে নিজের দেশেই একই রকমের চাকরিতে ঢুকতে পারবে। দেখা হয়েছিল শুধু পরীক্ষার বিরাট হলে। মামুলী কয়েকটা কথা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। নাম বিনিময় পর্যন্ত নয়।

তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মাসখানেকের মধ্যে। হাইল্যাণ্ডসের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়। আমার মত সে-ও ইয়ুথ হোস্টেলের সভ্য হয়ে সস্তায় পায়ে হেঁটে পাহাড় চড়ে দেশ বেড়িয়ে নিচ্ছে। আমার মত বয়সে আর পকেটের অবস্থায় এর চেয়ে সস্তায় আর সহজে দেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোথাও নেই।

খানিক দূর পর্যন্ত আমাদের যাবার পথ এক সঙ্গে। পাহাড় চড়াই শেষ হলে সে নেমে যাবে অন্য দিকে একটা গ্রামের মধ্যে, আমি নেমে যাব আরেক দিকে হ্রদের পাশের কুটিরে। সেখানে ইয়ুথ হোস্টেলে রাতে থাকব। পরদিন ভোরে সূর্য আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করব।

একটা খাড়াই টিলার উপরে যাবার সোজা রাস্তা নেই। তার চার পাশ দিয়ে পাক খেয়ে একটা পাকদণ্ডি চলেছে। তাই বেয়ে আমরা চূড়াতে উঠে হাঁফাতে লাগলাম। দুজনেই আমাদের পিঠের ঝুলি নামিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে বসলাম। শুধু মামুলী দুয়েকটা টুকিটাকি কথা। ঝুলি থেকে বের করে আমি দিলাম আপেল। ও তার বদলে দিল জঙ্গল থেকে তোলা রাস্পবেরী ফল।

একটু পরে আমরা আবার উঠে পড়লাম। এবার দুজনে আলাদা আলাদা পথের যাত্রী। সে হঠাৎ আমায় পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করল। কেমন পরীক্ষা দিয়েছি?

ইতস্তত করে সত্যি কথাটাই বলে ফেললাম—তেমন যুৎসই হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আপনি আশা করি ভাল করেছেন?

উত্তরে সে বলল—আমিও বিশেষ ভরসা রাখি না। তবে হ্যাঁ, একটা ভাল লক্ষণ পেয়েছি। হোয়াইট হেদার জানেন ত'?

জানালাম যে জানি। হাল্কা বেগুনি রঙের হেদার অনেকটা আমাদের দেশের বনতুলসীর মঞ্জরীর মত। হাইল্যাণ্ডসের পাহাড়ে অজস্র ফুটে আছে। কিন্তু সাদা হেদাব ত' কোথাও দেখিনি। ওটা নাকি খুব ভাগ্য এনে দেয়। গ্রামের লোকরা ত' তাই বলে।

খুব খুশী ভাব দেখিয়ে সে বলল—হ্যাঁ। সবাই তা বলে। আমার মা-ও এই ভ্রমণে আসবার মুখে সে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে হোয়াইট হেদার যদি পাহাড়ে পাই তাহলে নিশ্চয়ই যেন তা নিয়ে আসি। পরীক্ষা পাস তাহলে নির্ঘাৎ।

হাসতে হাসতে বললাম—খুব ভাল হবে তাহলে। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই সাদা হেদার খুঁজে পাবেন?

চোখ বড় বড় করে সে হাসল। নিজের হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতরে আঙুল ঢোকাল সযতনে। বলল—খুঁজে পাব? খুঁজতে হয়নি মোটেই। সৌভাগ্য একেবারে হাতে তুলে দিয়ে গেল এই ছোট্ট 'স্প্রে' (মঞ্জরী) টুকু। একটা চিহ্নহীন খাড়াই দিয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে একেবারে সামনেই পেলাম সাদা হেদার একটা ঝাড়। তাতে শুধু এটুকু অক্ষত মঞ্জরীই ফুটে ছিল।

অভিনন্দন করলাম। খুব খুশী ভাব দেখালাম—আপনি নিশ্চয়ই পরীক্ষায় খুব ভাল করবেন। নিশ্চয়ই খুব উপরের দিকে হয়ে চাকরি পেয়ে যাবেন।

—আমি কিন্তু আরো বেশি খুশী হব যদি আপনি এই হেদারটুকু নেন।

—না, না। তা কি করে হয়? আপনি পেয়েছেন। আপনাকেই এটা ভাগ্য এনে দিতে পারে। তা ছাড়া আমি আপনার ভাগ্য নেব কেন?

সে কিছুতেই শুনল না। আমি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি। সে আছে তার নিজের দেশে, নিজের বাবা মার সঙ্গে। আরেক বছর যদি তাকে অপেক্ষা করতে হয় কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার নিশ্চয়ই বিলেতে বসে থাকার সময় নেই।

অনেক আপত্তি করলাম। কিন্তু সে আমার হাতে সাদা হেদারটুকু গুঁজে দিল। একটু হাল্কা চাপ দিয়ে হাত মুঠো করে দিল। তার পরই বনহরিণীর মত হাওয়ার বেগে মিলিয়ে গেল উৎরাই পথে।

দৌড়ে ছুটে পিছু নেওয়ার পথ রইল না। অজানা, মাত্র একটুখানি সময়ের অপরিচিতার সহানুভূতির অমর্যাদা করবার ক্ষমতা আমার নেই।

এক দিনেই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আর হোম সিভিল সার্ভিস লিস্ট বের হল। তার নাম খুঁজে পেলাম না। সে নিশ্চয়ই তখন সাদা হেদার মঞ্জরীটুকুর কথা মনে করেছিল। কিন্তু তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারিনি। পথে যেতে যেতে দেখা। ঠিকানা পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি। তার কথা বার বার করে মনে পড়তে লাগল।

মনের জানলায় আরেক জন সহপাঠীর ছবি ফুটে উঠল। লণ্ডন ইউনিভারসিটিতে একসঙ্গে পড়ি। নতুন পরিচয়, কিন্তু যেন কত পুরানো বন্ধু। রাস্তা থেকে জানলায় টোকা দিল।

টুক টুক।

উইগুোটা তুলে ধরলাম। তার মুখ শুকনো। চিন্তার ছায়া তাতে। জিজ্ঞেস করল—দশটা 'বব' (শিলিং) ধার দিতে পার? জামিন দেব অবশ্য।

হেসে জানালাম যে ধার দিতে পারি, জামিন নেব না।

সে মাথা নাড়ল—উঁহু; তাহলে তোমার বন্ধুত্ব হারাব কোন দিন। তার চেয়ে এই ঘড়িটা রাখ।

ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা আধভাঙা। জানি যে তার অবস্থাও আমারই মত। অর্থাৎ মাপাজোখা স্কলারশিপের মধ্যে চলতে হয়। বললাম—জামিন যদি দিতে চাও, এই কাঁটাভাঙ্গা ঘড়ি কে নেবে?

বিদ্যুতের মত জবাব দিল সে। একেবারে হাসির ঝিলিক দিয়ে। বলল—কেন? তুমি নেবে। কারণ তোমার সময়ের তাড়া নেই।

খুচরো দুদিনের ধার অনেকেই নেয়। কিন্তু খুব কম লোকই পরের বিপদে সাহায্য করবার জন্য নিজের দায়িত্বে ধার নেয়। তাও এমন হাসিমুখে। কথায় কথায় বহুদিন পরে জেনেছিলাম যে সে পূর্ব ইয়োরোপের একটি উদ্বাস্তুকে সাহায্য করবার জন্য টাকা নিয়েছিল। কিন্তু এমন হাসিঠাট্টার মধ্যে মিশিয়ে সে খবরটা আমায় তখন দিল যেন সেজন্য তার কোন বাহাদুরি নেই। সে বলেছিল :

বুঝলে ডক, সে বেচারাকে সাহায্য না করে উপায়ই ছিল না। এত দিলখোলা, অথচ এত সোজা শিরদাঁড়া। একটা মানুষের মত মানুষ। একবার ওদের গাঁয়ে কমিশার এসে হাজির। দল বেঁধে 'কলেকটিভ' চাষ কেমন হচ্ছে তার হিসাব সরকারে দাখিল করতে হবে। কিন্তু গাঁয়ের লোক এ ধরনের চাষে বিশ্বাস করে না বলে কিছুই করেনি। কমিশার এসে যখন হাঁকডাক শুরু করলেন তখন কেউ সাহস করে এগোয় না। ফলে গোটা গাঁয়ের উপর জুলুম হবার উপক্রম। তাই লোকটি এগিয়ে এল। ছিল গাঁয়ের শিল্পী, হল সর্দার।

তাকে কমিশার শুধালেন—কই, তোমাদের গাঁয়ের দলবাঁধা খামারে আলুর চাষ কেমন হয়েছে তার হিসাব দাও।

সে হেসে বলল—অতি উত্তম, স্যার, অতি উত্তম। এমন ফলন হয়েছে যে, যদি ভারে ভারে একটার ওপর একটা রাখা যায় তাহলে একেবারে ভগবান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কমিশার সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন —কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ সরকারী আইন-কানুন? ভগবান নেই।

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখিয়ে শিল্পী বলল—ঠিক বলেছেন। আলুও তাই নেই।

বন্ধুর কাছে এই পর্যন্ত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি হেসে উঠলাম। হাসির চোটে মনের মধ্যে ঠেলে-আসা ব্যথাটা একটু যেন চাপা পড়ে গেল।

বন্ধু ব্যাকুল হয়ে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। বলল—তুমি বিশ্বাস করছ না, বন্ধু? তুমি হাসছ!

উত্তরে কি বলেছিলাম আজ ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু সেই কান্না-ছাপানো হাসির মূল্য দিতে চেয়েছিলাম। সেই সামান্য ধারটা শোধ হয়ে গেছে বলে মনে করে নিতে তাকে অনুরোধ করেছিলাম।

এই অনুরোধের ফলে যে বিপদে পড়েছিলাম তা ভোলবার নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি মনে রাখবার মত একটা কথা সে বলেছিল। বলেছিল—তোমার দেশে অনেক দুঃখ আর দীনতা আছে। এদেশের সব জ্ঞান নিয়ে গিয়ে সে সব ঘুচোবার চেষ্টা কর। তাহলেই এই ধারের সুদটা অন্তত শোধ হয়ে গেছে বলে আমি মনে করব।

*　　*　　*　　*

পশ্চিমে যদি কোন দিন না-ও যেতাম তবু জানলাটা খোলা থাকত। যারা শয়নে স্বপনে জাগরণে একেবারে নিখাদ প্রাচ্য তাদেরও মনের অগোচরে পশ্চিমের হাওয়া ভাল লাগে। মনে যে ঢেউ আছে, জীবনে যে আছে গতি, তারই পরিচয়।

এই ধরুন আমার বন্ধু স্বদেশের কথা। যাকে বলে কিনা ঘোর স্বদেশী। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে মনুমেন্ট পর্যন্ত মিটিঙের টুল বইতে আর টেবিল সাজাতে এমন উৎসাহী লোক মিলত না সেকালে। খাঁটি স্বদেশী বললে তার সবটা পরিচয় হয় না। বলতে হবে পুরো বিলেত-বিরোধী। ইংরেজীতে এম. এ. নিয়েছিল। কিন্তু রোজ শোনাত যে ইংরেজী পড়ছে রাজভাষা বলে নয়, শেক্সপীয়রের ভাষা বলে নয়। বার্কের বক্তৃতা গুলে খেয়ে চৌকো টুল চড়ে গোলদীঘি মাৎ করবে বলে। হঠাৎ একবার প্রমাণ হয়ে গেল যে, এ হেন স্বদেশেরও পশ্চিমের জানলাটা খোলা।

একবার স্বদেশ আমার সঙ্গে বড়দিনের ছুটি কাটাতে এল। ছোট্ট মফঃস্বল শহর। নেই রক, নেই রাজনীতি। কাজেই স্বদেশের নজর আমার মোটে একমাসের পুবানো সংসারের উপর এসে পড়ল। এখানে যে স্বরাজ চলছে স্বদেশের দাবি স্বরাজের সঙ্গে তার কোন আদল আসে না।

একদিন সে খোলাখুলিই বলল—দেখ, তোমার বাবুর্চির রান্নার হাতটা খুবই ভাল। কিন্তু হাতটানটা আরো ভাল।

সে সন্দেহ আমারও হয়েছিল। যদিও এর আগে কখনো সংসার চালাতে হয়নি। বাবুর্চিকে জিজ্ঞেসও করেছি যে, আলু পটল মাছের দাম যদি এখানে এত বেশি তাহলে লোকে কি খেয়ে বাঁচে। উত্তরে সে শুধু বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করে সেলাম জানিয়েছে।

একদিন স্বদেশ তাকে জিজ্ঞেস করে বসল—অন্য লোকদের বাড়িতে অনেক কম দামে জিনিস আসে কি করে?

সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স যুগের মানুষ। তাই এর চেয়ে বেশি সরাসরি প্রশ্ন করতে স্বদেশের বেধেছিল। কিন্তু বাবুর্চি আরো এক কাঠি টেক্কা দিয়ে গেল।

বিরাশি সিক্কা একখানা—আঘাত নয়—সেলাম হেনে সে যা বলল তার মানে এই দাঁড়ায় যে, বিদেশে বিভূঁয়ে একলা থাকেন তার সাহেব। মফঃস্বলের জল হাওয়া সুবিধার নয়। কাজেই সাহেবের স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী বাবুর্চি নিজে। অন্য লোকে কত সস্তায় কত খারাপ জিনিস সওদা করে আনে সে খবর রাখবার দায়িত্ব তার নয়।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা সেখানকার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাংলোতে গেছি। ক্লাব নয়। অর্থাৎ 'শপ' বা অফিস-ঘেঁষা কথাবার্তা হল না। একেবারে অন্য একটা জগৎ। বার্নাড শ'র আনকোরা নতুন নাটক থেকে ব্লু ডানিয়ুব বাজনার রেকর্ড পর্যন্ত। লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ যখন ছিলেন গৃহকর্তাও তখন সেখানে ছাত্র ছিলেন। কবিগুরুর সঙ্গে রদেনস্টাইনের বন্ধুত্বের গল্প তিনি বেশ জমিয়ে শোনালেন। এবং তাঁর বাড়িতেই ডিনার সেরে যেতে অনুরোধ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বন্ধুর সংসারে বেহিসাবী বাজার করা সে বন্ধ করতে পারেনি বটে, কিন্তু অযথা রান্না করা এড়ানো চলতে পারে। সেই মতলবে সে হঠাৎ গল্প ছেড়ে উঠে পড়ল। সটান বাড়িতে এসে বাবুর্চিকে রান্না করতে মানা করে ফিরে এল।

রাতে খুব খুশী মনে বাড়ি ফিরলাম। একটা সন্ধ্যা অন্তত ক্লাব আর 'শপ' বাদ দেওয়া গেছে। যদিও ক্লাবের মাথাদের দেশের গল্পই করা হয়েছে। শীতের রাত। নদীর উপরেই বাংলো। জ্যোৎস্নার আলো আর নদী-থেকে-উঠে আসা কুয়াশায় কেমন একটা মোহময় মিলন হয়েছে। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে স্বদেশকে জিজ্ঞেস করলাম—বলত, কোন গানটা বেশি মনে লাগল?

সেদিন দুজনে

দুলেছিনু বনে

ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা ?

অথবা

Do you remember

That night in June

When first we met ?

উত্তরে পেলাম ওর চোখে আগুনের আভাস। কলিযুগে ব্রহ্মতেজটা যদি ব্রাহ্মণদের চোখে থাকত তাহলে বিপদই হত সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সে খুলেই বলল। বাবুর্চি মহাপ্রভু শুধু ঠগ নয়, ধড়িবাজ। স্বদেশ বলল—লোকটা জাঁহাবাজদের শাজাহান। সন্ধ্যে মোটে ছটা। আর ও কিনা বলে যে ডিনার তৈরি হয়ে গেছে! বলার সঙ্গে সঙ্গে সেলামের সে কি ঘটা। কি আর করি। তোমার কথা ভেবেই বাবুর্চিখানায় ঢুকে কথাটার সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে পারলাম না। তাই ভাবছি, বেচারা তোমরা কত অসহায়।

হেসে সে কথাটা এড়িয়ে গেলাম।

খানিক পরে কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বের করে সে বলল—ভায়া, আবাব যে খিদে পাচ্ছে।

পাশ ফিরে আমাব বিছানা থেকে সান্ত্বনা দিলাম—খিদের কি দোষ? এ বয়সে খিদে বার বার পাওয়ারই কথা। তার উপর যা তেড়ে তর্ক করলে খাবার টেবিলে বসে। ভাবলাম, বোধ হয় পেট আর প্লেটের মধ্যেও অসহযোগ মন্ত্রটা প্র্যাকটিস করতে চাও।

স্বদেশের মন দেশের সুরে বাঁধা। বলল—নাঃ, ভুলো না যে গান্ধীজীও আরউইনের সঙ্গে প্যাক্ট করে ফেলেছেন। এখন একবার খেয়ে নিলে দোষ হবে না।

মনে পড়ল যে বাবুর্চি সেই সন্ধ্যে ছটাতেই রান্না সেরে রেখেছিল। তোলা ডিনারটা এখন সদ্ব্যবহার করা যাবে।

বাবুর্চি বাড়িতে নেই। বেয়ারা কিন্তু খুব উৎসাহ করে নিজের সাধুতা প্রমাণ করল। জানিয়ে দিল আমরা খাব না জানা মাত্রই বাবুর্চি জিনিসগুলো দিয়ে নিজের ভোজের জন্য রান্না শুরু করেছিল। একজন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করেছে। রাতের শো'তে সিনেমা দেখে একসঙ্গে খাবে। বেয়ারাকেও অবশ্য নিজের খরচে ওদের সঙ্গে সিনেমায় আসতে ডেকেছিল। কিন্তু এ হেন বেইমান সে নয়।

অহিংস হতে পারে, তবু স্বদেশ যোদ্ধা। হাতিয়ার না হয় নেই, কিন্তু হাত আছে। সে এই বেইমানির মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ খুঁজে পেল। যদি সবটা খাবার সে আগে থেকে শেষ করে ফেলে তাহলে শীতের রাতে ফিরে এসে খেতে বসে নিমন্ত্রণ-কর্তার কি অবস্থা হবে? স্বদেশ বলল—কিছু মনে করো না ভাই, ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।

একাই একশ হয়ে সে দু'হাত চালাতে লাগল। বিলেতী মতে এটা শুধু দক্ষিণ হস্তের কারবার নয়। দু'হাতেরই দায়িত্ব আছে। টেবিলে বসে মজা দেখতে লাগলাম।

কিন্তু হাজার হোক এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কিস্তি। শেষ পর্যন্ত সবটা খাবার সাবড়াতে পারল না। বলল—এই ডালের জামবাটিটা থাক।

মাথা নেড়ে বললাম—এই গন্ধমাদনই যখন উড়িয়ে দিয়েছ, ওই একরত্তি ডালের জন্য হার মানবে?

জলের গ্লাসটা মুখে তুলেও সে নামিয়ে রাখল। জলেরও জায়গা নেই। বলল—না, থাক।

সঙ্গে সঙ্গেই সে মত বদলাল। না হলে বাবুর্চিরই জয় হবে। সে ভাববে যে তাকে জব্দ করার চেষ্টা করেও পারা যায়নি।

কিন্তু সত্যি স্বদেশ পারল না। একটু খেয়েই রেখে দিল। সংক্ষেপে

বললাম যে ওভার হেড য়্যাণ্ড ইয়ার্স (আকণ্ঠের চেয়েও বেশি) হয়ে গেছে—প্রেমে নয়, খাবারে।

কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে স্বদেশের মুখে ইংরেজী বেরোচ্ছে। এর মধ্যে একটা নিশানা পেলাম। ওকে উস্কোতে হবে বিলেতী দোহাই দিয়ে।

বললাম—সে কি? তুমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে সেটা ছেড়ে দিচ্ছ? মোপাসাঁ পড়ে এই করবে তুমি? জান, ফ্রান্সে হলে এই নিয়ে একটা ডুয়েল হয়ে যেত?

ফ্রান্স আর মোপাসাঁর কথা শুনে স্বদেশ উসখুস করতে লাগল। তবু বেচারার ক্ষমতায় কুলোল না।

আবার ফোড়ন দিলাম—এত শেকস্‌পীয়ার আর সার্ভান্টেস পড়ে তুমি পেছপা হয়ে যাচ্ছ? ওদের নায়করা ভেনডেটা অর্থাৎ চিরকাল ধরে লড়াই করে গেছে। আর তুমি?

স্বদেশের চোখে ব্রহ্মতেজ দেখা দিতে লাগল। ডুয়েল, ভেনডেটা এসব যে ক্ল্যাসিক প্রতিষ্ঠান।

আবাব অন্যদিক থেকে একটা নতুন অস্ত্র হানলাম। হেসে বললাম, বুঝেছি, তুমি চ্যালেঞ্জটা মেনে নিয়েছ। কিন্তু ভাবছ যে এই তুচ্ছ দেশী ডালটা খেয়ে মুখের অমর্যাদা করা ভাল দেখাবে না। কিন্তু জান··· ?

খুব একটা রহস্যের আভাস গলায় এনে ফিস ফিস করে বললাম—কিন্তু জান, এ জিনিসটা ঠিক দেশী ডাল নয়। এ হচ্ছে লেন্‌টিল স্যুপ। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। মিডল টেম্পলে যেখানে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য খানা খেতে হয় সেখানে গেস্ট নাইটে বিশেষ রজনীতে লেন্‌টিল স্যুপ দিয়ে ভোজ শুরু হয়। আর পিকাডিলিতে···

ওর চোখে আগুনের জায়গায় আলো ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করল—আর পিকাডিলিতে?

বললাম—পিকাডিলিতে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বনেদী স্যুপ। তা ছাড়া স্কটিশ ব্যারনরা ক্রিসমাস নাইটে মোমবাতির আলোতে এটা খায়।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ঘরের বাতিগুলো নিবিয়ে দিলাম। বাকি রইল শুধু টেবিলের উপর বাতিদানিতে ছুটো মোমবাতির চেহারার বাল্‌ব।

জামবাটি থেকে সবটা আদি ও অকৃত্রিম ডাল স্যুপ প্লেটে ঢালা হল। একটা নয়, ছুটো নয়, একেবারে চার চারটে। বিজলীর মোমের আলোতে স্বদেশী ব্যারন স্যুপের গোল চামচে করে এক নাগাড়ে সবটা লেনটিল স্যুপ উজাড় করে দিল। তার পর টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। খুব তৃপ্তির সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাল—হ্যাপি ক্রিসমাস টু ইউ।

রক অ্যাণ্ড রোল

হেই ওল্‌ডী

ওরে বুড্‌ঢা

খাঁটি কক্‌নী টানে এ-হেন ডাকে চমকে উঠলাম। লণ্ডনের পুরোনো অঞ্চল গুলোর অশিক্ষিত আধা-শিক্ষিত লোকরা এমন টান দিয়ে এ-হেন মধুর মধুর সম্ভাষণ করে থাকে। খাস উত্তর কলকাতার কোন খোলার ঘরের বস্তি থেকে কোন চ্যাঙড়া যদি মিষ্টি সম্পর্ক পাতানোর মত একটা ডাক হেঁকে বসত?

চমকে উঠলাম। কিন্তু পেছন ফিরে তাকালাম না। শহরের গরীব পল্লী ইস্ট এণ্ডে কাঁচা ও কচি ছোকরা যে ভদ্র ব্যবহার করবে এমন বিশ্বাস নেই। ওরা যদি কোন ভারতীয়ের পিছনে তার রঙের জন্য বা দেশের জন্য ডাক ছাড়ে তাহলে আকাশ থেকে পড়লে চলবে না। বিলেতে যারা সভ্য শিক্ষিত তাদের মধ্যেও অনেকে কৃষ্ণকলির দেশের লোকের গায়ের রঙ মনে মনে অপছন্দ করে। কিন্তু মুখ ফুটে তা প্রকাশ করে না। ইস্ট এণ্ডের বস্তির পল্লীর ছোকরাদের কাছে সে সংযম আশা করা যায় না। তার চেয়ে সেসব পাড়া এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু আমি বিশেষ করে এসব পাড়াই দেখতে এসেছি। গত মহাযুদ্ধে জার্মাণ বোমায় এসব পাড়া তছনছ হয়ে গিয়েছিল। কেমন করে সেগুলি আবার নতুন করে গড়া হচ্ছে তা দেখতে হবে। এ ত' শুধু দেখা নয়, শেখা।

ওল্‌ডী? কই, ব্ল্যাকী বলল না ত'? অবশ্য আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। ওরকম ডাক শুনলে আজ মনে কষ্ট হবে না, লজ্জা হবে না। মাথা উঁচু করে পাল্‌টে শুনিয়ে দিতে পারব—আমি ইণ্ডিয়ান, আমার দেশ আর রঙের জন্য আমি গৌরব বোধ করি।

এ-হেন একটা আত্মমর্যাদা এখন আমাদের হয়েছে। সে জন্যেই এ যাত্রা ইংরেজদের মধ্যে আগেকার মত কালো রঙ এড়িয়ে যাবার মত মনোভাব তেমন নজরে পড়েনি। ওরা আমাদের দেশকে সম্ভ্রম করে চলে। তাছাড়া আমরাও আগেকার মত কুণ্ঠিত বা স্পর্শকাতর নই।

এই আদি ও অকৃত্রিম ভগবানের দানের একটা গল্প মনে পড়ল। ছাত্রজীবনে হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জের একটি চাষী বুড়ির অভ্যর্থনার কথা। সারাদিন একটা পাহাড়ের চূড়ায় চড়ার পাগলামীতে কাটিয়েছি। পিঠে তল্পিতল্পার ঝুলি 'রুকস্যাক' নিয়ে পাহাড়ের শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতেই প্রাণান্ত। উঠতে উঠতে বিকেল গড়িয়ে গেল। আর নামতে নামতে সন্ধ্যা। নামবার সময় আবার পায়ের গুলিতে বেশি চাপ পড়ে আর সেজন্য হয়রাণও লাগে বেশি। সন্ধ্যাবেলা যখন ইয়ুথ হোস্টেলে গিয়ে হাজির হলাম হোস্টেলের ওয়ার্ডেন বুড়ি এই হাইকার অর্থাৎ পায়ে-হেঁটে-দেশ-বেড়ানিয়ার মলিন চেহারা দেখে বড় দুঃখ পেল। আমার পেটে দুরন্ত খিদে, কিন্তু ওর মাথায় মাথাব্যথা, আমারই জন্য অবশ্য। আহা বাছা আমার, সারাদিন এই কাঠফাটা রোদে জ্বলে পুড়ে এসেছ। যাও, যাও, শিগ্‌গির নেয়ে এস। হোস্টেলের গোসলখানায় ভাল শাওয়ারের ঝর্ণাকল আছে। সেখানে পছন্দ না হয় ত' ঠিক পেছনেই পাহাড়ী ঝর্ণাও একটা পাবে।

কিন্তু আমার গরজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত বুড়ি আরো সহানুভূতিতে উছলে উঠে বলল—ওঃ, তোমরা হচ্ছ নওজোয়ান। ধুলো-কালি-রোদ এ সবে কিছু যায় আসে না 'তোমাদের। তবু একবার নেয়ে এস।

যদি সমুদ্রে স্নান করতে চাও তা-ই সই। ওই সামনেই দেখছ উপসাগরের পার। ওখানেই না হয় একটু সাঁতরে এস। তাহলেও কালিমাটি সব উঠে যাবে।

অগত্যা কালিমাটি ওঠাতে যেতেই হল। স্নান সেরে খাবারের টেবিলে এসে বসলাম। কিন্তু হায়, তখনো আদি ও অকৃত্রিম রঙখানা গায়ে বেমালুম বজায় আছে দেখে বুড়ি একেবারে থ।

এর আগে জীবনে বুঝি ভারতীয় দেখেনি। যদিও ইণ্ডিয়ার গাল-গল্প শুনেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু ওর চোখে ছিল শুধু বিস্ময়। ওঃ, এই ব্যাপার? হাইকারের গায়ের রঙটা অস্বাভাবিক নয় তাহলে; যেমন অস্বাভাবিক নয় তার চালচলন, তার কথাবার্তা।

কিন্তু ইস্ট এণ্ডে ভারতীয় চেহারা আর রঙ দেখে কেউ অবাক হবে না। এ পাড়ায় যদি কেউ পেছন থেকে ব্ল্যাকী বলে হাঁক ছাড়ত তাহলে আমিও অবাক হতাম না। তার জন্যে ত' তৈরি হয়েই এসেছিলাম। এ পাড়ায় শুধু মুখ আছে, মুখোশ নেই। নেই ঠোঁটের উপর কোন তালাচাবি। জগৎ জুড়ে ইংরেজের সুনাম তার সভ্যতার জন্য। আদব-কায়দা নিখুঁত। পালিশ-করা ঝকমকে মেজাজ। মাথার টাকটুকু থেকে পায়ের জুতোজোড়া পর্যন্ত হ্যাট আর স্প্যাট এবং আরো কত কিছু পোশাকে সযতনে ঢাকা। কিন্তু এসব পাড়ায় অত আঁটসাঁট নিয়ম চলে না।

তা বলে গুল্ডী?

এ হেন ডাক ত' কখনো শুনিনি।

একটু যাচাই করে দেখা দরকার। ছকুড়ি সাত হতে এখনো কিছু

দেরি আছে। বন্ধুলোকে বলে থাকেন যে দেখায় তার চেয়ে আরো কম। এই চ্যাঙড়া ছোকরাদের চোখে তাহলে বাঁকা চশমা লাগানো আছে নাকি?

দেখাই যাক না একটু বাজিয়ে।

কিন্তু এদের ঘাঁটানো দারুণ দুঃসাহসের ব্যাপার। এদের দৌরাত্ম্যে শুধু ইস্ট এণ্ড নয়, শুধু লণ্ডন নয়, সারা ইংলণ্ড বেসামাল হয়ে উঠেছে। এই ত' সেদিন এরা ছবি দেখে এসে কি কাণ্ডটাই না করে বসল। সিনেমাঘর থেকে বেরিয়ে ছবিটার গানের তালে তালে ধেই ধেই করে নাচ। নাচ নয়, প্রলয় নাচন। জটার বাঁধন নয়, নিয়মকানুনের বাঁধন পড়ল খুলে। নিয়ম আইন ঐতিহ্য এ সবের নাগপাশে জড়ানো ইংরেজ এককালে বাজাত 'রুল ব্রিটানিয়া'। এখন রক্-ন্-রোলের বাজনার তালে তালে—

রোল ব্রিটানিয়া।

চারদিকে রাস্তায় লোক জমা হয়ে গেল। গাড়ি চলাচল বন্ধ। এরা চেঁচাল: আমরা নাচছি আর লোকে গতানুগতিক ভাবে বাড়ি যাবে? সময় মাফিক এনগেজমেণ্ট রাখবে? ভিড়ে যাবে না আমাদের সঙ্গে? বটে? তাহলে আব লোকেদের এপথ দিয়ে যাবার দরকার নেই। মোটরে চড়ে আর ফার কোট গায়ে দিয়ে বড় যে চলেছ রূপসী আর রোজগেরে মেমসাহেব সাহেবের দল। এই দিলাম তোমাদের মোটরকার ঠেলে কাৎ করে রাস্তায় শুইয়ে। ব্যস্, এবার দলে ভিড়ে যাও।

আমাদের দেশে এরকম অবস্থায় অনেকে মুখ বুজে সয়ে যায়। গুটিকয় গুণ্ডা এক টিন কেরোসিন আর এক বাক্স দেশলাই নিয়ে হাজির হলে ট্রাম পোড়ানোর পথ খুলে দিয়ে লোকে সুড়সুড় করে সরে পড়েছে কখনো কখনো। কিন্তু ইংরেজ নাগরিক তা করবে না।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব রোষ তারে যেন তৃণসম দহে।"

অতএব ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা রুখে দাঁড়ালেন।

আইন আর শৃঙ্খলা তাঁরা বজায় রাখবেন।

কিন্তু তাঁরা পেরে উঠলেন না। ছোকরারা হুড়দাড় করে সিনেমা থেকে আগুন নেবানোর হোজ-পাইপ নিয়ে এল। ওই ঠাণ্ডা দেশ, তায় রাত হয়েছে। জলে জলে ছোকরারা সবাইকে চুবিয়ে ছেড়ে দিল। ফার কোট আর ইভনিং ড্রেসের সে কি দুরবস্থা!

সিনেমার ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে মালিক পুলিসকে টেলিফোন করল। ওরা টের পেয়ে দরজা ভেঙে সিনেমায় ঢুকল। ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে সব চেয়ার কেটে উড়িয়ে দিল। একটাও দরজা বা জানলাতে কাঁচের শার্সি অক্ষত রইল না। রাস্তার কাছাকাছি সব মদের দোকান হয়ে গেল লুট। সব বিজলীবাতির বাল্‌ব্‌ হয়ে গেল খোলামকুচি।

পর পর তিন রাত্রি চলল এমন তাণ্ডব। চারশ ছোকরা হাজতে গেল। কিন্তু লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত কোন শহরে 'রক এরাউণ্ড দি ক্লক' অর্থাৎ ঘড়ির চারপাশে ঘুর ঘুর দোলন দোল' এই মার্কিন ছবিটা পুলিস পাহারা ছাড়া আর দেখান গেল না।

কিন্তু ইংরেজ আইন মানবেই। অর্থাৎ ছবিটা লাইসেন্স যখন পেয়েছে তখন দেখাবেই।

এই ছোকরার দল অর্থাৎ 'টেডি বয়'রাও নাছোড়বান্দা। হাঙ্গাম হুজ্জুত ওরা করবেই!

সিনেমার মালিকরা বলতে লাগল যে শনিবার রবিবার রাতের 'শো'গুলো চালান শক্ত হয়ে উঠেছে।

শুধু শক্ত? তার চেয়ে বেশি নয়? অবশ্য ইংরেজীতে একটা কথাকে কত যে ঘুরিয়ে মোলায়েম করে বলা যায় তার মোক্ষম উদাহরণ হল এটা।

কাজেই এই ছোকরারা যখন গুল্ডী বলে হাঁকছে এটাও ওদের কম করে নরম করে বলার একটা চূড়ান্ত নমুনা কি না কে জানে? হয়ত আসলে ওরা আরো অনেক খানিই বলতে চায়।

সত্যি কথা বলতে কি বুকের মধ্যে একটু কাঁপন যে অনুভব করিনি তা নয়। এই সব কাণ্ড-কারখানার পর নিজেও ছবিটা দেখে এসেছি। অবশ্য ওই সব নাচ নাচতে গেলে শক্ত সমর্থ হতে হবে। পায়ে মাতোয়ালা ঘূর্ণি নাচ আর সঙ্গে সঙ্গে গলায় ফুর্তির ফোয়ারা ছোটানো নওজোয়ান ছাড়া আর কারো কর্ম নয়। কিন্তু এমন কিছু ওই ছবিতে দেখলাম না যার জন্য রাতের পর রাত প্রলয় নাচন বেধে উঠতে পারে। তবু আমেরিকাতে শহরের পর শহরে এই ধরনের দোদুল দোলন নাচ 'রক্-ন-রোল্' পুলিসের হুকুমজারী করে বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। দেখাই যাক না।

'টীন-এজার' বলে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের। অর্থাৎ বিশের কোঠা পর্যন্ত পৌছয়নি। 'আয় রে সবুজ, আয় রে আমার কাঁচা'। 'পুচ্ছটিরে উচ্চ করে নাচা'।

হ্যালো, দোদুল দোলন ছেলেমেয়ের দল—বলতে বলতে হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম। যদি তার বদলে টেডি বয়েজ বা ওই রকম কিছু একটা বলতাম তাহলেই কাণ্ড হয়েছিল আর কি!

আশ্চর্য! যেন একদল কেউটের বাচ্চা ফণা নামিয়ে শান্ত হয়ে বেদের চারধারে ঘিরে দাঁড়াল।

একজন ত' সিগারেট মুখে গুঁজে দিয়ে তাতে আগুন ধরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটি মেয়ে খুব আদর করে চকোলেট উপহার দিতে চাইল। আরেকটি ছেলে খুব মাইডিয়ার ভাব দেখিয়ে বলল যে, 'ফ্রগ' অর্থাৎ ব্যাঙের উপর দাঁড়িয়ে কথাবার্তার সুবিধা হবে না। তার চেয়ে সামনেই ওর 'ডিগ' আছে। সেখানে যাওয়া যাক।

'ডিগ' অর্থাৎ যেখানে গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর থাকার মত থাকা চলে সেই বাসা।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ফ্রগের উপর দাঁড়িয়ে? ঠিক যেন বুঝতে পারছি না, পারছি না এমন সময় সে বুঝিয়ে দিল। ফ্রগ অ্যাণ্ড টৌড (ব্যাঙ আর ব্যাঙাচি) এর সঙ্গে কথার মিল হয় রোড। তাই ওরা রোডকে বলে ফ্রগ। রাস্তা হয়ে গেল ব্যাঙ।

এই বলেই ছোকরা তার তখনকার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল—সি ইজ মাই লেটেস্ট বার্ড। 'বাংলাদেশেও একটু বখা ইয়ার বক্সিদের মধ্যে এ ধরনের কথা চালু আছে। কাজেই মানে বুঝতে কষ্ট হল না।

কিন্তু ঠেকে গেলাম পরমুহূর্তেই। পাখী ঠোঁট উল্টে পাল্টা প্রতিবাদ করল—হুঁঃ, আমি বটে তোমার বার্ড! তুমি, যে তোমার একটা ভাল হুইসিল পর্যন্ত নেই।

হুইসিল অর্থাৎ সিটি মারবার সেই ছোট্ট যন্ত্রটা? তিন পেনী মাত্র যার দাম? না। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম যে এই ঢেউখেলানো লম্বাচুলো চালচুলোহীনরা পোশাককে বলে হুইসিল। হুইসিল যে কি করে স্যুট হয় বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। লক্কা পায়রারা নতুন ইংরেজী ভাষা তৈরি করছে বটে।

বলিহারী এদের কল্পনা। গুটি কয়েক বিশ্ব-সাহিত্যিক না তৈরি করে বসে।

জানি যে ওরা হচ্ছে গত বিশ্বযুদ্ধের বানভাসি শেওলা। না ফুটবে ফুল, না খুলবে বাহার। শুধু জলের স্রোতকে হয়ত একটু আটকাবে; হয়ত পায়ের কাদায় মিশিয়ে যাবে। ইংলণ্ডের উপর যখন জার্মান বোমা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝরতে লাগল তখন গরীবদের না রইল ঘর, না পরিবার। বস্তির, অবশ্য বিলেতী বস্তির, বাসিন্দারা চারদিকে ছিটকিয়ে পড়ল। মাটির নীচে খোদা আশ্রয়ে দিনের পর দিন কাটতে

লাগল। না হয় অচেনা দূর গ্রামাঞ্চলে দল বেঁধে ওদের পাঠানো হল। সেখানে সবাই ওদের সন্দেহের চোখে দেখে। মা হয়ত মোজা বোনা বা কল চালাবার জন্য মিডল্যাণ্ডে চালান হয়েছে, আর বাপ বিদেশে মরতে গেছে। নাহয় ধুঁকছে কোন অজানা কোণায় অস্ত্র তৈরির কারখানায়। তাকে হয়ত পৈতৃক নাম ছেড়ে দিয়ে বদলে নম্বর নিতে হয়েছে এক্‌স্ পি ২০২। সে তার স্ত্রীর স্বামী নয়, ছেলেমেয়ের বাবা নয়। শুধু এক্‌স্ পি ২০২; তার ঘরবাড়ির কথা ভুলে যাও। ঠিকানা হচ্ছে অমুক নম্বর আর্মি-পোস্টাপিস।

একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

তোমার বাবা কি করত যুদ্ধের সময়?

বুক ফুলিয়ে সে উত্তর দিল—লেখাপড়ার কাজ, বইয়ের কাজ।

—অর্থাৎ?

—সৈন্যদের জন্য যে সব বই পাঠান হবে তা বাঁধাই করত। অবশ্য বই খুলে দেখেনি কোনদিন।

—কি করে জানলে যে সে একটু-আধটু পড়াশোনাও করত না?

—কখন করবে পড়াশোনা? সকাল থেকেই বাবা মদ খেতে আরম্ভ করত। বলত, বোমার হামলা ভুলে থাকতে চাই। আমি আর আমার বড় ভাই দুজনে দুদিক থেকে তাকে পাকড়িয়ে ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে আসতাম।

পাশের একটা ছোকরা টিপ্পনী কাটল—হা, হা। আর কেমন শ্ল্যামিং (চড়চাপড়) খেত ওরা। যেন দুটো সার্ডিন মাছ একটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙা ডিঙিকে টেনে নিয়ে আসছে।

অন্য সময় হলে এই উপমা কালিদাসস্য শুনে মুগ্ধ হতাম। কিন্তু এখন…

আরেকটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—আর তোমার বাপ-মা কি করত?

খুব ছোট্ট কথায় সে উত্তর দিল, আমরা ছিলাম অর্ধেক বেদে আর অর্ধেক স্যুটকেস।

অর্ধেক স্যুটকেস!

আর খুলে বলবার দরকার হল না। একটি মেয়েকে প্রশ্ন করলাম। সে বলল—আমার বাবা ছিল বিজলীর জিনিসের দোকানদার। হয়ে গেল প্ল্যাণ্টার।

—কোন্ প্ল্যাণ্টেশনে সে চাষের কাজ নিয়েছিল?

—ইস্ট এণ্ডের কবরখানায়। বেলাবেলি বোমায় মরা মানুষগুলোকে না পুঁতে ফেলতে পারলে রাতের নতুন খদ্দেরদেব সামলাবে কি করে?

—কিন্তু তোমাব মা কি করত? তাব কাছে তুমি থাকতে না নাকি?

মেয়েটা আকাশ থেকে পড়ল। এই বিদেশী বলে কি? যুদ্ধের সময় কোথায় বা মা আর কোথায় বা মেয়ে। প্রত্যেকে ছিল শুধু নিজের জন্য আব শত্রু ছিল সকলেব জন্য। সৈন্যদেব মন চাঙ্গা রাখাব জন্য সরকাব যেসব যাত্রা-পার্টি দেশময় ঘুরিয়ে বেড়াত আমাব মা তাতে কাজ করত।

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে ত' নিশ্চয়ই ভাল টাকা পেত, আর তোমাকেও ভাল ভাবে রাখতে পারত। ওই সব অভিনয়ে কি রকম চবিত্র থাকত তার?

ফস্ করে একজন টেডি বয়—ওদের এই নামেই পরিচয়—বলে বসল, কোন চরিত্রই তার ছিল না। সে ছিল কোরাসেব মেয়ে।

বাপরে বাপ্! কি মোক্ষম রসিকতা! লজ্জা এদের কাছ থেকে লজ্জায় পালিয়েছে। বলতে বলতে ওরা মেতে উঠল। আর ওদের মাতামাতি থেকে দাপাদাপি একটি শুধু ধাপের তফাৎ। বরাত আমার ভাল। বর্তমানে ওরা শুধু নেচেই ক্ষান্ত হল।

ঘরের কোণায় ছিল একটা পিয়ানো। হ্যাঁ। পশ্চিম পৃথিবীতে

বস্তি অঞ্চলেও গরীবের ঘরে একটা পিয়ানো থাকে ; থাকে কার্পেট, সোফা, পর্দা, আয়না আর এমন সব কত রকমারি আসবাব। আমাদের স্বচ্ছল ঘরেও তার অনেক কিছু নেই। ওরা আজকাল আবার টেলিভিসনও অবশ্য-দরকারী বলে ধরে নিয়েছে। মস্কোতে টেলিভিসন ছাড়া বাড়ি বোধ হয় একটাও নেই। এরা পিয়ানোয় যা বাজান শুরু করল তাকে আগে বলা হত 'আর এবং বি' অর্থাৎ ছন্দ এবং ভাবন। আটলান্টিকের ওপার আর এপার দু মহাদেশেই এই ধাঁচের নাচ-গানকে ব্যাবসাদার, সুরকার আর সিনেমাকার ভাঙিয়ে খাচ্ছে। নাম দিয়েছে রক্-ন্-রোল্ অর্থাৎ ঘুরতাই দোদুল দোলা। তার ছন্দে আছে মোহ, আছে আমেরিকার নির্জন পশ্চিম প্রান্তের দুঃসাহসী ডাক, শিকাগোর নিগ্রো পাড়ার মর্মবেদনা।

গানটা চেনা চেনা ; সুরটাও অচেনা নয় :—

ওগো পঞ্চদশীর মা,
এই কি হল ঠিক ?
এত জল্‌দি ভুললে নাকি
নাচতে তুমি ঘূর্ণি পাখী
প্রেম্‌সে অনিমিখ ?
এই কি হল ঠিক ?

অর্থাৎ তুমি যখন তরুণী ছিলে তখন কি করতে ভেবে দেখ। এ রকম প্রশ্নের পরে 'টীন এজার' অর্থাৎ উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা বাচ্চাদের বেলেল্লাপনায় বাধা দেবে কোন্ মুখে ? সুবিচার কি নেই নাকি এ যুগে ?

সেই কথাই ওরা আমায় বোঝাতে চেষ্টা করল। আর শেষ পর্যন্ত বললে যে যদি বিশ্বাস না করতে চাই তাইলে স্লোন স্কোয়ারে যেন একটা নাটক দেখে আসি। ডোন্‌ট্ ডেস্‌ট্রয় মি—আমায় ধ্বংস করো না। নেশো না আমায়।

*   *   *   *

নামটা মনে নেশা ধরিয়ে দিল। সত্যিই ত' আমরা বাঁচতে চাই। থাকুক শত দোষ, দুর্বলতা। আমারো বাঁচবার দাবি আছে। ইয়োরোপের মানুষ সবাইকে বাঁচাতে চায়। এত যুদ্ধ, এত বিজ্ঞানের যন্ত্র দিয়ে পাইকিরী দরে মেরে ফেলার বন্দোবস্ত। তবু বাঁচাতে চায়।

অত্যন্ত বড়লোকের পাড়ায় এই থিয়েটারটা। এই বইটাও একটা নাক-উঁচু অভিজাত পত্রিকাতেই নাটকের রূপে বেরোল। নায়ক স্যামি একটি ইহুদী ছেলে। বাপ মদে চুর হয়ে থাকে। মা সৎমা আর অসতী। ছেলের চোখের সামনে পাশের বাড়ির মানুষের সঙ্গে মনের জ্বালা মেটাচ্ছে। লড়াইয়ের হানাহানি আর তার পরের হাহাকারের মধ্যে স্যামির ব্যর্থ কৈশোর দিশেহারা হয়ে গেছে। বানচাল হয়ে গেছে। এ-হেন স্যামিকে তোমরা ধ্বংস করো না। করো না। তাকে বাঁচবার সুযোগ দাও। সে হচ্ছে এই যুগের কৈশোরের যৌবনের একটি অসহায় প্রতীক।

থিয়েটারে যাবার আগে মনে মনে একটু হেসেছিলাম বৈকি। ছন্নছাড়া টেডি বয় নায়ক। তার প্রতি দরদ উথলে উঠবে মেছোবাজারের বস্তির নয়া নাট্যকারের কলমে। তাই দেখে শখের হাততালি দেবে নিউ আলিপুরের মোটর-বিহারীরা। কাদের অভিনয়ে হাততালি দিই বলুন ত'? অভিনেতাদের? না, দর্শকদের?

সমস্যাটার সুরাহা হয়ে গেল প্রথমেই। খুব ভাল জমাট লেখা আর অভিনয়। সবার মনেই খুব সাড়া পড়ে গেল। নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খুব হাততালি আর অভিনন্দন শুরু হল। নাট্যকার মাইকেল হেস্টিংস দুঃসাহসী তরুণ। হাসিমুখে স্টেজের উপর এসে দাঁড়াল।

আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করতে করতে সে বলল—ষোল বছর বয়সে দৌরাত্ম্য করতাম বলে স্কুল থেকে আমায় তাড়িয়ে দেয়। তখন আমি দু ছত্র একসঙ্গে লিখিতে পারি না। কিন্তু মনের মধ্যে ছিল অনেক কথা। সে কথাই আমি এই নাটকে খুলে লিখেছি। যখন বেড়ে উঠবার বয়স তখন যে স্কুলে গেছি তাকে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল বলা চলে না। তা হচ্ছে মাটির তলায় স্যাঁতসেতে গোয়াল। বেওয়ারিশ চিংড়ীমাছের মত অনাথ বাচ্চায় ভরা। যা খেলনা পেয়েছি তা হচ্ছে রাস্তায়, না হয় বাড়ির ধ্বংসস্তূপে কুড়িয়ে পাওয়া বোমার রঙীন টুকরো। কতটা দূরে বা কাছে বোমা পড়েছে সে খবরটুকু পর্যন্তই ছিল আমাদের ভূগোলের দৌড়।

আপনারা বলবেন যে,—বেশ ত', কিন্তু এখন তোমরা ত' সবই পাচ্ছ। চাকরি এন্তার, বেকার নেই কেউ। কর্মখালির বিজ্ঞাপন কর্মীকে গরুখোঁজা করে বেড়াচ্ছে। সবই ঠিক। কিন্তু পুরোনোকেলে নীতিশাস্ত্র পনের বছরের স্যামির জীবনটাকে ওলোটপালোট করে দিয়েছে। এবং ওই নীতিশাস্ত্রে আর পোষাবে না। আমি মাইক হেস্টিংস হচ্ছি ওদের মুখপাত্র।

সবাই ওকে ছেঁকে ধরল—তোমার বাণী কি? এ যুগকে তুমি কি শোনাতে চাও?

মাথার সামনে লম্বা হয়ে ঝুলে-পড়া চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলল—আমরা কুড়ির নীচের বয়সীরা অর্থাৎ টীন্‌-এজার আমরাই নয়া জমানা। আমরা জানি যে ইংরেজের সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গেছে। গেছে জন বুলের দাপটভরা পেখমধরা নাচ। টেডি বয়রা জানে যে আইন আঁর তাদের প্রতিনিধি নয়। কারণ যেখানে জীবনের পায়ে পড়েছে বেড়ি, যেখানে আছে আইন—সেখানেই অন্যায়।

একজন প্রশ্ন করল—কিন্তু টেডি বয়রাও ত' বেড়ে উঠছে। তারা বড় হয়ে কি ভাববে নিজেদের সম্বন্ধে?

মাইকের উত্তর বড় কাটাকাটা। সে বলল—উনিশের উপর বয়স হলেই সে হয়ে যায় হয় রাক্ষস, না হয় অপদার্থ, আর না হয় সাইফার, অর্থাৎ শূন্য।

পেছন থেকে একজন টিপ্পনী কাটল—যাক, ওরা চিরকাল যে শিশু সেজে থাকবে না, সেটা অন্তত কিছুটা ভরসার কথা।

এ পর্যন্ত বেশ জমে উঠেছিল। সামনের শ্রোতারা ছিল প্রায় সবাই উনিশের উপরে। সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে অবাক হয়ে শুনছিল। পেছনের টিপ্পনীকারকে যে গোটাকতক দামাল ছোকরা ঘিরে দাঁড়াল সেটা আমাদের নজর এড়াল না।

এদিকে মাইক তার বাণী ফলিয়ে বলে চলেছে—শুধু ব্লন্‌ড্‌ (সোনালী কেশবতী) মেয়েদের আমি এই নসীবের হিসাব থেকে রেহাই দিয়েছি। আমার চেয়ে বযসে বড়, হেলতে দুলতে গজেন্দ্র-গামিনী ব্লন্‌ড্‌দের আমার বড় পছন্দ।

একজন বৃদ্ধা কথার মোড় ঘোরাতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কখন লেখেন।

মাইক বলিল—সারা দিন হৈ-হল্লার পর রাত নটা থেকে ভোর তিনটে পর্যন্ত আমি লিখি। তারপর ঘুমোই। কিন্তু ঘুমোতে আমি চাই না। ঘুমকে ঘৃণা করি আমি। সংসারে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে। আর আমি সে সময়টা নষ্ট করব? তার চেয়ে আমি স্পেনে গিয়ে ষাঁড়ের লড়াইয়ের বুল ফাইটার হতে চাই।

দামী ফার আর মিন্‌কের পোশাক-পরা কোন বড়ঘরের ঘরণী ঠোঁট টিপে হেসে মন্তব্য করলেন—এবং বুল-ফাইটের ঝকমকে সাটিনের পোশাকটা পরেই ঘুমিয়ে পড়তে চাই।

খাপখোলা তলোয়ারের মত ঝকঝক করে উঠল মাইকের পাল্টা মন্তব্য—না ডাচেস, সে সব বিলাসিতা আপনারাই করেন। আপনাদের উঁচু তলার সমাজের একজন সেদিন খুব ঠমক দেখিয়ে প্রেসকে

জানালেন যে তার একমাত্র রাত্রিবাস, ঘুমোনোর পোশাক হচ্ছে ইয়ার্ডলির ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার সেন্ট। আমার রাতের কাপড় হচ্ছে ব্রিক্‌স্‌টনের (লণ্ডনের মেছোবাজারের) ঝগড়াঝাঁটি আর চোখের জল।

ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াবে বোঝা যাচ্ছিল না।

সেই ভদ্রমহিলা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। তার দু কানের হীরের দুল যুদ্ধং দেহি ভাব দেখিয়ে ঝলমল করে উঠল। তিনি বলে উঠলেন—তাছাড়া আর কি-ই বা তুমি জীবনের কাছে চেয়েছ?

এক মুহূর্ত থেমেই তিনি তার ওপরতলা থেকে যেন দুহাত বাড়িয়ে আদর দেখাতে দেখাতে নেমে এলেন। প্রশ্নের সঙ্গে যোগ করে দিলেন—বাছা, আমার বেচারা বাছা।

শুনে থিয়েটারশুদ্ধ সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু বেচারা বাছা খুব আন্তরিক ভাবে দরদী গলায় উত্তর দিল—চেয়েছি সারাদিনের প্রতিটি নিমেষ বাঁচতে। অভিজ্ঞতার ছাঁকনির মত হতে। চেয়েছি চলে চলতে।

চলতে চলতে পথে একজন সাংবাদিক আমায় পাকড়াও করল। গায়ের রঙখানাই আমার একেবারে অভ্রান্ত পরিচয়পত্র। আমি কোন্ দেশের লোক তা বোঝাতে পুলিসের আইডেন্টিটি কার্ড বা পাসপোর্ট দেখবার দরকার হয় না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—রক্-ন্-রোলের ধাক্কা ইণ্ডিয়াতেও পৌঁচেছে নাকি?

বললাম—কোথায় পৌঁছয়নি? যে দেশেই যুদ্ধ জীবনকে, সমাজকে তছনছ করে দিয়েছে সেখানেই টেডি বয়দের আবির্ভাব হয়েছে। এমন কি রাশিয়া পর্যন্ত রেহাই পায়নি। সেখানে এত আঁটসাঁট নিয়মমাফিক সবাইকে চলতে হয়। তবু সেখানে কর্তৃপক্ষ অস্থির হয়ে উঠেছে। কাগজে কাগজে ছবি, প্রচারপত্র। বড়সড় বাঘা ছেলে নাড়ুগোপাল

সেজে দোলনায় শুয়ে ; আর বাপ-মা তার হাতে তুলে দিচ্ছে ঝুমঝুমি, মুখে দুধের বোতল। নীচে লেখা—আপনিই কি এই ছেলের বাপ ? মা ?

তিনি হেসে বললেন—তা ত' জানি। কিন্তু আপনার দেশের কথা বলুন।

জানালাম যে আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে রকবাজ। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, র‍্যাশনিং, খিদেব ফল। অবশ্য আমাদের মধ্যে সবাই মিলে নাচা গাওয়ার সামাজিক চলন নেই বলে বাঙালী টেডি বয়রা 'রক্-ন্-রোল' করে না ; হয় রকবাজ। অসহায় নির্বীর্য গরীবের নাচঘর হচ্ছে রক।

বাংলাদেশের রকবাজ আর পশ্চিমের 'রক্-ন্-রোল' তফাৎ শুধু ওই একটি ধাপ। রকের উপর আমাদের যে কৈশোর যৌবন উপচিয়ে গেঁজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আনতে হবে গতি, জাগাতে হবে জীবন-তৃষ্ণা। বক্-ন্-রোলে যে উদ্দাম প্রাণ, যে সৃষ্টির অসহ অশান্তি তার মধ্যে হয়ত লুকিয়ে আছে নতুন সৃষ্টির বীজ। এই উচ্ছলতার ন'ম হয়ত ভবিষ্যতে বদলিয়ে যাবে কিন্তু সে বীজ কখনো নিষ্ফল হবে না।

মাথা নেড়ে ভদ্রলোক সায দিলেন। বললেন—আমিও তা-ই মনে কবি। এবং আমাব মত আরো অনেকে। সেজন্যেই ঘরেব অনাদরে নষ্ট, স্কুলের অশিক্ষায় মানুষ আর সস্তা চাকবিব দামী মাইনেতে অমানুষ হলেও ওদেব আমবা ফেলতে পাবি না। ওদেব মধ্যেও আছে সৃষ্টির বীজ।

একটু জোবের সঙ্গেই বললাম—না, না, কখ্খনো ফেলো না ওদের। অবশ্য ওই বীজ কি রকম গাছ আর কি ফল ফুল দেবে তা নির্ভর করবে ওদেব মাটির সাব আর তোমাদের আকাশের ক্লাইমেট, আবহাওয়ার উপর। শুধু বীজের উপর নয়।

—ঠিক বলেছেন। অতি খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। গুডনাইট। অচেনা সাংবাদিকের শুভেচ্ছা আপনার দেশের 'রক্-ন্-রোল' তরুণদের জানিয়ে দেবেন।

—গুডনাইট। বহু ধন্যবাদ।

কিন্তু ওল্‌ড়ীদের কি হবে? আমার চারপাশে থিয়েটার-ফেরৎ দলের কচি আর কাঁচারা চলাফেরা করছে। ওরা হৈ-হৈ করে আর্ট আর অভিনয় সম্বন্ধে নিজেদের মতামত আলোচনা করছে। হোক না বইয়ের শিক্ষায় খাটো। মনের শিক্ষা, প্রাণের আবেগ দিয়ে ওরা তা পুষিয়ে নিক, হে ভগবান! যে জ্বালায় ওরা পুড়ছে তাতে খাদ জ্বলে গিয়ে সোনা ফুটে বেরোক, হে ভগবান!

তবে ওল্‌ড়ীরাও বিফলে যাবে না। নতুন জাগা প্রাণ পরিণত জীবনকে বার বার দেয় নাড়া। জিইয়ে রাখে তার আধুনিকতা, তার চলমান ধারা।

যতদিন সে নাড়া ওরা দিতে না পারছে ততদিন সবুর কর। নেশো না আমায়।

টেলিভিসন আর বিউটি কম্পিটিশন

রাজকন্যা নয়।

কিন্তু রূপ রাজকন্যার মত। নরম নধর কান্তি। হাসলে জোছনায় বান ডাকে।

থাক, সেসব রূপ বর্ণনা এখন থাক। তা করতে গেলে মনটাই বেসামাল হয়ে যাবে। তার চেয়ে টেলিভিসনে যা দেখছি তার কথাই বলা যাক।

জুলিয়েট মহা ফ্যাসাদে পড়েছে। তার বয়স অবশ্য পঁয়ত্রিশ। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে সে বিশের কোঠা পার হয়নি। না দেহে, না মনে। শুধু রাজকন্যা নয়, স্বর্গের অপ্সরা। অনন্ত যৌবনা।

সেই জুলিয়েট তার বাগ্‌দত্তা প্রণয়ীকে এখন ঠকাতে পারে না। সে সব খুলে স্বীকার করল যে আরেকজন যুবকের সঙ্গে তার একটু মন জানাজানি শুরু হয়েছে। 'জো'র সঙ্গে জুলিয়েটের প্রেম বহুদিনের। অনেক বছর ধরে তারা পরস্পরের সঙ্গে বাগ্‌দত্ত অর্থাৎ এন্‌গেজ্‌ড্‌। কিন্তু বিয়ে করা ওদের কপালে ঘটছে না! সংসারের যত ঝামেলা, ঝক্কি হঠাৎ জুলির মাথায় এসে চাপে। কিন্তু একনিষ্ঠ তার প্রেম।

এদিকে সুন্দরীদের কপালে শান্তি লেখা থাকে না। অন্তত পশ্চিমে। সেখানে আছে অবাধ মেলামেশা। আসে মধুকে ঘিরে মৌমাছি। কাজেই জুলিরও স্তাবকের অভাব নেই।

নিজের মনে স্তাবক কথাটা শুধরিয়ে নিলাম। আমাদের দেশে যারা তোষামোদ করে তাদের বলে স্তাবক। কিন্তু সত্যি যার রূপ

আছে তার রূপের প্রশংসা স্তাবকতা নয়। বলুন অ্যাডমিরেশন। ভক্তের পূজা।

একজন ভক্ত একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। মাত্রা ছাড়ায় ছাড়ায় অবস্থা। সে কথাটাই জুলিয়েট নিজে থেকে খুলে তার ফিঁয়াসের কাছে স্বীকার করল।

ফিঁয়াসে জো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জুলির মুখের দিকে। কিছুক্ষণ, কিন্তু মনে হল যেন অনন্তকাল। শেষ পর্যন্ত জো ফিস ফিস করে বলল—জুলি, তুমি কি ওর সঙ্গে প্রেমে পড়েছ?

জুলি যেন একটা ধাক্কা খেল। তাড়াতাড়ি বলল—জো? তুমি বলছ? না-না। তুমি নিশ্চয়ই এমন কথা ভাবছ না?

মাথা নেড়ে জো বলল—হ্যাঁ, তাই। ভাবছি বলেই বলছি। আমার বিশ্বাস, তুমি সবটা সত্যি বলছ না।

জুলি কি সবটা সত্যি বলেছিল? জো আর জুলিতে কি এতদিনে শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? আসছে হপ্তায় এইদিনে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আবার 'টিউন' করবেন। সত্যি কথাটা তখন জানতে পারবেন। আচ্ছা, আজকের মত শুভরাত্রি।

হ্যাঁ। তবে সত্যি কথাটাও এখনি জানিয়ে দিই। দি গ্রেট ট্রুথ। সবার সেরা সত্য।

"ন্যাচারাল পার্ম, তার নাম 'ভারবেনা'।
কেশের চাঁচর চূড়া
রবে ছটি মাস পুরা,
গরমে ঘামেতে তাহা টেঁসে যাবে না।"

এই বিজ্ঞাপনটুকুই আসল কথা। তার জন্য এত ভণিতা, এত অভিনয়। তা না হলে ঘরে ঘরে এই দামী টেলিভিসন চালু করবার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? টেলিভিসন ভয়ানক খরচান্তের ব্যাপার। তা-ও চালু করার কেন্দ্র থেকে মোটে কয়েক শ মাইল

চালানো যায়। তাকে রিলে করে দূরে টেনে আনতে আরো অনেক খরচা।

আমেরিকাতে ব্যবসাদারী টেলিভিসন চালু হয়েছে অনেকদিন থেকে। কিন্তু ইংলণ্ডে বি. বি. সি. এটা চালাত শুধু আর্ট ফর আর্টস সেক্। শুধু নিছক আনন্দের জন্য। কিন্তু হায়, এই বৈশ্য যুগে ছুনিয়াটা বনে গেছে বানিয়া। আর্টের সাধনায় বসেও আটা চালের হিসাব গুণে চলতে হবে। নাহলে শুধু মালা টপকানই সার হবে।

তাই অন্য একটা কোম্পানিও এখন টেলিভিসন চালাচ্ছে। বিজ্ঞাপন পাচার করে দেওয়া হয় প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে। অবশ্য এমন বুদ্ধি করে, যাতে আনন্দের কোন ব্যাঘাত হয় না, অথচ বিজ্ঞাপনও শুধু কানের ভিতর দিয়ে নয়, নয়নের ভিতর দিয়েও মরমে পশে।

এইখানেই আর্টের জয় হয়েছে। চাই রূপ, চাই রস, তবেই না রুচি হবে বিজ্ঞাপনে কান দিতে। তা না হলে কি আর ঘরভর্তি লোক শুধু পার্ম অর্থাৎ মেয়েদের মাথার ঢেউতোলা চুল সাজানোর বিজ্ঞাপন দেখবার আর শুনবার জন্য পয়সা খরচ করে টেলিভিসন কিনত ?

মনে মনে আমিও রাজী হয়ে গেলাম ছুয়েকটা বিজ্ঞাপনের বুকনী শুনতে। তাতে করে যদি দেশে বসে টেলিভিসন উপভোগ করতে পারি সবাই মিলে, সংসারে কার কি ক্ষতি হবে ?

এ-বাড়ির গিন্নী আমার সবচেয়ে নিকটতম প্রিয়তম ইংরেজ বন্ধু সহপাঠী ভিনসেন্টের স্ত্রী। প্রথমে যখন সস্তা কিস্তিবন্দীতে টেলিভিসন কিনলেন, পাড়ার মেয়েরা দলে দলে সময় বুঝে সন্ধ্যেবেলা বেশ গুছিয়ে জমিয়ে 'কল' করতে আসতেন। ইংরেজীতে 'কল'

কথাটা কেমন যেন গালভারী শোনায়। যত্ত যেন দরবারী আদব-কায়দার গন্ধ মাখানো। তার চেয়ে বলা যাক পাড়া বেড়ান। যারা আসতেন তাদের বেশির ভাগই মাঝবয়সী। আর তারাই ত' রূপ আর যৌবনের মিছিল পছন্দ করে বেশি। বিশেষ করে কোর‍্যাল।

একটু মজার ইশারা পেলাম। হাসি চেপে ভিনীকে বললাম—কিন্তু কোর‍্যাল কি নিজেকে মাঝবয়সী বলে স্বীকার করে?

কোর‍্যাল নামে প্রতিবেশিনীটিকে চিনি না। কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকাতে মাঝবয়স যে মেয়েদের কাছে কি, তা একটু আধটু বুঝি। আমাদের দেশে বৈষ্ণব কবিরা বয়ঃসন্ধির গান গেয়েছেন। তা হচ্ছে ভোরের সানাই। এদেশে উপন্যাসে রচনা হয় মাঝবয়সের বেদনা। তা হল মেয়েদের জীবনে সন্ধ্যার পূরবী।

ভিনী অর্থাৎ মিসেস ভিনসেন্ট পান্টা আমাকেই প্রশ্ন করলেন—কাকে তুমি মাঝবয়সী বল?

মাথা নেড়ে বললাম, যে বয়সের হিসাব দিয়ে তার বর্ণনা করা যাবে না। আমাদের দেশে মানুষের আয়ু কম। সেখানে মাঝবয়স অন্য জিনিস। এদেশে সে বয়স আসে আরো অনেক পরে। তবে পদার্থটা দুদেশেই এক।

ভিনী সায় দিলেন। কিন্তু বললেন—তবে পশ্চিমে মন দিনে দিনে কচি অর্থাৎ তরুণ হয়ে উঠেছে। সেটা হচ্ছে জীবনের মিলনান্ত আনন্দ।

মাথা নাড়লাম—কিন্তু সব যুগেই দেহ দিনে দিনে পাকা অর্থাৎ বুড়ো হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে জীবনের বিয়োগান্ত দুঃখ।

উনি ত' শুধু গিন্নী নন। ছেলেবেলাকার বন্ধুর স্ত্রী। তায় ইংরেজের স্ত্রী হলেও কন্টিনেন্টের মেয়ে। অত ভাসা ভাসা কথা পছন্দ করলেন না। তাই একরকম হুকুমই দিলেন—তুমি একেবারে দার্শনিক। কিন্তু ওসব পূবালী হেঁয়ালী রেখে দাও, ডক। সোজা ভাষায় চলে এস।

এদিকে আমার সোজা ভাষা আসে না সহজে। বিশেষ করে যদি ভিনীও সেই বয়সের হয়ে থাকেন? যদি বলি চল্লিশ বছরটা হচ্ছে ঠিক মাঝবয়সের মাঝখানটা, আর আমার পোড়াকপালক্রমে ওঁর বয়েস হয় চল্লিশ বছর পনের দিন? মনে মনে কিছু বলবেন না অবশ্য। কিন্তু ওদের ফ্লাটে আরো বহুদিন যাতায়াত, একসঙ্গে ঘুরে বেড়ান, গরমাগরম কফি আর টফি এখনো যে প্রত্যাশা করি। প্রবাসে নিজ-বাসের সুখ, আন্তরিকতা যে ওরা আমায় দিয়ে থাকে, প্রত্যেক বারেই ইউরোপ-বাসের সময়।

তাই বললাম,—অঙ্কে আমি চিরকালই কাঁচা। ওই ভয়েই ত' ব্যারিস্টারী করা হল না।

উনি হেসে ফেললেন,—অঙ্কের সঙ্গে ব্যারিস্টারীর সম্বন্ধটা নজরে পড়ছে না।

বুঝিয়ে দিলাম খুব ভাল করে,—ধর, যদি ভাল ব্যারিস্টার হতাম, বড় বড় ফিসের টাকা ত' গুণতে হত? তখন মনের শান্তি নষ্ট হবার ভয় থাকত রোজ। ভি'র অবস্থা দেখে ত' সেই ভয়টাই হচ্ছে।

উনি অভয় দিয়ে বললেন—তা ব্যারিস্টারী যখন করছ না, আর বড়লোক হবার ভয়ও নেই বলছ, এখন মাঝবয়সের বর্ণনা দিতে পার। নিজের খুশিমত।

শুধোলাম,—সভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?

ভরসা পেয়ে বললাম—তোমাদের কোর‍্যালের দেহে যৌবনের তাপে ভরা স্বাক্ষর মুছে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু মনের আকাশ সোনালী আর বেগুনি রঙে মাখানো।

হাসির তরঙ্গ তুলে তিনি বললেন,—ঠিক তোমার মতই কথা। তুমি আর তোমার ইণ্ডিয়া বাস্তবতার ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেলে।

বাধা দিলাম—কিন্তু কোর‍্যালের বয়েস যদি আমার এই ডেফিনিশনের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে থাকে তাহলে তার মনের খবরটাই আমায় বল।

ভিনী উত্তরে বললেন,—তার আগে এই টেলিভিসনে এইমাত্র যে নাটকটা দেখেছ তার গল্প বলি। এটা ধারাবাহিক ভাবে হপ্তার পর হপ্তা চলছে। প্রত্যেক বিষ্যুৎবার ঠিক এই সময়। আর ওই যে জুলিয়েটকে দেখলে, কাঁচের পর্দার ওই জুলিয়েট হচ্ছে প্রত্যেক মাঝবয়সী মেয়ের স্বপ্ন।

ঠাট্টা করলাম—আর মাঝবয়সী পুরুষদের নয়?

হেসে জবাব দিলেন,—তাদের কথা জিজ্ঞেস করো ভি'কে।

ভি অর্থাৎ ভিনসেণ্ট। কলেজে পড়ার সময় ভিনসেণ্টকে সবাই ডাকত 'ভি' বলে। এত বছর পরে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যে সে বিয়ে করেছে। প্রথম পরিচয়েই তিনি হয়ে গেলেন ভিনী অর্থাৎ ভি'র গৃহিণী।

এ হেন ডাক নাম শুনে বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—'ভিনী' কি রকম করে হল?

ভি'র কাছে এরকম প্রশ্ন আশা করা উচিত। জাত ইংরেজ সব জিনিসই বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে। কারণটা খোঁজে। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দিয়েছিলাম। শুনে দুজনেই সন্তুষ্ট।

আমার ডাক নাম কেন ডক অর্থাৎ ডক্টর হল সে কথাও খুলে বলি। ডক্টরেটের জন্য পড়ছিলাম না। কারণ তাতে বিলেতের ইউনিভার্সিটির ছাত্রজীবনের সবটুকু পাওয়া যায় না। সে জন্যে ডক্টরেটের জন্য মুখ বুজে থিসিস লেখার আহ্বান আর অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে আবার অন্য একটা বিষয়ে অনার্সের জন্য পড়তে লাগলাম। বিলেতের শিক্ষা পুরোপুরি নিতে হবে। তার জন্য নতুন করে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। গরীব পরাধীন ইণ্ডিয়া থেকে লোকে

সব চেয়ে বড় ছাপ আর খেতাব নিয়ে যেতে আসত; নিছক লেখাপড়া শিখতে নয়। সবারই মনে তখন এই ব্যাপারটা নাড়া দিয়েছিল। বন্ধুরা বলেছিলেন, আচ্ছা, তুমি না হয় ডক্টরেট না-ই করলে। কিন্তু আমরা সবাই তোমায় প্রীতি দিয়ে ডক্টর অর্থাৎ সংক্ষেপে ডক বানিয়ে দিলাম।

সেই থেকে আমি 'ডক'। কেমন করে জানিনা দেশে ফিরেও অনেকের কাছে এই ভুল ডাকটা আমি শুনেছি।

এখন ভিনীকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম,—কিন্তু রসিকে, ভি কেন? ভিনীরই ত' ছেলেদের খবর বেশি জানবার কথা।

ভিনী জবাব দিলেন,—উঁহু, আজকের বিলেতে, ঘরসংসার চালাবার খাটুনীর চোটে আমার মত গিন্নীর ওসব বিলাসের মোকা মেলে না। ঝাড়ুটা বিজলীতে চলে বটে; তবু ঝাড়ু ত' বটে। চালাতে ত' হয়।

পাছে গল্পের খেই হারিয়ে যায় সে ভয়ে বললাম,—না, না, তোমার মত পতিগতপ্রাণার কথা ছেড়ে দাও। তুমি আমাদের দেশেও মা লক্ষ্মীদের প্রতিযোগিতায় সোনার মেডেল নির্ঘাত পাবে। কিন্তু কথা হচ্ছিল কোর‍্যালের। অর্থাৎ যাদের চোখে আছে স্বপ্ন আর মনে রস, অথচ নেই সংসারের বোঝা, সেই মেয়েদের। তাদের স্বপ্নটা একটু খুলে বল। দেখিনি অবশ্য তোমার কোর‍্যালকে। কিন্তু তার জন্য ব্যথায় মনটা টনটন করতে শুরু করেছে।

—হ্যাঁ; এই বলছি। ততক্ষণ এই আপেলটা কেটে খেতে থাক।

আপেল খাবার সময় নয়। কিন্তু ওরা আমার আপেল-প্রীতির খবর জানে। এসব ব্যাপারে ভিনী হিন্দু গিন্নীদের চেয়ে কম যায় না। কেবল ভুল করেই বোধ হয় ব্ল্যাক সীর ওপারে জন্ম নিয়েছিল। গল্পের লোভে ওদের বসবার আর খাবার দুই পাটের মিলিত ঘরটাতে বসে আপেল কাটতে লাগলাম।

ওই যে জুলিকে দেখলে, ও প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে প্রেমের অভিনয় করে। প্রত্যেকটি অভিনয় একটা পুরোপুরি গল্প। কাজেই তুমি এক হপ্তা যদি না দেখে থাক, পরের হপ্তায় কোন মুস্কিলে পড়বে না। কিন্তু সারা হপ্তা ছটফট করবে ওই সময়টুকু টেলিভিসন নিয়ে বসবার জন্য।

টিপ্পনি কাটলাম—আহা. উর্বশীর জন্য ব্যাকুলতা!

উনি বললেন—সে আবার কে? কোন হুরী নাকি?

সংক্ষেপে বললাম—হিন্দু হুরী। যা হোক, তোমার ইংরেজ হুরীর কাহিনী বলে যাও।

মনে মনে ভেবে দেখলাম যে এরা অপ্সরা বিদ্যাধরীদের খবর এখনো পায়নি। কিন্তু হুরীর সন্ধান ঠিক পেয়েছে। আরেবিয়ান নাইট্‌সের জয় হোক।

ভিনী বললেন—আন্দাজ করতে পার জুলির ফিগারের মাপজোখ? দেখেছ ত' এখখুনি।

সবিনয়ে অক্ষমতা জানালাম।

উনি হেসে বললেন,—জান, আমেরিকার মেরিলিন মন্‌রোর মাপজোখ? ইংলণ্ডের ডায়ানা ডর্সে'র?

স্বীকার করলাম যে এ বিদ্যাটা ভি'র সঙ্গে একসঙ্গে পড়বার সময় শেখা হয়নি।

—না শিখেছ, লোকসান হয়নি। তবে এখন বিউটি কমপিটিশন আর ফিল্‌ম্ স্টার সম্বন্ধে আলোচনা চারদিকেই হয়। কাজেই এটাও তোমার জেনারেল নলেজের (সাধারণ জ্ঞানের) একটা অংশ হিসাবে জানা উচিত। কোথাও, কোন 'বারে' না হয় ককটেলের পার্টিতে ঠকে যেতে পার।

বললাম—শিগগিরী বল, নোট-বইয়ে টুকে রাখি। এবার থেকে বাসে টিউবে যেতে কোন নজর করবার মত রূপসী দেখলেই মনে মনে

মাপটা ঝালিয়ে নেব। তাহলেই মুখস্থ হয়ে যাবে। এই মহাজ্ঞানটা দেশেও কাজে লাগবে। এসব বিদ্যাতে আমাদের দেশও বিশেষ পেছিয়ে নেই আজকাল।

আমেরিকায় প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ টি, ভি, (টেলিভিশন) সেট খোলা হয় রোজ সন্ধ্যেবেলা। বিলেতেও যতদূর তাকাই বাড়িতে বাড়িতে প্রত্যেকের ছাদে তার আকাশী অর্থাৎ এরিয়েল। এমন কি গরীব কুলী-মজুরের পাড়া ইস্ট এণ্ডেও। দেখে এত ভালো লাগে। ভাল লাগে সবায়েরই জীবনে আনন্দের ছোঁয়া এসে পড়ছে বলে। তার জন্য কিস্তীবন্দীতে সব জিনিস বিক্রী হয়। কারখানা তৈরি করছে লাখ লাখ সেট—সস্তায় দেবে বলে। ব্যবসাদার বিক্রী করছে এন্তার—কম দামে অনেক বেচে বেশি লাভ করবে। কাজেই কালোবাজারের ঠাঁই নেই। আহা, আমাদের দেশে সবার মুখে হাসি ফোটাবার বন্দোবস্ত হবে কবে? ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি না হলে সস্তায় লাখ লাখ ঘরে এসব জিনিস পৌঁছবে কি করে?

সেকথা ভাবতে ভাবতে আনমনে এদিকে একটা পোজ নিয়ে ফেলেছি। টেরও পাইনি কিন্তু।

টের পেলাম যখন ভিনী খিল খিল করে হেসে উঠলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন,—তুমি দেখছি সত্যি সত্যি মাপটা লেখবার জন্য কলম উঁচিয়ে রেখেছ। তবে লিখেই নাও; সেটি হওয়া উচিত বুক ৩৫, কোমর ২৩ আর উরু ৩৪। আর ধর ওজন হবে বড় জোর ১১৫ পাউণ্ড।

মুখে আউড়ে গেলাম আদর্শ নারীর ফিগারের মাপটা। তারপর বললাম—দেশে ফিরবার সময় প্যারিসে যাবার ইচ্ছে আছে। লুভর্ মিউজিয়ামে গিয়ে ভিনাসের মাপটা ফিতে দিয়ে যাচাই করে নেব।

ডাইনে বাঁয়ে হতাশভাবে মাথা হেলিয়ে দিলেন ভিনী। চোখ কপালে তুলে বললেন—তুমি যদি শুধু কলেজের 'আণ্ডার গ্র্যাড' হতে

তাহলেও বলতাম তুমি হোপলেস, একেবারে হোপলেস। তুমি সব আশার বাইরে। বিয়ণ্ড অল্ হোপ।

সেইটেই আমার একমাত্র আশা—গলাটা যতদূর সম্ভব করুণ করে জবাব দিলাম।

বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ভি অর্থাৎ ভিনীর স্বামী। অফিস-ফের্তা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য দৌড়োনর চেহারা লণ্ডনে আর কলকাতায় ঠিক একই রকম। তা বলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়া চলবে না। যদিও বাড়ি বা ফ্ল্যাট ইংরেজের পক্ষে তার কেল্লার সামিল, তবুও না। ঘরের মধ্যে যে আছে, সে নিজের স্ত্রী হতে পারে, তবু তার নিজের নিরিবিলি সত্বা আছে, 'প্রাইভেসি' আছে। স্বামীত্বের 'ওপেন সিসেম' সেখানে খাটবে না।

বিউটি কন্টেস্টের কথা শুনে ভি মহা খুশি। বললেন,—এর চেয়ে বেশি ভাল 'পিক মি আপ' এই সন্ধ্যেতে আর কিছুই নেই। একেবারে চাঙ্গা করে তুলবার মত বিষয়। আচ্ছা ডক, তোমাদের দেশেও নাকি হচ্ছে আজকাল এসব ফ্যাশন?

যেন মহা দুঃখের কথা, এমন একটা ভাব করে জানালাম যে আমরা দুয়েকবার রূপসীদের প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়েছিলাম। কিন্তু তেমন এগোতে এখনো পারিনি। পাখনা মেলতে কিছু সময় লাগবে। আজাদীর হাওয়া সমাজের গায়ে লাগতে সময় লাগে।

মাথা নাড়লেন ভি,—এটা শুধু আজাদীর কথা নয়। সমাজের ও ধর্মের বাঁধনের উপর খানিকটা নির্ভর করে। তবে শোন, ইটালীর একটা বিউটি কন্টেস্টের রূপের পাল্লার গল্প বলি। একেবারে হালফিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। জান ত', ওদেশে ধর্মের দাপট কতখানি। অনেকটা ইণ্ডিয়ার মত বলতে পার। তায় ওদের একজন ধর্মগুরু আছেন যার বাণী একেবারে বেদবাক্য।

ওরা রূপের পাল্লা দূরের কথা মানুষের চেহারা একটু খুপসুরৎ

করে তোলাটাকেও ভাল বলে না। গোঁড়ারা বলে যে প্ল্যাস্টিক সার্জারীও পাপ। খোদার উপর খোদকারী কিছুতেই ধর্মে সইবে না। শেষ পর্যন্ত একজন নামকরা ক্যাথলিক প্ল্যাস্টিক-সার্জন পোপের কাছে আবেদন জানালেন। লিখলেন,—আমি কুৎসিত কদাকারকে একটু সারিয়ে দিই। খোদার উপর নয়, মানুষের মুস্কিলের উপর যতটুকু সম্ভব হাত চালাই। বাইবেলে আছে যে, ভগবান মানুষকে নিজের মূর্তি মিলিয়ে গড়েছেন। আমি ফেস লিফটিং করে সেই ভগবানেরই সেবা করছি। সেই ফাঁকে যে দু পয়সা উপায় করি সেটা ত' বে-আইনি বলা যায় না। তাতে অধর্মও এমন কিছু হবে না।

রায় হল যে ঠিক কথা। যদি বাঁকাচোরা মুখটা বা ফুলকপির মত নাকটা কেটেকুটে সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে দেখো, নাক কানের চেহারা রাতারাতি বদলে দিয়ে যেন খুনী আসামীকে আইন ফাঁকি দিতে সাহায্য করে বসো না।

তবু চাঁই ক্যাথলিকদের মনে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব রয়ে গেল। চেহারা নাহয় মেরামত করে নিলে। তা বলে সেই চেহারা নিয়ে রূপের হাট খোলা কি ঠিক হবে? সেটা কি বিবেচনার কাজ হবে?

মুরুব্বিরা মাথা নাড়লেন।

কিন্তু ছোকরারা হাল ছাড়বার পাত্র নয়। তর্ক তুলল যে আমরা যে রূপের হাট বসাব তাতে রূপের সঙ্গে গুণের যাচাই হবে। শুধু উর্বশী নয়, লক্ষ্মী সরস্বতীর রাজযোটক করিয়ে ছাড়ব আমরা এই দেশে। ইটালীতে রূপের সঙ্গে কাল্‌চারের খাদ মেশাব।

শেষ পর্যন্ত কর্তারা রাজী হলেন। এমন কি মহামহিম পোপ পর্যন্ত নাকি মিস্ ইটালীকে সাক্ষাৎ দেবেন।

কাল্‌চারের পরীক্ষার জন্য কর্মকর্তারা ডাকলেন বিদেশী টুরিস্টদের। ভি আর ভিনী নেমন্তন্ন পেয়ে খুশি। মহা খুশি। বিনা টিকিটে এ-হেন একটা রসাল ব্যাপার দেখা যাবে বলে যে এতটা খুশী তা নয়।

বেচারী রূপসীদের একটু সাহায্য করার সুবিধা এসে গেল বলে। তাদের কাল্‌চারের পরীক্ষা—সে যে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার চেয়েও কঠিন ব্যাপার।

ভিনী একটি তরুণীকে উৎসাহ করে শুধোলেন—রোমিও জুলিয়েটের নাম শুনেছ।

হায়, কোন্ স্বপ্ন-দেখা কিশোরী জুলিয়েটের মত সুন্দরী সাজতে চায় না? চায় না রোমিওর মত প্রেমিক পেতে? কিন্তু ওরা কে তা ওই অমর প্রণয়ীদের নিজেদের দেশের মেয়েরাও বলতে পারল না।

অনেক ভেবে চিন্তে একজন গম্ভীরভাবে বলল—দুই যমজ বোন।

মাতব্বররা মাথা নাড়লেন। হাঁকলেন—এর পরের প্রশ্ন এবার করা হোক। ভিনী শুধোলেন আরেকটি মেয়েকে—আচ্ছা, কত ডিগ্রী গরমে জল ফোটে?

এ বেচারী তা জানত না। কিন্তু তার চোখে যে গরম ফুটে বেরোল তাতে জল ত' ছার, লোহা পর্যন্ত ফুটতে পারে টগবগ করে।

কিন্তু হৃদয়টা ত' আর লোহার নয়। ভি বেচারার মন সমবেদনায় ফুটে উঠল।

সে খুব ভরসার ভাব দেখিয়ে আরেকটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করল,—বল ত' সিনরিনা, যে কোন একটা ইটালিয়ান মদের নাম।

প্রবল দুঃসাহস দেখিয়ে মেয়েটি বলে উঠল—শ্যাম্পেন।

ভি'র মনে কতখানি ব্যথা লেগেছিল তার প্রমাণ পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। সে এর পর চুপ করে গেল। শেরীর গ্লাসটা পেগ টেবিলেই পড়ে রইল। অনাদরে। পৃথিবী সুদ্ধ সবাই জানে যে শ্যাম্পেন হচ্ছে ফরাসী মদ। সেই শ্যাম্পেনের সম্বন্ধে এতটা অজ্ঞতা কি করে সহ্য হয়?

হাওয়াটা হাল্কা করে নেওয়া দরকার। তাই বললাম—কিন্তু সংসারে সবাই ত' রূপের পূজা করে। বিয়ে করবার সময় রূপ চায়।

বন্ধুত্ব করবার সময় চায় আরো বেশি। শুধু তাই নয়। রূপসীর নজরে পড়তে হবে। বলি,—বলতে বলতে একটু কাছে এগিয়ে এলাম—বলি, তা নাহলে তোমার গলার টাইটার বাঁধন অত ছিমছাম লক্কা পায়রা গোছের দেখাচ্ছে কেন?

বর্ণনা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন ভিনী। বললেন,—বুঝেছি, বুঝেছি, তাই রোজ সকালে টাই নিয়ে এত মাথাব্যথা। হুঁঃ, এই ব্যাপার। শুধু মেয়েরাই ফ্যাশন-ছুরস্ত হতে চায়, না?

বন্ধুপত্নীর দিকে ফিরে বললাম,—অবশ্য তোমার মাথা নিয়েও মাথাব্যথা নেহাৎ কম নয়। বরঞ্চ অনেক বেশি। একটা টাইয়ের দাম কুল্লে পাঁচ টাকা। টিকবে পাঁচ বছর। তোমার মাথার জন্য হপ্তায় না হোক মাসে পঁচিশ টাকা লাগে নির্ঘাৎ। সে জন্যই ত' নাপিতের দোকান আজকাল চুল কাটে না, চুল সাজায়। 'কাট' করে না, করে 'ড্রেস'।

তিনি স্বীকার করলেন,—সত্যি, দিনকের দিন সাজগোজ আর আরামের বহর যে রকম বেড়ে চলেছে কোথায় যে এর শেষ হবে কে জানে। এখন শুধু পার্ম নয়, তার উপর আছে শ্যাম্পু, লোশন, ল্যাকের এবং আরো কত কি। এক স্নানের জন্যই দরকার সাবান, বিউটি সোপ, ডিয়োডোরাণ্ট, বাথসল্ট, টয়লেট ওয়াটার।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের "কল্কি অথবা দি ফিউচার অফ সিভিলাই-জেশন" নামে বই থেকে একটা বাণী মনে করে ভি বললেন—নিত্য নতুন অভাব সৃষ্টি আর তার দাবি মেটানো এই দাঁড়িয়েছে আমাদের সভ্যতা। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা।

বাধা দিয়ে বললাম—ঠিক তা বলা যায় না। প্রাচ্য সভ্যতাতেও রূপের দাম ছিল। ছিল তার জন্য সাধনা আর সরঞ্জাম দুই-ই। রূপ নিয়ে শুরু হয় প্রেম—তা থেকে আত্মার আত্মীয়তা—তা থেকে পরমাত্মার টান। শেষ ধাপটুকু আর কজনে পৌঁছোয়? কিন্তু সে

পর্যন্ত পৌঁছোতে নাই বা যদি পারি, মুগ্ধ হব না কেন? কাউকে মুগ্ধ করবার জন্য সাজব না কেন? তোমাদের প্রতিবেশিনী কোর‍্যান্সের মনের বাসনা মানুষের শাশ্বত বাসনা।

ভিনী পাশের ঘরে গিয়ে খাবার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এবার খেতে চল। ভি আলোচনায় ক্ষান্ত দিয়ে শেরীর গ্লাসটা আবার মুখে তুললেন। শেরীর গন্ধটা একটু উপভোগ করে নিলেন। ছোঁয়ালেন মুখে গ্লাসটা বেশ একটা আমেজে। তারপর বললেন—যাই বল ডক, আমার গৃহিণী আমার চোখে সবার চেয়ে বেশি সুন্দরী হয়ে থাকবে এই বাসনাও ত' কম জিনিস নয়। তার দাম কি শুধু বছরে পঞ্চাশ পাউণ্ড রুজ পাউডারের খরচে হিসাব করা চলে?

ওর পিঠে একটু হাল্কা টোকা দিয়ে বললাম—প্রাচ্যদেশের বিজ্ঞ লোক আমি বলছি যে তুমি ঠিকই মনে করেছ। তোমাদের খোলাখুলি মেলামেশা গলাগলি করে এগিয়ে যাওয়ার সমাজে জনতার মধ্যে একজন হয়ে মন পাওয়া, মন ধরে রাখা কি সহজ কথা নাকি? তোমাদের প্রেম যখন টেকে তখন অনেক ধোপ সত্ত্বেও টেকে। সেটা বাহাদুরির কথা। মনকে ত' তোমরা বিয়ের সিন্দুকে তুলে তালা দিয়ে রাখ না।

একটু থেমে বললাম—তবে আমাদের ঘোমটা-টানা সমাজের আর আইনেরও বদল হয়েছে। ধোপের আমদানি শুরু হয়েছে। বিয়ে এবং প্রেম দুয়েরই হবে যাচাই।

ভি যোগ করে দিলেন—এবং বাড়বে দাম।

থিয়েটার

থিয়েটারের টিকিটের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

আগে থেকে টিকিট কেনা সম্ভব হয়নি। রোজ কন্‌ফারেন্সের তর্কাতর্কি সারতে সারতে থিয়েটার শুরু হবার সময় পার হয়ে যায়। এমন কি শনিবারেও। পশ্চিমে আবার রবিবারে আমোদ প্রমোদ বন্ধ। বিশেষ করে ইংলণ্ডে। তাছাড়া উইক-এণ্ডের ছুটি শহরে কাটালে লোকে বোকা বলবে। সবাই সে সময় নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যায়। সোমবার যখন পাঁচজন জমা হয় তখন নতুন জায়গার গল্প করে। তখন সেই গল্পের সময় মুখ থাকবে কি করে?

অথচ ইয়োরোপে এসে যদি থিয়েটার না দেখি তাহলে ইয়োরোপ দেখাই হল না। বিশেষ করে ইংলণ্ডে। সেখানে থিয়েটারকে সিনেমা হঠাতে পারেনি। পারেনি রূপালী পর্দা ড্রপসিনের জৌলুসকে কমাতে। তার উপর গত ক বছরে বাংলাদেশে থিয়েটারের নবজন্ম হয়েছে। আমি যদি বিলেতের থিয়েটার না দেখে দেশে ফিরে যাই তাহলে বাঙ্গালী রসিকসমাজে কল্কে মিলবে না।

সবচেয়ে বনেদী খবরের কাগজ টাইমসের পাতা দেখুন। হঠাৎ সিনেমার বিজ্ঞাপন নজরে পড়বে না। দেখবেন থিয়েটার ব্যালে অপেরার বিজ্ঞাপন বর্ণনা সমালোচনা। তার চেয়ে বড় কথাঃ থিয়েটারের সামনে যে ভীড় জমে তার অভিনয় নাকি আরো চমৎকার। জ্যান্ত মানুষের পরিচয় সেখানে।

সেই পরিচয় একদিন হাতে হাতে পেয়ে গেলাম।

হঠাৎ একদিন কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন ঘণ্টাখানেক আগে থেমে

গেল। সোজা দৌড়ালাম থিয়েটারপাড়া লেস্টার স্কোয়ারে। টিকিট পাব না, জানি। মাসখানেক আগে থেকে সব বিক্রী হয়ে আছে। কিন্তু সবচেয়ে সস্তার সীট আগে থেকে রিজার্ভ হয় না। সাধারণ লোকের জন্য এইটুকু সাধারণ সুবিধা। লাইনে দাঁড়িয়ে 'কিউ' করুন। যদি আপনার সে সৎসাহস থাকে, তবে চলে আসুন থিয়েটারের পাশের বা পিছনের গলিতে। লম্বা 'কিউ' সাপের মত কিলবিল করছে।

অনেকে আবার খুব আগে এসে কিউয়ে ঠাঁই নিয়ে তারপর সেখানে টুল ভাড়া করে রেখে গেছে। টুলওলা আপনার টুলটার হক্ বজায় রাখবে। আপনি বিকেলে যথাসময়ে এসে টুলের জায়গায় দাঁড়িয়ে যান। টুলওলার কিঞ্চিৎ সংস্থান হয়ে গেল।

তেমন আরো অনেকে এই মওকায় করে খাচ্ছে। যারা নাট্যশিল্পের রসিক তারা অন্যান্য শিল্পেরও সমজদার হবে। কাজেই আপনার দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট কমাবার জন্য হাজির হয়েছে ফুটপাথের চিত্রশিল্পী থেকে চলতি চাকার হারমোনিয়াম নিয়ে গাইয়ে পর্যন্ত।

গাইয়ে হারমোনিয়ামের চাবী ঘোরাতে ঘোরাতে গাইছে একটা আমেরিকান গান। বনেদী বিলেতের বুকে বসে মার্কিনী গান। কিন্তু ভাষাটা ত' ইংরেজী বটে। সুরটাও পশ্চিমের। আর ভাবটা বিশ্বজনের।

গাইয়ের চেহারা আর চালচলন জনমজুরের মত। হয়ত আগে কোন কয়লার খনিতে কাজ করত। যেখানেই হোক—শিকাগো থেকে সাইবেরিয়া, রুর থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত মনের দুঃখটা একই।

ষোল টন মাল তুলে কি হল সুসার ?
এক দিন আয়ু কম, আরো বেশি ধার।
ডাকিয়ো না স্বর্গদূত ; মরণেও বাধা ;
আত্মাটি যে কোম্পানির দোকানেতে বাঁধা।

যে কবি এই গানটা তৈরী করেছিলেন তার বাবার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বুকফাটা কাহিনী। এই গানের রেকর্ড পৃথিবীর সব রেকর্ডের চেয়ে বেশি টাকা কামিয়েছে। আমাদের দেশের মত সুদখোরের হাত থেকে ওদের মজুররা রেহাই পেয়েছে। তবু কোম্পানির স্টোর থেকে ধারে জিনিস কিনে শখ মেটায়।

আমার পিছনে দাঁড়ান এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—আমার আত্মাটিও ইনস্টলমেণ্ট হিসাবে বাঁধা আছে।

ভদ্রলোক একটু কাছে এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গ ভাবে বললেন—আপনি হয়ত জানেন না, এদেশে আমরা নানা রকম ভোগের জিনিসপত্র নিয়ে যা নবাবী করি তা সবই কিস্তীবন্দিতে কেনা হয়। কাজেই মরলে ত' চলবে না। ধার শোধ করে যেতে হবে।

বললাম—তাতে দুঃখ কি। কিস্তীতে কেনা আর ধার শোধা ত' ঠিক এক জিনিস নয়। আর কিস্তীর কল্যাণে যে মজাটা আগাম মেরে নিচ্ছেন সেটা কিস্তীর সুদের বদলে পাচ্ছেন বলে ধরে নিন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বোধহয় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাই ইংরেজ হয়েও কথা শুরু করলেন—আপনি ইণ্ডিয়া থেকে আসছেন। আপনাদের মেয়েদের পোশাক শাড়ি কি চমৎকার জিনিস! প্রত্যেক ইণ্ডিয়ান মেয়ে যেন স্বপ্নের মোড়কের মধ্যে দিয়ে হাঁটে। আর আমাদের মেয়েরা ?···হুঁঃ, ওই যে দুজন চলেছে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে—পাৎলুন পরনে। পেছন থেকে বলতে পারেন, ওদের মধ্যে কোন্‌টি পুরুষ আর কোন্‌টি মেয়ে ?

—কেন, যে সহিষ্ণুভাবে শুনে চলেছে সে নিশ্চয়ই পুরুষ।

হেসে ফেললেন ভদ্রলোক। বললেন—আপনি ঠিক সমজদার লোক বটে। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি কিনা। তাই চট করে মনে হল আপনার সঙ্গে দুটো কথা কওয়া যাবে।

অনেক দেশ ঘুরেছেন। নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে ইংলিশ চ্যানেলের নোনা সমুদ্রের ব্যবধান থাকত তার আর আমার মাঝখানে।

আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ভালই হল, একজন আলাপী লোক পাওয়া গেল। বললাম—হয়ত আমাদের দেশে আপনি এখনো আসেননি। কখনো এলে খুশি হব। কিন্তু দেখুন—ওই ষোল টনের গানখানা যেন ইণ্ডিয়াতে পাঠাবেন না।

মুচকী হেসে উনি জিজ্ঞেস করলেন—কেন, বেশি ভারী ওজনের মনে হচ্ছে নাকি ?

হেসে জানালাম—না। বরং উল্টো। নাচুনী ছন্দের গান। কিন্তু আমাদের একেবারে শুইয়ে দেবে।

—অর্থাৎ ফ্লোর করে ? মেঝেয় গড়িয়ে ?

—না, বিছানায় গড়িয়ে। এমনিতেই আমরা খাটুনী জিনিসটা পছন্দ করি না। বসতে পেলে শুতে চাই। আর শুতে পেলে ঘুমোতে।

—হুঁ। নতুন গড়ে ওঠা দেশের পক্ষে ভাল কথা নয়। তা দেখুন, আমাদের মধ্যেও ও রোগটা ধরেছে। সেদিন একজন পার্লামেন্টের মেম্বার তার বাড়ির জানালা থেকে নীচে রাস্তায় মজুরদের কাজ দেখছিল। তা তিন ঘণ্টায় বার চারেক চা খাওয়া আর বার ছয়েক কাজ শুরু করব কি করব না তার জন্য গভীর চিন্তা ওরা করেছিল। এম. পি. বেচারা সে সব ডায়েরীতে লিখে রেখেছিল। ঘড়ি ধরে। তারপর কাগজে তা ছাপিয়ে দিয়ে এমন ফ্যাসাদে পড়েছে। পচা ডিম আর টোমাটো গলির মোড়ে মোড়ে ওকে ধাওয়া করে। আমাদের অধঃপতনের নমুনা। আগে কখনো···

অনুনয় করে তাড়াতাড়ি বললাম,—দোহাই মশায়। আমায় ফ্যাসাদে ফেলবেন না।

সত্যি ফ্যাসাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। লাইনে দাঁড়ানো আরেক জন সব শুনছিল। বেশ ফিটফাট পোশাক-পরা। তবে শৌখীন লক্কা

মার্কা। চুল ইয়া ঝোলানো আর ঝুলপী ইয়া তোলানো। দেখেই মনে হয় ভোটযুদ্ধে না নেমে ছাড়বে না। নিশ্চয়ই জনতার সামনে থিয়েটার করার অভ্যাস আছে।

আন্দাজটা মোটেই বেঠিক হয়নি দেখলাম।

একটু গলা খাঁকারী দিয়ে হাঁকলেন,—মাপ করতে আজ্ঞা হোক মশাইরা। আমি জনমজুরদের এলাকা থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে থাকি। ওদের খুব ভাল করে জানি। সত্যি বলতে কি আমি নিজেও একজন শ্রমিক। আপনারা যখন আরামসে নিদ্রা দেবীর কোলে মজা মারেন আমি তখন কাজ করি।

পার পেলেন না এই মজদুর-দরদী। লাইনের কোন একটা কাছাকাছি জায়গা থেকে একটা মন্তব্য শোনা গেল,—মাস্ট বি এ ব্লুমিং বার্গলার। নিশ্চয়ই কোন ফুটন্ত ছিঁচকে চোর।

হেসে গড়িয়ে গেল সবটা লাইন। ওসব দেশে লোকের মনে রস আছে। ঠাট্টা, ইয়ার্কি কথার পিঠে লাগসই কথা এসব বেশ ভাল চলে। লোকে মজাও পায়। যে শোনায় আর যে শোনে দুজনেই মজা পেয়ে হাসে। "হাত থাকতে মুখ কেন"—বলে প্রশ্ন করতে করতে তেড়ে আসে না।

তবু আমার একটু বাধো বাধো ঠেকতে লাগল।

বাঁচালেন পেছনের সেই ভদ্রলোক। হঠাৎ বলে উঠলেন,—ওই, ওই শুনুন, এলভিস প্রেস্‌লি গান করছে আমাদের জন্য।

এল্‌ভিস প্রেসলি ?

আজকের দিনের সবচেয়ে বেশি টাকা কামায় এই গাইয়ে। শালিয়াপিন বা গুমান বা জিলির গান শুনতে গিয়ে আমরা অন্য জগতের রস পেয়েছি। সুরলোকের রস, ইহলোকের সুরা নয়। কিন্তু দামাল ছেলেমেয়েরা হালে প্রেসলিকে দেবতা বানিয়ে রেখেছে। এই একুশ বাইশ বছরের গায়কের গলায় আর হাবভাবে কি জাদু আছে জানি না।

কিন্তু বাপমায়েরা তার গানের প্রভাবের জন্য যত মাথা ঘামাচ্ছে তাদের ছেলেমেয়েরা ঠিক তত পা নাচাচ্ছে। একটা [illegible] শহরে তার কচি ও কাঁচা ভক্তের দল ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজেদের হাতে ওর নাম খোদাই করে নিয়েছে। আরেকটা শহরে ওকে পুলিশে ঘেরাও হয়ে ভক্তদের হাত থেকে বেঁচে পালাতে হল। কিন্তু বাঙ্গালী কবি লিখে গেছেন :

কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে—না হয় মরণে।

ভক্তের দল পুলিশদের করল ঘেরাও। ওদের মধ্যে কেউ হয়ত এলভিসকে ছুঁয়েছে। সেই লোকটাকে সকলে মিলে ছোঁয়া যাক এবার। বেচারা পুলিশ।

ক্ষণে ক্ষণে এলভিসের পর আরো নতুন এলভিস আসবে। সেটা কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু মার্কিন জীবনের উচ্ছ্বাসের বান যেভাবে ইয়োরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে তা নতুন কথা।

যাই হোক, যে গান করেই বছরে পাঁচ ছ লাখ কামায় আর হাঁকায় খান চারেক ক্যাডিল্যাক, তার নকলটিকেই নাহয় দেখে একটু সময় কাটানো যাক। ভরসার কথা যে মোটে গোটা ছয় আনা ওর টুপীতে ফেলে দিলেই চলবে। তার চেয়ে বেশি লোকসানের ভয় নেই।

হ্যাঁ, ঠিক ওইরকমই মাতাল-করা নাচের ভঙ্গি বটে। কোমর দুলিয়ে, গোটা শরীর নাচিয়ে এই ভিখারীটি গাইছে। ওই ধাঁচেই চুলগুলো সামনে ঝুলে পড়েছে আর হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে মাঝে মাঝে গলায় ঝোলানো গীটারে টুং টাং তুলছে। খাঁটি ককনী টানে গাইছে—আমি তোমায় চাই :

হাই ওয়ান্ট ইউ
হাই নিড্ ইউ
হাই লু হু হু হু হুউ

বেশ বুঝলাম কিসের জ্বালায় বাপমায়ের দল খাপ্পা হয়ে খবরের কাগজে নালিশ ঠুকছে। আর কিসের জাদুতে কচি আর কাঁচারা পুচ্ছটিরে উচ্চ করে নাচাচ্ছে।

বললাম—এলভিস প্রেসলির নকলটা বেশ করেছে কিন্তু।

উনি পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন,—আরে মশাই, সবটাই নকল!

একটু মজার গল্প পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম—কি রকম?

কানের কাছে মুখ এনে উনি ফিস ফিস করে বললেন—যথা, ওই যে সামনের মহিলাটি। বয়স কোন্ না কোন্ ষাট, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন পঞ্চাশ। তাতে অবশ্য আপত্তি নেই। কিন্তু সেজেছে যেন ত্রিশ, আর···

মুখের হাসি চাপা শক্ত হয়ে উঠল। অবস্থাটা একটু সামলে নেবার জন্যই ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—আর?

উনি শেষ করলেন,—আর ভাব দেখাচ্ছেন যেন এই মোটে উনিশ।

সবই নকল, সবই অভিনয়।

জিজ্ঞেস করলাম—তবে সত্য কোনটা?

—সত্য? হ্যাঁ, সম্ভবত এই যে অভিনয়টা দেখবেন এটাই সত্য।

বাঁচা গেল। ভদ্রলোক যে এর চেয়ে গুরুগম্ভীর কিছু বলেননি তার জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

লাইন একটু একটু করে এগোচ্ছে। এতক্ষণে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি তার সামনে ফুটপাথের কোণায় এক ভিখারী শিল্পী। একটা মুখের চেহারা এঁকেছে। সেটার দিকে লাইনের সবার নজর পড়ছে। কিছু পয়সা তাতে উপায় হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সে দুয়েকটা আঁচড়ে মুখের চেহারা বদলিয়ে দিল। এমন চমৎকার ভাবে মুখের আদল আর ভাব বদলিয়ে গেল যে যারা আগে পয়সা দিয়ে এগিয়ে গেছে তারাই কেউ কেউ ফিরে এসে আবার পয়সা দিচ্ছে।

কত রকম আঁকাবাঁকা লাইন সে টানল। কত হিজিবিজি। কিন্তু একটু পরে পরে খড়ির টানে নতুন ধরনের একটা মুখ বেরিয়ে আসে।

একজন ঠাট্টা করে বলল—হুল্লো গভ্‌নর, তুমি দেখছি একেবারে স্বয়ং পিকাসো।

ওদেশে অচেনা বয়স্ক লোককে গভ্‌নর বলে ডাকলে আপত্তির কিছু নেই।

গভ্‌নর কিন্তু ঠাট্টাটা ঠিক বুঝে নিল। হয়ত ঠাট্টা ওকে এই প্রথম যে শুনতে হল তা নয়। সে মাথার টুপীটা নাচিয়ে বলল—ইয়েস স্যার। পিকাসো হচ্ছে স্প্যানিআর্ড। ওর দেশের খেলুড়েরা লাল কোর্তা দেখিয়ে লড়াইয়ের ষাঁড়কে নাচায়। তেমনি করে ছবির সাবজেক্টকে পিকাসো খুশিমত নাচায়। একটু দাঁড়ান, আমি আপনার মুখের আদলটা তুলে নিই। এমনি করে স্প্যানিশ নাচন নাচাব।

লাইনের সবাই ঠাট্টাটায় খুব মজা পেল। এ-যুগের সবচেয়ে নামকরা জীবিত শিল্পী পিকাসোর সম্বন্ধে লোকে বলে যে পিকাসো হচ্ছেন একটা সর্বদা ফুটন্ত আগ্নেয় গিরি। এই গভ্‌নর বলে হাঁক দেওয়া লোকটির মুখও হয়ে গেল এখন যেন একটা টগবগ করে ফুটে ওঠা আগ্নেয় গিরি।

যেমন ঠাট্টা তার তেমন জবাব।

এদিকে মাটিতে হাঁটু গেড়ে যে খড়ির টানে টানে নিজের খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করছে তার টুপিতে টুপটাপ করে পড়ছে পেনী আর এক শিলিংএর বৃষ্টি। ওর ঠাট্টা শুনে আমার এত ভাল লাগল যে খুশি হয়ে আমি ফেলে দিলাম একটা হাফ ক্রাউন অর্থাৎ আড়াই শিলিং। প্রায় পৌনে দু টাকা।

টুপি উঠিয়ে স্যালুট করে সে আমার দিকে এগিয়ে এল। বলল,—

স্তার, আমি ভিখিরী নই, শিল্পী। যদি আপনি ভুল করে হাফ ক্রাউন ফেলে থাকেন, সেটা ফিরিয়ে নিন। এক শিলিংই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

হাত বাড়িয়ে মানা করলাম। বললাম, খুশি হয়েই দিয়েছি। এত সুন্দর কাজের জন্য বেশি দেওয়াই উচিত।

অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল এই জাত-ভিখিরী নয়, জাত-শিল্পী।

কিন্তু শুধু শিল্পই নয়, বিজ্ঞাপনও আছে। এক দিকে পিকাসো, আরেক দিকে একটা ছবি: পিন-আপ গার্ল। মোহময়ী লাস্যময়ী চিত্র-তারকা। তার মধ্যে যা আঁকাবাঁকা তা হচ্ছে যৌবনের শিখা। যা এলোমেলো তা বসনের রেখা।

সেই ভদ্রলোকই শুরু করলেন—যাবেন নাকি ওই সিনেমাটা দেখতে? এই এ্যাক্‌ট্রেসের ফিগার খানা হচ্ছে দেহ নয়, একটা স্বপ্ন।

বললাম,—অনেক তারকারই ত' সে সম্পদ আছে। অভিনেত্রীরা অনেকের জীবনে সুখ এনে দিয়েছে।

উনি উত্তেজিত হয়ে বললেন,—না, না! তফাৎ আছে অনেক। আমি তুরস্কে দেখেছি একটা ছোকরা ওর ছবি দেখতে দেখতে এত দেওয়ানা হয়ে গেল যে নিজের কব্জির শিরা কেটে ফেলল! রাশিয়ানরা নাকি রাগ করে বলেছে যে ওর ছবি এমন সব রঙে আর ঢঙে দেখানটা হচ্ছে কেবল পুঁজিবাদীদের কারসাজি। ওরা এরকম করে জনতাকে তার দুঃখ ভুলিয়ে রাখতে চায়!

হেসে ফেললাম। বেচারী রাশিয়া। আর ততোধিক বেচারা রূপ যৌবন।

তবু বললাম—কিন্তু রাশিয়ান ব্যালে আর থিয়েটার দেখেছি। ওদের প্রিমা ডনা নায়িকারা ত' নেহাৎ কম যান না এ বিদ্যাতে।

—কিন্তু ওরা বলে যে দেহের আবেদনের উপর ওদের নৃত্যশিল্প

মোটেই নির্ভর করে না। ওসব দিকে লোকে নজর দেয় না। কারণ শিল্পই হচ্ছে সুন্দর।

রাজী হলাম না। বললাম—শিল্প অবশ্যই সুন্দর। কিন্তু প্রেম—তা দর্শকেরই হোক আর প্রেমিকেরই হোক—প্রেমই রূপ দেয়।

ততক্ষণে আমরা থিয়েটার বাড়িটার সামনে এসে গেছি। ধাপ দিয়ে উঠতে উঠতে একটা গান মনে এল। এই বছরেরই চালু আমেরিকান গান :

তোমারে কি ভালবাসি রূপসী বলে ?
অথবা রূপসী তুমি ভালবাসি বলে ?
বুঝায়েছি আমি কি তোমারে—
হেরিয়াছি তোমার মাঝারে
এমন রূপসী মনে মনে
যা সত্য হয় না জীবনে ?

মনের উচ্ছ্বাসে গুণ গুণ করতে লাগলাম। থিয়েটার দেখতে চলেছি। মনে যে লেগেছে রঙ।

না। থিয়েটার সেদিন দেখতে পারিনি। টিকিট ঘর পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই সব টিকিট শেষ। আরেক দিন চেষ্টা করে দেখতে হবে। আজ কিন্তু যখন সবটা খতিয়ে দেখলাম তেমন কষ্ট হল না। ওই ভীড়ের মধ্যে হাসি ঠাট্টা, গান আর গল্প, ভিখিরীর ছবি আর জীবনের রাজপথে শিল্পের প্রকাশ—এই বা কম দেখা হল নাকি ?

মনে যে লেগেছে রঙ।

প্রথম অভিনয় রজনী

আস্তে আস্তে মঞ্চের সামনের ড্রপসিনটা উঠে যেতে লাগল।

অধীর আগ্রহে সমস্তটা প্রেক্ষাগৃহ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পুরু কার্পেটে মোড়া মেঝেতে দর্শকের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেছে। যদি কেউ দেরীতে এসে থাকে তাকে চুপ করে দেওয়ালের পাশে ওয়াল ফ্লাওয়ারের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—যতক্ষণ না অঙ্কটা শেষ হয়। কেউ সাড়া শব্দ করছে না। নিশ্বাসও বোধ হয় ফেলছে না। আজ যে এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী।

আর সে অভিনয়ের নায়িকা হচ্ছেন স্বয়ং ভিভিয়েন লী। বিশ্ব-বিখ্যাত অভিনেত্রী। সেই পঁচিশ বছর আগে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় প্রথম দেখেছিলাম। তখন সবে নাম হচ্ছে। লেডি হ্যামিলটনের অমর ভূমিকায় নামার অনেক আগে। তারপর এতদিনে প্রতিভা আর স্বীকৃতির শিখরে দাঁড়িয়ে আছেন ভিভিয়েন লী।

আর ইংরেজের কৃষ্টির ললিত কলার মহান বিকাশ থিয়েটারের একটি প্রথম অভিনয় রজনীতে আবার এসেছি আমি। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বুঝতে পারছি না। কিন্তু বুক ধুক-ধুক করছে।

এমনি ধারা উত্তেজনা আরো একদিন হয়েছিল। তবে সেদিন ছিলাম শুধু ছাত্র। লণ্ডনে গরীব বিদেশী ছাত্র। সেদিনও সামনের জাঁকালো আলো আর ফুলে ঝলমল 'ফইয়ার' অর্থাৎ সামনের গোল কামরা দিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনের কথাটা অবশ্য আজ মনে পড়বার কোন দরকার ছিল না।

কিন্তু সামনের পর্দাটা অন্ধকারের মাঝখানে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। এখনি পিছন থেকে লুকানো আলো এসে স্টেজকে আলোয় আলোময় করে দেবে। পর্দাটা উঠতে উঠতে একেবারে পঁচিশটা বছরকেই উঠিয়ে নিল। সেদিন প্রথম অভিনয় রজনী।

সে একটা বিশেষ দিন নাটকের পক্ষে। আর দর্শকদের পক্ষেও। সেদিন নাট্যকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে দেখা, চাই কি পরিচয়ও হয়ে যেতে পারে। অনেক নামকরা লোক, সাহিত্যিক, সমালোচক আসবেন। চরণকমল পাতবেন অনেক অভিজাত সুন্দরী। আর উদয় হবেন অনেক অস্তগত নটনটী। তাদের বিগত বসন্তের স্মৃতি আর সুরভি বাতাসকে উতলা করে তুলবে। কাজেই প্রথম রজনীর বিশেষত্ব আছে।

আর আছে বিশেষ পোশাক। অর্থাৎ ইভনিং ড্রেস। তা যদি না থাকে তাহলে থিয়েটারের সামনের ফইয়ারের মধ্য দিয়ে ফুলের পর্দাগুলি পার হয়ে সামনের দিকের আসনে এসে বসবেন না যেন। বরং থিয়েটার বাড়ীর পাশের বা পেছনের গলির লাইনে এসে আস্তে আস্তে পেছনের সীটে গিয়ে বসুন। কারণ আটপৌরে পোশাকে সামনে বসা পোষাবে না সেদিন। 'হংসমধ্যে বকো যথা' হয়ে আপনি ওই শীতের মধ্যে ঘামতে থাকবেন। হাড়ে হাড়ে বুঝবেন যে স্টেজের অভিনেতাদের বদলে আপনিই পড়েছেন সবার নজরে।

আজকের প্রথম অভিনয় রজনীর ড্রপসিনটা উঠতে উঠতে সেই দৃশ্যটাই আমার মনের সামনে তুলে ধরল।

সামান্য স্কলারশিপের টাকায় পড়ার খরচ চালাই। চুলো অবশ্য একটা আছে। কিন্তু সেটার সঙ্গে চালের প্রায় অসহযোগ চলে। ঘরের গ্যাসের উনুনে যে ছয়েকটা সখের খাবার বানিয়ে খাব ছুটির দিনে, তেমন রেস্ত নেই। তার চেয়ে হপ্তাভর খাবারের যে খরচাটা ল্যাণ্ডলেডিকে দিই তার মধ্যে ওই বাঁধাধরা খানা খেলেই সস্তা পড়ে।

আর মিডল টেম্পলের খানা অর্থাৎ রাজভোগ মাঝে মাঝে খেতেই হয়। কারণ ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় তুমি আইনের বই কিছুদিন না পড়তে পার, কিন্তু ফি টার্মে তিন রাত্রি করে ওখানে তোমায় খেতে হবেই। তার জন্য নগদ দক্ষিণা গুণে দিতে হয়। কিন্তু বাড়ীতে খাচ্ছ না বলে সেখানে তোমার রেহাই নেই। অর্থাৎ দু জায়গাতেই খাওয়া খরচ দিতে হবে।

এ হেন মূল্যবান ভোজনে মশগুল হয়ে আছি এমন সময় সহপাঠী বন্ধু ভি একটা বিশেষ সুখবর আছে বলে জানাল। থিয়েটারের ক'খানা কমপ্লিমেণ্টারী টিকিট পাওয়া গেছে। ওর বাবা, মা প্রভৃতি যাবেন এবং আমাকেও যেতে হবে। ওর মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন সবাইকে যে, আমি যেন অবশ্যই ওদের সঙ্গে যাই।

লণ্ডনের থিয়েটারের নাম আছে। যে কোন বই হোক, যে কোন থিয়েটারে হোক, বেশ নির্ভয়ে যাওয়া চলে। অভিনয় দেখে পয়সা জলে গেল মনে করে ফিরে আসার ভয় নেই। তাই কি বই দেখতে যাব তা জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলাম না। ধন্যবাদ প্রভৃতি দিয়ে বেশ খুশী মনে এর আগে যে থিয়েটারটা একসঙ্গে দেখেছি তার আলোচনা করতে লাগলাম। চারশো বছর আগে রাণী এলিজাবেথ এই ডাইনিং হলে নেচেছিলেন। এই হলের দেওয়ালগুলো স্পেনের বিরাট নৌবহর আর্মাডার জাহাজগুলির কাঠ দিয়ে তৈরী হয়েছিল। হলের পরিবেশ নাটকীয়তাতে একেবারে ভরপুর। দেওয়ালের উপর টাঙানো বড় বড় অয়েল পেন্টিং থেকে মাথায় পরচুল-পরা চেহারাগুলি পর্যন্ত কেমন তেরছা ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

লম্বা টেলকোটের ল্যাজ হেলিয়ে বাটলার জেলি পুডিংয়ের পাত্রটা আমাদের সামনে রেখে গেল। তার সান্ধ্য পোশাকের কোটের সামনের কালো রেশমে বিজলী আলো পড়ে ঝলমল করে উঠল। মিডল টেম্পলের ছুরি'কাঁটার শাণের বাহারই বা কম কি?

থিয়েটার দেখতে যাবে বলে ভি খুব উৎসুক হয়ে আছে। বলল—ডক, তোমার নোটবুকে তারিখ আর সময়টা ভাল করে টুকে নাও। দেরী করে ফেলো না যেন। একটু আগে পৌঁছোতে পারলেই ভাল। অনেক 'ইন্টারেষ্টিং' লোক আসবে। প্রথম রজনী কি না।

প্রথম রজনী ?

আমার প্রশ্নটি আমার নিজের কানেই একটু যেন কি রকম শোনাল।

কিন্তু ভি সেটা লক্ষ্য করল না। খুশী হয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রথম অভিনয় রজনী। আর সামনের দিকের সীট।

তার পর একটু হেসে যোগ করে দিল—থিয়েটারের অধিকারী নিজে নেমন্তন্ন করেছেন। তার দুই তরুণী রূপসী মেয়ে আছে। মে আর জুন। তারাও আমাদের সঙ্গে বসবে।

আমার চোখ ততক্ষণে অন্য জায়গায় বসে গেছে। স্ট্রবেরীর সিঁদুরে রঙের জেলীর ভিতর থেকে উঁকি মারছে নীচে বাহার করে ছড়ানো আঙুর। রসে টসটসে নিটোল আঙুর। স্নিগ্ধ সবুজ তাদের রঙ। কিন্তু রঙে টক-টক করছে টলটলে জমাট জেলী। চেপে দিয়েছে আঙুরের জৌলুষকে।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ভি আঙুরের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল,—কি ? আঙুরগুলো জেলীর তলায় খুঁজে পাচ্ছ না নাকি ?

শান্তভাবে স্বীকার করলাম—ঠিক বলেছ। সত্যিই আঙুরগুলো আর দেখতে পাচ্ছি না !

—তার মানে ?

—তার মানে হচ্ছে এই যে, থিয়েটারের স্কার্লেট আর গোল্ড, সিঁদুরে আর সোনার যবনিকার পেছনে যে প্রথম অভিনয় রজনীর উদ্বোধন হবে তা দেখা আমার ভাগ্যে নেই।

—সে কি কথা ? উদ্বোধন রজনীতে লণ্ডনে নিমন্ত্রিত হয়ে থিয়েটার দেখা বিশেষ ভাগ্যের কথা। পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবার মত কথা। আর তুমি বলছ—

একটু থেমে সে বলল,—বুঝেছি, তোমার অন্য কোন এনগেজমেণ্ট আছে বোধ হয় সেদিন। তা সেটার তারিখ এখনো বদলে নিতে পারবে নিশ্চয়ই। আমাদের জন্য তা-ই কর। ফর আওয়ার সেক।

দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্যকারের শুধু এনগেজমেণ্ট নয়, একেবারে মধুরজনী যাপন করি। সে কথা ওই কুড়ি একুশ বছর বয়সে কারো কাছে, বিশেষ করে বন্ধু সহপাঠীর কাছে খুলে বলা শক্ত। বলার দরকারও হয় না পশ্চিমের প্রতিদিনের জীবনে। কারণ তোমার ঘর আর তোমার হাঁড়িকে সে দেশে তোমার থেকে পৃথক করে দেখাই হচ্ছে নিয়ম। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে, চেনা-পরিচয়ের এলাকাতে আমি হচ্ছি শুধু আমি। বালিগঞ্জের ফটকওলা প্রাসাদ অথবা বাগবাজারের হাড়-জিরজিরে বাড়ী কোথায় আমার আস্তানা সেটা জরুরী খবর নয়। আমার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বে। বেশে নয়, বাসায় নয়, নয় মনিব্যাগের বহরে।

কিন্তু ভি'র সঙ্গে সম্বন্ধ অন্য রকম। সে নিজেই অজুহাত জুগিয়ে দিয়েছিল। এনগেজমেণ্টের কথা বলে এড়িয়ে যেতে পারতাম। তবু বললাম সত্য কথাটা। ইভনিং ড্রেস নেই।

ভি সে কথা মানল না। বিদেশীর কাছে তাদের সমাজ পোশাকী পোশাক প্রত্যাশা করে না।

তবু রাজী হচ্ছি না দেখে সে বলল যে, সে নিজেও আমারই মত আটপৌরে লাউঞ্জ স্যুট পরে আসবে।

ঠাট্টা করে উঠলাম,—হায়, হায়, তাহলে তোমার মে আর জুন যে জানুয়ারীর বরফে চাপা পড়ে যাবে। তাছাড়া আমার জন্য তুমি

তোমাদের সামাজিকতা ভেঙে সবার নজরে পড়বে, তাতে আমি রাজী নই।

শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়েছিল। ভি'র মায়ের অনুরোধে। আমরা দুজনেই হংসমধ্যে বক নয়, দাঁড়কাকের মত সেজে নাটক দেখলাম।

আজকের ইউরোপে অবশ্য এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। একটা কালোটে লাউঞ্জ স্যুটেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব জায়গায় সব অনুষ্ঠানে ঘুরে আসা যায়। কালোটে 'গ্রে' রঙটার নাম প্রথমে ছিল ক্লেরিক্যাল অর্থাৎ কেরাণী রঙ। এখন সেটা জাতে উঠে নাম নিয়েছে চারকোল অর্থাৎ পোড়া কয়লার রঙ।

সেই থিয়েটার। আবার দেখছি। তবে সেদিন যে নাটক দেখতে যেতাম তার নাম হত হয়ত ব্লসম টাইম, মুকুলের ঋতু। আজ তার নাম হবে স্যালাড ডেজ, কাঁচা সব্জির দিন। সেদিনকার অভিনয়ের বাণীর বদলে এসেছে বীণা। ভাষার বদলে ভাব। অভি-ব্যক্তির জায়গায় নাচগান। বসন্তের দোলা আছে দুয়েতেই। আছে যৌবনের ছোঁয়া। কিন্তু সাধারণ মানবতার পরশে জনতার পথে এসে দাঁড়িয়েছে আজকের থিয়েটার।

কিন্তু তা বলে থিয়েটার তার মান কমায় নি, হারায়নি তার নাম। আভিজাত্য গেছে, কিন্তু জাত আছে ঠিক।

এই ত সেদিন ভিয়েনাতে অপেরার প্রাসাদটি নতুন করে খোলা হয়। যুদ্ধে বোমায় তছনছ হয়ে যাবার আগে যেখানে যেমনটি ছিল ঠিক তেমন সুন্দরভাবে গড়া। ভিয়েনার জীবনের কলকাঠি এই অপেরা হাউস। এমন ধুমধাম করে সেটি খোলা হল যেন একটা ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। ভিয়েনার বন্ধুরা এমন ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন যেন স্বর্গ থেকে কোন্ না কোন্ ভিনাস, মিনার্ভা, জুনো এসে তাতে অভিনয় করবেন। আর সামনের দুয়ার হীরের

কাঠি দিয়ে খুলে দিবেন যেন ইংলণ্ডের তরুণী রাণী, না হয় জাপানের সূর্যবংশধর সম্রাট।

কিন্তু এই ভালবাসা ত জনতারই দান। সেই জনতারই একজন আমি। এসেছি অবশ্য সেই বনেদী আবহাওয়ার নীলরক্তওয়ালা দর্শকদের ভীড়ে প্রথম অভিনয় রজনীতে। তবু জনতার জীবনই হচ্ছে সেই অভিনয়ের বস্তু। সেই জীবনটাই অভিনয়ে ফুটাবেন এখনি ভিভিয়েন লী।

উপরে বক্সে বসে আছেন স্যার লরেন্স অলিভিয়ের—ভিভিয়েন লীর স্বামী। কিন্তু তারও দুচোখ রয়েছে জনতার উপর—তাদের করতালির প্রত্যাশায়।

কাফে নাইট-ক্লাব

মহা ওস্তাদ লোকের পাল্লায় পড়লাম।

আমারই দেশের লোক। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের আমদানি। কিন্তু তার বাক্যের ছটা পোশাকের ঘটাকেও ছাড়িয়ে যায়। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন যে, তার ভারতবর্ষে বিলেতী জিনিসের আমদানির কাজটি হয়েছে পয়মন্ত। সেজন্য ভারী ভারী ডাকসাইটে লোকদের সঙ্গে তাকে উঠতে বসতে হয়। কাজেই স্যাভাইল রো ছাড়া অন্য জায়গায় স্যুট বানালে তার চলে না।

তিনি আমায় 'মন্‌কি' ক্লাবে' নিয়ে যাবেন। একেবারে নাছোড়বান্দা।

নামটা শুনে আমি একটু হেসে ফেললাম দেখে তিনি তাজ্জব বনে গেলেন। এ হেন আকাট অনভিজ্ঞ লোকটা? না শুনেছে এই ক্লাবটার নাম, না রাখে তার বিশেষত্বের খবর। কি রকম লোকদের গভর্ণমেণ্ট চাকরিতে রেখেছে আজকাল? রসকষ নেই, নেই চৌকষ কাণ্ডজ্ঞান।

বিলাতের বড় আর বনেদী ঘরের তরুণীদের সোসাইটিতে ফর্মালি অর্থাৎ কায়দামাফিক ঢাক ঢোল পিটিয়ে বের করবার আগে এখানে প্রথমে হাতে খড়ি দেওয়া হয়। ফিনিশিং স্কুল বলতে গেলে। অর্থাৎ, মনের সহজ সরল ভাবটুকু আর ব্যবহারকে ঘষে মেজে শেষ করে দেওয়া হয়।

ওস্তাদ আমায় বিশ্বস্তভাবে জানালেন যে, হালফিল সেখানে একটা বিশেষভাবে ঘরোয়া পার্টিতে এহেন কোন তরুণীর কোটিপতি বাবার

পার্টিতে খানা কামরায় রূপোর ফোয়ারার সোনালী শ্যাম্পেন উপচিয়ে পড়েছিল। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে জোগাড়-করা ঝিনুকের তৈরি কাপে করে সে শ্যাম্পেন সবাই খেয়েছিল।

ঠাট্টা করে বললাম—একেবারে মিশরের ক্লিওপেট্রার পার্টি মনে হচ্ছে।

উনি আহত হলেন—বিশ্বাস করছেন না? তবে শুনুন, আমি, এই আমি যে এত সব নীলরক্ত-ওলা অভিজাতদের মহলে ঘোরাফেরা করি, আমারও কেমন একটা দিশেহারা ভাব হয়ে গেছল সেদিন। রাতে হোটেলে ফিরে ট্যাক্সিওলাকে ভাড়া গুণে দেওয়ার বদলে গোটা মনিব্যাগটাই দিয়ে ফেলেছিলাম।

আবার ঠাট্টা করলাম—আর আপনার হৃদয়খানা দিলেন কাকে?

ফোঁস করে উনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—হৃদয়খানা কাকে যে ঠিক দিয়ে ফেলেছি ধরতে পারলাম না। সেদিন মে ফেয়ারে একটা খুব 'এক্সক্লুসিভ', ঘরোয়া রেস্তোঁরায় লেডি অমুকের চাঁদনী রাতের খানা ছিল। ষাটজন বিজলী মিস্ত্রী আর ঘর সাজানোর আর্টিস্ট মিলে ঘরখানাতে চাঁদিনী রাতের আলোর মত আলো সৃষ্টি করেছিল। সিমলা পাহাড়ে নিশ্চয়ই আপনি গেছেন। সিমলার কুয়াশায় ঢাকা চাঁদের আলোর মত। সেখানে সব সেরা সুন্দরীদের নেমন্তন্ন ছিল আর ডাকসাইটে ডিউক আর মার্কুইসদের। তাদের নামগুলো নোটবুকে টুকে রেখেছি।

হেসে ফেললাম। এমন বিষয়ী অথচ বোকা লোকের ঠ্যাং টানাটানি করতে মজা লাগে। বললাম—তার পরদিন সকাল থেকে আপনার হয়রাণীর অন্ত রইল না। সব্বাইকে জানাতে হবে কাদের কাদের বনেদী ছোঁয়াচ আপনি পেয়েছেন। যাকে টেলিফোনে পেলেন না, ট্যাক্সি করে তার বাড়ি বয়ে খবরটা দিয়ে আসতে হবে। খোলাখুলি নয়

অবশ্য। পাকে-প্রকারে 'বাই দি ওয়ে' নিশ্চয়ই জানিয়েছেন। ট্যাক্সি-খরচটা আপনার বিফলে যাবে না, তা হলপ করে বলতে পারি।

উনিও উৎসাহ পেয়ে বললেন—এই ত' বেশ বুঝতে পেরেছেন আপনি। এই যে খরচটা আমি করছি এটা ত' মূলধন খাটানোর সামিল। খাওয়াটা ত এদেশে শুধু খ্যাঁট নয়। ভোজন শুধু পেটপূজোই নয়, ওটা হচ্ছে পরিচয়।

হাতে হাতে তার পরিচয় পাচ্ছি। কাজেই ভদ্রলোকের সঙ্গে 'মন্কি ক্লাবে' গিয়ে খাওয়া চলবে না। সে সময়টা কাটাব কোন কাফেটেরিয়াতে সবার মাঝখানে বসে বা দাঁড়িয়ে খেয়ে।

গত মহাযুদ্ধে ইয়োরোপে শুধু শহর কলকারখানাই ভাঙেনি। ভেঙেছে মানুষের শিক্ষা, সমাজ, ভবিষ্যৎ। সে সব গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। খুব চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সংসারে অনেক কিছুই অল্প সময়ে গড়ে তোলা যায়। কেবল মন বাদে। এত বছর যুদ্ধের জন্য চলেছে কষ্ট আর বিপদ। তার পর এসেছে ব্যবহারের জিনিসের অভাব। বিদেশের টাকা রোজগারের তাগিদে ভোগের সামগ্রী সব অন্য দেশে চালান যেত। এখন মোড় ঘুরে এসেছে। জার্মানীতে, ফ্রান্সে, ইটালীতে, ইংলণ্ডে পাল্লা দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। দেশের সরকার যতই চেঁচাক যে পকেট সামলাও, পকেটে রেস্তর অভাব নেই। নেই কাজের অভাব বাজারে। তেমনি নেই বসবার জায়গা খাবার টেবিলে। যে কোন ভাল জায়গায় খেতে চাই—আগে থেকে টেবিল রিজার্ভ করতে হবে। সঙ্গে থাকবেন পৃথিবীর বহু দেশের প্রতিনিধি আর নেতা। সেই সব গণ্যমান্য লোক যাদের সঙ্গে কনফারেন্স করতে হয়। সারাদিন 'শপ টকিং'-এ প্রাণ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় সেই দুঃখের কথা বলি কাকে? বললেই ওরা বলবেন দ্রাক্ষারসে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে। তার রঙে রাঙিয়ে নিতে মন।

তাই মাঝে মাঝে সুবিধা পেলেই সটকে পড়ি। যেখানে খুশী, যে

দিকে শুঁ চোখ যায়। কোন জায়গায় টেবিল খালি যদি না পাই, তার জন্যে পরোয়া করি না। কিউ-এ দাঁড়াবার সৎসাহস আছে। তাতেও যদি না কুলোয় কোন 'ফিশ বারে' ঢুকে মাছ আর আলু-ভাজা, স্যাণ্ডুইচ আর কফি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাব উঁচু দাঁড়ানো টেবিলের সামনে। আমারো লক্ষ্য পেটপুজো নয়—পরিচয়। নিজের নয়, এদেশের লোকের।

জনতা বান্ধব মোর, শ্রীচরণ সাথী
আমি কি ডরাই, সখি, অজানা পথেরে?

একটা নতুন জায়গায় আজ খেতে এলাম। একা। কোন পিছুটান নেই। অর্থাৎ দৌড়ে কাজে ফিরে যেতে হবে না। জায়গাটা কাফেটেরিয়া, অর্থাৎ নিজেকে নিজের খাবার বেছে তুলে নিতে হবে। কেউ টেবিলে খাবার পরিবেশন করবে না, জলের গেলাস এগিয়ে দেবে না। তেমনি উঠে যাবার সময় কারো জন্য দক্ষিণা রেখে যেতে হবে না। আড়াই টাকাতে যা খেতে দেয়, যা গান-বাজনা আর যা ঘর-সাজানোর বাহার তার তুলনা হবে না চৌরঙ্গি পাড়াতে কোন জায়গায়।

অবশ্য ডেইমলার মোটর কোম্পানির বড় সাহেবের লেডি তার সোনার পাতে মোড়া আফ্রিকার জেব্রার মত ডোরাকাটা মোটরে চড়ে এখানে খাবার জন্য আসবেন না জানি। কিন্তু সে লোকশান তারই। আমার নয়।

আমি বসে বসে পশ্চিমের মানুষ দেখতে লাগলাম। সাধারণ মানুষ। সাধারণ সাজগোজ, কিন্তু মোটের উপর ফিটফাট। অর্থাৎ ধরুন রুজ পাউডারের আলপনা আছে অবশ্য মেয়েদের মুখে, কিন্তু এনামেল করা হয়ত নয়। মনে মনে বললাম, পেতল যদি ঘষে মেজে সোনার মত ঝকঝকে হয়, তা দেখে খুশী হব। কিন্তু সোনালী জলে ধোয়া চকচকে পেতল চাই না।

অর্কেস্ট্রা বাজছে। অনেক টেবিলে বসেছে জোড়া জোড়া লোক—স্ত্রী আর পুরুষ। স্ত্রী আর স্বামী না হতে পারে, কিন্তু বন্ধু আর বান্ধবী। পেট ভরানোটা গৌণ, আসলে ভরবে মন। আর কিছু না হোক খাবার সময়টুকু হয়ে উঠবে মধুময়। খাবার জিনিসগুলো মনে হবে বেশী সোয়াদের। বেশ কয়েকজন মেয়েকে দেখলাম এমন ভাবে ব্যবহার করছে, নিজেকে তুলে ধরছে যেন কতই তারা সুন্দর। মনে মনে ভাবলাম, ওইটুকুই বোধহয় ওদের আকর্ষণের গোপন কারণ। রূপ নয়, তার ভাবনটুকুই ত' মানুষকে টানে।

সামনে একটা বড় চৌকির ওপর অর্কেস্ট্রা বাজানো হচ্ছে। তার পিছনে একটু সামনের দিকে হেলানো বিরাট আয়না-মোড়া দেওয়াল। তাতে সব লোকদের ছবি ফুটে উঠেছে। যারা খাচ্ছে, খাবার আনছে বা খালি টেবিলের সন্ধানে ঘুরছে, সবারই ছায়া তাতে ভেসে উঠছে। কেউ আড়াল করে দাঁড়ালে ছায়া সরে যাচ্ছে; আবার হয়ত দেখা যাচ্ছে একটু পরে।

সেই আয়নায় মানুষের আনাগোনা হাবভাব দেখছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে নয়া দিল্লীতে ঘাসের উপর শুয়ে আকাশের তারা দেখি। এখানে আয়নার আকাশে যারা ভেসে আসছে, তারা ত মনকে তারার চেয়ে কম টানছে না।

কিন্তু আমার ঠিক পেছনে এই মুখটি কার?

আবার ভালো করে দেখলাম। কোথায় দেখেছি? নিশ্চয়ই দেখেছি। কিন্তু যার চেহারার সঙ্গে আদল আসে সে কি এখনো এদেশে? শেষ তার খবর পেয়েছিলাম পনের ষোল বছর আগে। দূর থেকে শোনা খবর। জার্মানরা তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ঝরাচ্ছে লণ্ডনের উপর। বহু ভারতীয় ছাত্র তখন বিলেতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে আসন গেড়ে ফেলেছিল। কিসের মোহে বা টানে তা তারাই জানে। কিন্তু বাপ-মায়ের বহু চোখের জল, হয়ত স্ত্রীর চিঠি আর

মানত যা করতে পারেনি, হিটলারের হামলা তা করে দিল। ঘরের ছেলে অনেকেই বোমার তাড়ায় সুবোধ বালকের মত সুড়সুড় করে ঘরে ফিরে এসেছিল। আমাদের রামুও। কিন্তু বৌবাজারের মোড়ে সে পুরানো দিনের বন্ধুদের নাকি উদাস ভাবে বলেছিল যে দেশে মন টিকছে না। বোমা মাথায় করেই সে বিলেতে ফিরে যাবে। মায়ের মাথার দিব্যি তাকে দেশে টেনে রাখতে পারেনি।

সেই রামু ?

এই শীত, স্বাস্থ্য আর যৌবনের দেশে রামুর চেহারা এত ভাঙা আর পোড়া হতে পারে ? অমন টকটকে রঙ, যা ইংরেজের পাশে পাল্লা দিয়ে দাঁড়াতে পারত, অমন সুঠাম তরুণ চেহারা—না, অন্য কেউ হবে হয় ত।

তবু আড়চোখে মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাতে লাগলাম। সোজাসুজি এক নজরে কারো দিকে তাকানো অভদ্র, চোরা চাহনী আরো অভদ্র। কাজেই এমন ভাবে তাকাতে হবে যাতে ধরা ছোঁয়া না যায়।

একবার সামনে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকও আমার দিকেই চেয়ে আছেন। এবার আর কোন সঙ্কোচ করলাম না। সোজাসুজি তাকালাম। একেবারে চোখের উপর চোখ রেখে —অবশ্য আয়নার মধ্যে।

চট করে তিনি উঠে পড়লেন, সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললেন —তুমি নিশ্চয়ই 'ডক' ?

—হ্যাঁ—তুমি নিশ্চয়ই রামু। বস, এই খালি চেয়ারটায় এসে বস। দাঁড়াও, তোমার খাবারের ট্রে অর্থাৎ বারকোষটা আমার এই টেবিলেই নিয়ে আসি। কিউয়ে দাঁড়ানো কোন যুগল টেবিল খালি করে দেওয়ার জন্য তোমায় মনে মনে আশীর্বাদ করবে।

—না, ডক, তুমি ঠিক আগের মতই রয়ে গেছ। চেহারা আর মন দুয়েতেই।

—আর তুমি, মনে হচ্ছে, অনেক অভিজ্ঞতার পোড় খেয়েছ।

রামু চুপ করে রইল।

আমি উঠে গিয়ে ওর জন্য এক কাপ গরম কফি নিয়ে এলাম। না, এ ভাবে পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালানোর চেষ্টা করা ঠিক হয়নি।

কফিতে চিনি নাড়তে নাড়তে রামু বলল—ডক, তুমি যে এদেশে এসেছ তা খবরের কাগজে দেখেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে নালিশ করলাম—বাঃ, তাহলে ইণ্ডিয়া হাউসে টেলিফোন করে খবর দিলে না কেন? অন্তত নিজের ঠিকানাটা যদি রাখতে, আমি দৌড়ে তোমার কাছে যেতাম।

রামু খুশী হয়ে বলল,—কিন্তু নিশ্চয়ই ওয়েস্ট এণ্ডের কোন হোটেলে তোমায় ওরা উঠিয়েছে। কি করে জানব তুমি কতটা বদলিয়ে গেছ। তা, এখানে এসে খাচ্ছ যে? ব্যাপারটা কি?

আমিও হেসে বললাম—ব্যাপার খুব সোজা। মনে আছে সেই প্যারিস অভিযানের কথা? সেই নিরাহারের সাধনা? সেই কোটিপতিতে ঠাসা 'ক্যাফে দ্য লা প্যা'র সামনে ঘোরাঘুরি?

—মনে আবার নেই? জীবনে অনেক কিছু ভুলব। কিন্তু যে সব জিনিস ভুলব না তার মধ্যে একটা হচ্ছে সেবার প্যারিস বেড়ানোর কথা। আরো কয়েকবার গিয়েছি সেখানে। কিন্তু তখন যেমনটি মনের মধ্যে নাড়া দিয়েছিল তেমনটি আর কখনো হয় নি।

তখন ছাত্র অবস্থায় আমরা দু'জনে সস্তায় কন্টিনেন্ট অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা দেশ স্পেন বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে পকেট গড়ের মাঠ অবস্থা সত্ত্বেও ঘোড়া রোগে ধরল। অর্থাৎ প্যারিস দেখতে হবে ফেরার পথে। পথে পথেই ঘুরতে ঘুরতে কাফে দ্য লা প্যার সামনে এসে হাজির হলাম। আমরা কৃষ্টির খাঁটি সন্ধানী ছিলাম কি না—তাই।

রামু একটু বারণই করেছিল। বলেছিল—ভাই, কাজ নেই ও সব বড়লোকের আড্ডা দেখতে গিয়ে। ঘ্রাণেন অবশ্য অর্ধ-ভোজন হয়। কিন্তু আমাদের কপালে তাও হবে না। লম্বা লম্বা কাঁচের জানলা-দরজার বেড়া এড়িয়ে শুধু কফির গন্ধটুকুও বাইরে আসবে কি না সন্দেহ।

আমি মানিনি।

এক মাথা-ঝাঁকুনীতেই ওর বারণ উড়িয়ে দিলাম,—আরে, প্যারিসে এসে যদি এই কাফেতেই না গেলি তা হলে বৌবাজারের সেই সাঙ্গুভ্যালি কেবিনই তোর কালচারের শেষ পরিচয় হয়ে থাকবে। সেটা কত বড় আপসোসের কথা হবে একবার ভেবে দেখ।

কালচারের কথাতে রামু নড়ে চড়ে উঠল। বটে? এত বড় কালচারের কেন্দ্র হচ্ছে এই কাফে?

রামুকে আরো তাতিয়ে দিলাম। বললাম—জানিস না যে মোঁপাসা আর জোলা সব সময় ওখানে খেতে আসতেন? প্যারিসের যত বড় সাহিত্যিক, সুরকার, গীতিকার সবারই পেয়ারের আড্ডা হচ্ছে ওখানে। একটা চলতি কথা আছে যে কাফে দ্য লা প্যা-তে যদি খানিকক্ষণ বসে থাক তাহলে যারা যারা সংসারে দেখার যোগ্য তাদের সবাইকেই দেখতে পাবে।

এরপর আর রামুর আপত্তি থাকতে পারে না। তবু সে গাঁই-গুঁই করতে লাগল—ভায়া, সবই ত' বুঝলাম। কিন্তু টঙ্কার হিসাব কবে দেখেছিস? কত ফ্রাঙ্ক বাকি আছে পকেটে?

আমি ততক্ষণে প্রায় আকাশে উঠে গেছি। পরনে সেই মামুলী গ্রে-ব্যাগ অর্থাৎ সাদামাঠা ফ্লানেলের পাৎলুন—যা পরে সব ছাত্রই সস্তার পোশাকে কলেজের জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু যেন সদ্য স্পেনে দেখে-আসা ষাঁড়ের লড়াইয়ের নায়কের আলোঝলমল ব্রোকেডের পোশাক পরে আছি এমন একখানা ভাব। বুক ফুলিয়ে

বললাম—ডুমার কথা জানিস না? আলেকজাণ্ডার ডুমা? বেচারার প্যারিসে পৌঁছবার পয়সাও ছিল না। তিনি গ্রামের পথে পথে সরাইখানাতে বিলিয়ার্ড খেলে ছশো গেলাস আঁবসাত, মারাত্মক নেশার মদ, উপায় করেছিলেন। কিন্তু নেশা না করে তার বদলে নগদ টাকা নিয়ে প্যারিসে এসেছিলেন। আর আমরা সেই প্যারিসে এসে পড়েছি। ভেবে দেখ, কতটা এগিয়ে এসেছি আমরা।

রামু হারবার পাত্র নয়। তেড়ে শুধিয়েছিল—তা তুই বুঝি ডুমাকে নকল করতে চাস?

প্রায় আকাশে চোখ তুলে জবাব দিয়েছিলাম,—নকল নয়, অনুসরণ বরং বলতে পারিস। ডুমার হিংসুটে বন্ধু লেখকরা বলত যে, তিনি তাঁর রচনার অনেক জায়গা কলমের বদলে কাঁচি দিয়ে লিখতেন। মানে, শেক্সপীয়র, শীলার, গ্যেটে, হুগো এদের লেখা থেকে টুকরো টুকরো কেটে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে নিজের লেখা বলে চালিয়ে দিতেন। কিন্তু ডুমা তার কি উত্তর দিয়েছিলেন জানিস? একটা কাঁচি পাঠিয়ে দিয়ে বন্ধুদের অনুরোধ করেছিলেন—তোমরাও একবার চেষ্টা করে দেখ না।

রামু বলেছিল—সে সময়কার ফ্রান্সের সাহিত্যে তিনজন পুরুষ-সিংহ ছিলেন। তাদের সবাই লিখেছেন এন্‌তার, প্রেম করেছেন বেহিসাবে, টাকা উড়িয়েছেন হেলাফেলা। ব্যালজাক সবচেয়ে বড় ঔপন্যাসিক, হুগো সবচেয়ে বড় কবি। হুগোর কলমের আঁচড়ে ফ্রান্সের প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেয়েছিস তুই। কিন্তু এখন তুই পড়লি ডুমাকে নিয়ে।

ওষুধ ধরেছে দেখে বললাম—তার কারণ আছে। ডুমা খেতেন সবচেয়ে বেশী। আমিও খাবার জায়গা কাফেতে যাবার কথা বলছি।

মাথা নাড়ল রামু—উঁহুঃ, তুই যে কত বড় খাইয়ে তা জানা আছে। শুধু কাফে নয়, অন্য কোন কারণও আছে।

আমিও মাথা নাড়লাম। তবে উল্টো দিকে। বললাম—ভুলিস না যে ভয়ানক খরচ, উড়নচণ্ডেগিরি আর ক্যানক্যান নাচের নন্দন-কানন হচ্ছে এই শহর। ডুমাকে লোকে বলত প্যারিসের মুকুট-না-পরা রাজা। ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ একদিন রেগে খবরের কাগজ ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। রাগেব খুব ন্যায্য কারণই ছিল। কাগজে রাজার চেয়ে ডুমার খবর থাকে বেশী। প্রধান মন্ত্রী তার শত্রুপক্ষের প্রকাশিত খবরের কাগজে চাঁদা পাঠিয়েছিলেন গোপনে। লিখেছিলেন যে ডুমার থ্রি মাস্কেটিআর্স ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ যখন বন্ধ হবে, তখন যেন কাগজটা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। একবার নাকি এক সার্জন রোগীকে অস্ত্র করে অপারেশন করবার সময় ক্লোরোফর্মের বদলে ডুমার বই রোগীকে দিয়েছিল। রোগী যখন বইয়ে মজে গেল তখন সার্জন কাটা চেরা আরম্ভ করেছিল। রোগী বেচারা টেরও পায়নি নাকি।

অবাক হয়ে রামু জিজ্ঞেস করেছিল—এত সব খবর জোগাড় করলি কোথায় এরি মধ্যে

হেসে বললাম—বা রে, এই যে রাস্তায় রাস্তায় গুণী লোকদের সঙ্গে ভাব করে বেড়ালাম, চাটের দোকানে কফির কাপ হাতে নিয়ে আড্ডা দিলাম, সে কি শুধু শুধু? জানিস, সবচেয়ে আধুনিক ঠাট্টা কি সংগ্রহ করেছি এখন? ডুমা একজন অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন যে সবচেয়ে গোপনে রাখা সিক্রেট আছে তাঁর স্ত্রীর। লোকে অনেক ঝুলোঝুলি করতে লাগল ব্যাপারটা জানবার জন্য। শেষ পর্যন্ত ডুমা বললেন—আমার গিন্নির কঙ্কালখানা হচ্ছে প্যারিসের বেস্ট কেপ্ট সিক্রেট। কারণ তার মত এমন নধর গোলগাল চর্বিভরা দেহ আর কারো নেই।

প্রাণখোলা হাসির ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে রামু আবার

পুরোনো ধাক্কাটা খেল। পকেটে যে আরশোলা ডন মারছে তার কি হবে?

কিন্তু আমি তাতে ডরাইনি। ডুমার আরেকটা গল্প শুনিয়ে দিয়েছিলাম। ডুমার যখন মর-মর অবস্থা তখন তাঁর টাঙানো জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাঁর ছেলে কেঁদে ফেলেছিল। মোটে গোটা কয়েক ফ্রাঙ্ক পড়ে আছে সেখানে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় ডুমা খুশী হয়ে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—ঠিক ওই ক'টা ফ্রাঙ্ক নিয়েই আমি প্যারিসে উদয় হয়েছিলাম। একটু ভেবে দেখ। পঞ্চাশ বছর ধরে 'হাই লিভিং' করলাম। কিন্তু তার জন্য একটুও খরচ করতে হল না পকেট থেকে।

শেষ পর্যন্ত রামুকে তখন রাজী করাতে পেরেছিলাম কাফেতে যেতে। ডুমার মত একটুও খরচ করব না পকেট থেকে, এই শর্তে। সামনে থেকে ঘোরাফেরা করে দেখেছিলাম। রামুর মনে ছিল জ্বালা আর আমার মুখে ইতিহাস। ওকে বলেছিলাম—ভাবিস না, একদিন এই কাফেও আমাদের মত রেস্তহীন কিন্তু রসিক লোকদের চেয়ার দিয়ে ধন্য হবে। ফরাসী মনীষীদের ইতিহাস তাই বলে। বংশ আর টাকা দিয়ে এদেশে মাথার ওজন বিচার করা হয় না।

রামু কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পায়নি।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে আর প্রুসিয়ায় যুদ্ধের পরের বিপ্লবের সময় কাফের সামনের রাস্তায় পা ছড়িয়ে আরামে চোখ বুজে একজন শ্যাম্পেন চাখছিল। হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুষি দেখিয়ে চলতি পথের যাত্রী একজন গরীব লোক বলে ওঠে—'ওই তুমি, তোমায় গত বিপ্লবের সময় পাকড়াতে পারিনি; কিন্তু আসছে বিপ্লবে তোমায় দেখে নিব।' সেই দেখে নেওয়া এখনো হয়নি বলে কুড়ি বছর আগে রামুর আপসোসের শেষ ছিল না।

রামু কেন, অনেক মহারথীই এই কাফের কাছে হার মানতে বাধ্য

হয়েছিল। জার্মানরা যখন ফ্রান্স দখল করল তখন হিটলারের অনুচররা একে জার্মান সামন্তদের ক্লাবে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি। তাদের হঠিয়ে যখন মার্কিনরা ফ্রান্সে এসে হাজির হল, তখন তারাও এর ওপর নজর দিল। পোড়া প্যারিসে অফিসারদের মেজাজ খুশী রাখবার মত জায়গা নাকি নেই। তাই এই কাফেকে রিকুইজিসন করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সেনাপতিদের মধ্যেই একজন মাটিতে পা ঠুকে বাধা দেন—বটে, কাফে ছ্য লা প্যা জবরদখল করে নিতে চাও? তার চেয়ে নোটর ড্যাম গীর্জাটাই জবরদখল করে নাও না কেন

সেই কাফের কথা এখন ওঠায় রামু জিজ্ঞেস করল—গিয়েছিলি নাকি আবার সেইখানে? এবারে নিশ্চয়ই কাঁচের পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে আসিস নি?

খুব ভরসা দেখিয়ে জানালাম যে আর সে ভয় করতে হবে না কাউকে। কাফের প্যাসিফিক স্ন্যাক-রুমের চেহারা অনেক বদলিয়ে গেছে। অনেক আধুনিক আর সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক হয়ে গেছে। তবে সবই সোশ্যালিস্ট সরকারের নজর আর খবরদারীতে করতে হয়েছে।

অবাক হয়ে গেল রামু। কেন? সরকাবের হাত কেন পড়েছে এতে?

হেসে জানালাম, ফরাসী সরকার কাফেটাকে একটা শিল্পকলার প্রতীক বলে ধরে নিয়েছে। আর খাবারেব নামের বাহারই বা কি? কুচি করে কাটা মুর্গীর মাংস আর তাজা ব্যাঙের ছাতা দিয়ে তৈরি প্যাসিফিক নাইটমেয়ার, প্রশান্ত মহাসাগরের রাতের দুঃস্বপ্ন, দাম মোটে চার টাকা। নরম কাঁচা সব্জীর সঙ্গে পাঁঠার হাঁটুর কাছের চর্বিওলা মাংসের পিঠে; নাম তার রোমিয়ো-জুলিয়েট স্টেকি, দাম মোটে সাত টাকা।

রামুর নরম মনে আঘাত লাগল। সে বলল—থাক, থাক। আর শুনতে চাই না। আমেরিকানরা জীবনে কোন ডিসেন্সি, শালীনতা টিকতে দেবে না। তাই ওদের খাবারের নাম হচ্ছে হট-ডগ। ওই নামের জন্যেই এত স্বাদের ডিনার রোল রুটির মধ্যে কেটে বসিয়ে দেওয়া মাংসের খাবার আমার খেতে ভাল লাগে না। কি বিশ্রী রুচি রে, বাবা! হট-ডগ অর্থাৎ গরম কুত্তা!

আবার ভরসা দিলাম—রুচির চেয়ে রূপেয়া অনেক দামী, সে কথা ভুলো না। কাফেতে ফরাসী পনীরের বড়া আর কাঁচা সব্জী মিশিয়ে যে চমৎকার গোল-গাপ্পা বানায় তার নাম দিয়েছে আমেরিকান হাশ পাপি, চুপ রহো কুত্তার বাচ্চা।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল রামুর। সে বলল—শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সেও ওই কাণ্ড? ওদের প্রাণের রস, মনের রুচি সব কি শুকিয়ে এসেছে?

পালটা প্রশ্ন করলাম—না। অন্তরের রুচি আর রস দুই-ই ঠিক আছে। কিন্তু তা বলে বাইরের রূপ বদলাবে না কেন? যুগের সঙ্গে তালে তালে না চলতে পারলে তুমি পিছু হটে যাবে। শুধু তাই নয়। টিঁকতেই পারবে না। দেখ না আমাদের নিজেদের দেশের দিকে তাকিয়ে। কত বছর তুমি ত দেশে আসনি। হয়ত সব খবর রাখ না। একবার দেখে যাও। এই স্বাধীনতার পর সাত বছরে আমরা যা বদলিয়ে গিয়েছি সাতশ বছরের ইতিহাসেও তা বোধ হয় কেউ ভাবতে পারত না। মনুর বচন আউড়ে মনের বাণীকে আমাদের সমাজ আর চেপে রাখতে পারছে না।

পাইপে নতুন করে তামাক ঠাসতে ঠাসতে রামু বলল—দেশ কেন, বিশ মাইল সমুদ্র পেরিয়ে ফ্রান্সেও আমি যেতে পারব না। কিন্তু বলো তোমার হাশ পাপির কাহিনী।

নিজের দেশের রঙ কত বদলিয়ে যাচ্ছে তার খবরের চেয়ে কাফের কাহিনী আজ রামুর কাছে বেশী দামী। এর ভেতরে একটা গভীর

মানে আছে নিশ্চয়ই। আছে কোন গোপন রহস্য। আমি দেশে ফিরে এলে রামুর বাবা-মা খবর পেলে ছেলের সংবাদ নিতে চাইবেন। কিন্তু সোজাসুজি হুড়মুড় করে সে রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলে না।

তাই কাফের কথাই কয়ে চললাম। জানালাম যে এসব ধরণ-ধারণ না বদলালে কাফে গণেশ ওলটাতে বাধ্য হত। জানই ত, গণেশ ওলটানো ওদের মন্ত্রীসভার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

মাথা নেড়ে রামু জানাল যে, সে কথা সে জানে।

হেসে বললাম—কাফের সামনের ফুটপাতে ছড়ানো টেবিল-গুলোতে লোকে কফি আর আপারেটিফ (হাল্কা মদ) নিয়ে বসে থাকত। ভেতরে ঢোকবার মুরোদ নেই বলে বাইরে চেয়ার জাঁকিয়ে রাজা-উজীর মারত। সব চেয়ে খোসগল্প ছিল প্রধান মন্ত্রীর ট্যাক্সি সম্বন্ধে। একদিন নাকি প্রধান মন্ত্রী বেচারা ট্যাক্সি করে দপ্তরের সামনে এসে ট্যাক্সিওলাকে বললেন—একটু সবুর কর; আমি এখনি ফিরে আসব।

চড়া মেজাজে ড্রাইভার বলল—আমার দাঁড়াবার সময় নেই, মঁসিয়ে। এই আমি রওনা হচ্ছি।

মঁসিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে হাঁকলেন—জান? আমি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী!

ড্রাইভারও বুক ফুলিয়ে গোঁফে চাড়া দিল—ওঃ, তাহলে আমার আপত্তি নেই।

'হুঁঃ, কেমন জব্দ এখন বাছাধন'—এহেন একটা ভাব দেখিয়ে প্রধান মন্ত্রী খুশী হতে যাচ্ছেন এমন সময় শুনতে পেলেন ড্রাইভারের বাকী টিপ্পনীটুকু ঃ তা হলে আমার আপত্তি নেই। কারণ বেশিক্ষণ তাহলে আমায় অপেক্ষা করতে হবে না।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে রামু বলল—তাহলে ব্যুইয়া ব্যা গু মেরিয়াস নিশ্চয়ই খেয়েছ এবার?

ভূমধ্যসাগরের শৌখিন মাছ 'রাসকাসে' দিয়ে তৈরি এই খাবার।

আগে আমাদের মত ছাত্র এসব খাবারের শুধু গল্পই শুনত। একটা ডিশের যা দাম তার সঙ্গে ধরে দিতে হবে বেয়ারার দক্ষিণা। মহারাজার মত রেস্ত না থাকুক, 'টিপ' দিতে হবে রাজারাজড়ার মত। কিন্তু এখন সেই খাবারটা কাউন্টারে নগদ দাম ফেলে দিয়ে নিজে হাতে করে টেবিলে এনে খাওয়া যায়। তবে রেস্তোরাঁর মালিকরা আশা ছাড়েনি। দূরদর্শী ব্যবসাদার। জানে যে যে-সব টুরিস্ট হাশ পাপি আর কোকো-কোলা খেতে ঢুকবে, তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত ট্র্যাডিশনের জন্য সোহাগে উথলে উঠবে। বুক-পকেটের তলায় টিপে দেখতে দেখতে পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকবে। সেখানে ব্যাঙের ঠ্যাঙ পরিবেশন করা হয়। আর—আর ক্যাইনাক ব্রাণ্ডি, যা একশো বছর আগে তৈরি করে মাটির তলায় রেখে বনেদী করে তোলা হচ্ছে।

কিন্তু এসব ত হল গিয়ে বাজে কথা আর খবর। আমি জানতে চাই রামুর কথা, রামুর খবর। প্রায় দু' যুগ পরে দেখা। এত বদলিয়ে গেছে আমার বন্ধু। যেন একটা জন্মান্তরের ওপার থেকে ফিরে এসেছে। তুই থেকে সে আজ তুমিতে দাঁড়িয়েছে।

তাই একটু বুঝে শুনে কথাটা পাড়লাম। সেজন্যেই এতক্ষণ ধরে এত পুরনো দিনের স্মৃতি মন্থন করলাম। কেবল সুবিধামত আবহাওয়া তৈরি করার জন্য।

শেষ পর্যন্ত সে নিজেই আমায় তার ঘরে আসতে নিমন্ত্রণ করল। দুপুরে সস্তা হবে বলে নিজে হাতে রেঁধে খায়। আমাকেও সেদিন তার ঘরে খাওয়াবে।

আমার হাতে অনেক কাজ। দুপুরে খাবার সময়ও কাজের হাত থেকে রেহাই থাকে না। তবু সে পীড়াপীড়ি করল যে আসতেই হবে। অনেক বছরের কথা জমে ভাবী হয়ে আছে তার মন। সত্য কাহিনীটা অন্তত একজনকে বলে সে হালকা হতে চায়।

'তুমি' এখন 'তুই'য়ে ফিরে এসেছে। পিঠ চাপড়িয়ে ভরসা

দিলাম, নিশ্চয়ই আসব, শক্ত এনগেজমেণ্ট থাকলেও আসব। তবে দেখিস, বানিয়ে বানিয়ে অন্য কারো কাহিনী বলিস না যেন। নকল গল্প শুনতে চাই না।

রামু উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে বলল—তবে তোর প্রিয় কাহিনীকার ডুমার ভাষাতেই বলি। যদি আমি কোন জায়গায় কিছু রঙ চড়াই তাতেও ক্ষতি নেই। পয়সা খরচ করে অনেক গল্পের বই কিনে পড়েছি। নিজের জীবনে যদি তার কোনটা ঘটে যায়, তাহলে উপায় কি? তবে যদি অন্য কোন জীবনের সঙ্গে কিছু মিল দেখিস, তবু ধরে নিস যে আমি নকল করি না। করি দখল।

বিয়ে আর ভালবাসা

—আমি ভালবেসেছিলাম।

রামুর কথাতে অবাক হয়ে যাবার কথা নয়। অমন একটা কিছুই আমি আন্দাজ করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি অন্য কিছু শুনলে একটু হয়তো হতাশই হতাম।

রাতের খাওয়া, তারপর কফি আর বিস্কুট, তারপর ওর চারতলার চিলে-কুঠরির জানলা দিয়ে এক ফালি আকাশের তারা গোণা। সে সবই হয়ে গেছে। দিনের বেলা আসিনি। তাতে হাতে বেশি সময় থাকত না। রাত্রে এসেছিলাম। জানিয়েছিলাম যে যত রাত পর্যন্ত খুশী আড্ডা দেব, পুরনো দিনের গল্প করব। এমন কি তেমন জমে উঠলে ওর বেড-সিটার অর্থাৎ শোয়া-বসার মেলানো ঘরের সোফাতেই শুয়ে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেব। ঠিক আগেকার দিনের মত।

খুশী হয়ে রামু ফোনে প্রশ্ন করেছিল—তোর হোটেলে খোঁজ করবে না?

হেসে জানিয়েছিলাম—দুঃর, হোটেল বাড়ির গিন্নী নয়। কখন, রাত ক'টাতে ফিরলাম বা আদপে ফিরলাম কি না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

রামু দেখলাম পাকা গিন্নী। বিলেতের হোটেলের খানা খেয়ে যে অরুচি ধরে গেছে তা বুঝেছিল। তাই নিজে হাতে হোয়াইটিং মাছের ঝোলটা যা বানিয়েছিল—এক কথায় ফার্স্ট কেলাস। বালিগঞ্জ থেকে বাগবাজার ইস্তক কোন উড়ে ঠাকুরের হাতে মাছের ঝোল এমন উৎরোবে না। ফরাসী 'শেফ' মহারাজের হাতের 'পুলে', পুলি নয় মুর্গী, সেই অমৃতের কথাও ভুলে গেলাম।

তারপর হাতঘড়ি নীরবে টিক টিক করতে করতে রাতটাকে একেবারে অসহ, নিবিড়ভাবে নিঃসঙ্গ করে তুলল। সামনের চেয়ারটাতে বসে রামু চুপচাপ পাইপ টেনে যাচ্ছে। পাইপ টানার মধ্যে নাকি একটা স্মৃতিব আমেজ আসে। কাজেই টানুক রামু পাইপ। আমিও ততক্ষণে হোয়াইটিং-এর ঝোলের স্বাদ ভুলে গেছি। যেটুকু আকাশ দেখা যায় তার তারাগুলি দেখছি। আর দেখছি ওর পাইপের মজে-যাওয়া আগুন। ইংলণ্ডের প্রথম বসন্তের রাত। আমেজভরা নিশুতি রাত। তার গভীরে রামু কোথায় ডুব দিয়েছে, তা জিজ্ঞেস করতে হবে না।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে জানি না, রামু যেন নিজেকেই শোনাল—আমি ভালবেসেছিলাম।

এই ছোট্ট দুটি কথা যেন একটা ভেলা। নীরবতা, নিঃসঙ্গ নীরবতার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। তাই সে ভেলাটাকে তখনি ভরসা করে আঁকড়িয়ে ধরলাম। অথচ বেশি ঔৎসুক্য দেখালে চুপ করে যেতে পারে।

তাই বললাম—সে ত' সেই পুরনো কথা।

শুনে রামু খুশী হল না। কিন্তু জেগে উঠল। জিজ্ঞেস করল—কি রকম?

একটু নড়ে-চড়ে উঠে বসে বললাম—এদেশে ভারতীয় ছেলেরা এসে আর কি করে? হয় পড়াশোনা করে ভাল থাকে, নাহয় বখে যায়, আর নাহয় বিয়ে করে। কিন্তু তোর মত সিরিয়াস ছেলে শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়ে। পারলে বিয়ে করে।

রামু একটু গরম হয়ে উঠল—কথার বাঁধুনী দিয়ে মনকে বাঁধিয়ে রাখতে চাস। তাই এরকম কথা বলছিস। তুই কি বলতে চাস যে, ভাল থাকা আর বিয়ে করা দুটো একসঙ্গে সম্ভব নয়?

মতলব হাসিল হচ্ছে। আমার তীর ছোঁড়াটা বিফলে যায়নি

দেখে হেসে বললাম—অতি সুন্দরভাবে সম্ভব। ও দুটোর খুব সমন্বয় হতে পারে। তবে আমাদের দেশের ছাত্রদের পক্ষে এদেশে এটা হওয়া সহজ নয়।

রামু মানল না। মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—কিন্তু আমায় তুই জানিস। তুই-ই আমায় সব সময় বলতিস যে লণ্ডনকে দেখে নে। ইয়োরোপকে মনের মধ্যে যাচাই করে অনুভব করে নে। তোর কথাগুলো মনের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। মোটে ক'বছর থাকব এদেশে, এই স্বাধীন সমাজের সহজ মেলামেশার মধ্যে। জীবনের সব কিছু জানবার বাসনায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ইয়োরোপকে ভালবেসে তুই লিখলি 'ইয়োরোপা' বই। আর আমি বিয়ে করলাম ইয়োরোপীয়ান বউ।

সান্ত্বনার সুরে বললাম—সেটা ত' জ্যান্ত মানুষের জাগা মনেরই লক্ষণ, রামু।

বামুব মনে এসেছে জোয়ার। সে আমার কথা যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে কথা কইতে লাগল--ওই সব মন্ত্র আমার মনে যেন আগুন-জ্বালা ধবিয়ে দিয়েছিল। গ্রীন পার্কে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে, পিকাডিলির মানুষের মিছিল দেখতে দেখতে কেমন একটা গভীরতার সোয়াদ পেতাম। যারা আমার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করছে তারা কেমন জীবনযাপন করে, কি ভাবে কি স্বপ্ন দেখে, তা জানতে চাইতাম।

খুব হালকা ভাবে বললাম—এখনো আমি তাই ভাবি। বিদেশে এসে তার মুক্ত নীল আকাশটাতে মনের খুশিতে পাখা মেলে বেড়াব না তো করব কি? শুধু কি খড়কুটোর খোঁজ আর জোগাড় করেই দেশে ফিরে যাব? চোখে থাকবে ঠুলি আর পায়ে পুরনো শেকল?

রামু পাইপে আরেকটা টান দিল। তাতে নেই আগুন, কিন্তু আছে জ্বালা। সেই জ্বালা ছাই নয়, তাপ হয়ে ওর উত্তরের সঙ্গে

মিশে বেরিয়ে এল—শেকল আমি কাটতে চেয়েছিলাম। কেটেছিলামও বটে। কিন্তু তবু আরেকটা বন্ধনে পড়ে গেছি।

তুই তো জানিস হাঁড়ির খবর। মধ্যবিত্তের আটপৌরে জীবন। চারদিকে শুধু বাধা আর বাঁধন। একটা উড়কো রসিকতা বা পরকীয়া কটাক্ষ পর্যন্ত তার বেড়াজাল পেরিয়ে উড়ে আসতে পারে না। সেই দেশ থেকে এদেশে এসে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম।

সান্ত্বনার সুরে বাধা দিলাম—না, না। তুই নিশ্চয়ই মনের আবেগে ওই রকম ভাবছিস। আমি তোকে কখনো দিশেহারা দেখিনি।

—কিন্তু তুই তো আমায় পরীক্ষায় ফেল করবার পরে দেখিসনি। মনের যে জোর নিয়ে তার আগে পর্যন্ত চলেছিলাম, তাতে আর কুলোল না। অথচ পাস করাটা সম্পূর্ণরূপে যে আমারই হাতে ছিল তা-ও নয়। তাই আমি নিজেকে সামলে নেবার জন্য চারদিকে ঘোরাফেরা করতে শুরু করলাম। ইয়োরোপের জীবনকে একেবারে ভেতরে গিয়ে চেখে দেখা। এদেশে সব রকম আনন্দেরই সস্তা বন্দোবস্তও আছে। অবশ্য সুলুক-সন্ধান জানা দরকার।

তারপর ভারতীয় ছাত্ররা যেমন করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় তা শোনা আছে, দেখা আছে। নতুন কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত রামু বলল —আমি একটি আর্টিস্ট মেয়েকে ভালবেসে ফেললাম। ডক আমায় কেন কখনো বলিসনি যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালবাসার যোগ্য মেয়েরা হচ্ছে শিল্পী?

—কারণ, শিল্প নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করতে ভালবাসি। সাধনার সন্ধান করেছি, সাধিকাদের নয়।

—না না, ঠাট্টা করিস না। আমার শিল্পী প্রিয়া অতি পবিত্র।

—পবিত্র জিনিসই তো প্রেমের যোগ্য, রামু।

রামুর গলায় ব্যথার ছোঁয়া আছে বুঝতে পেরে আরো বললাম—

তুই ভুল বুঝেছিস কেন ভাই? লোকে প্রেমে পড়ে নিজেকে ভুল বোঝাতে শুরু করে, আর শেষ করে অন্যকে ভুল বোঝাতে বোঝাতে। সংসারে এরই নাম রোমান্স। আশা করি, তুই তার চেয়ে বেশি কিছু পেয়েছিলি।

—খোলাখুলি স্বীকার করছি যে মেয়েমহলে আমি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। তাতে আমার অনেক শত্রুও হয়েছিল।

—সে আমি বুঝতে পেরেছি। যারা মিডিওকোর, ত্নু কুড়ি সাতেই যাদের সাধ মেটে তাদের শত্রু নেই। আর সবারই আছে। মেয়েরা প্রেমেব বাণী শুনতে চায়। সে বিদ্যাতে কাব্যের ছাত্র তোর সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পাববে না। কথায় বলে মেয়েরা ভালবাসে কান দিয়ে, আর পুরুষবা চোখ দিয়ে।

মৃত্নস্বরে রামু যোগ দিয়ে দিল—আর সারা জীবন ধরে।

আমি সায় দিলাম,—ঠিক বলেছিস। বারবার প্রেমে পড়ার মধ্যেই বোমান্স বেঁচে থাকে আর প্রেমের পিপাসাকে আর্ট বানিয়ে তোলে। প্রত্যেক নতুন প্রেমই হচ্ছে মানুষের কাছে একমাত্র প্রেম। প্রেমেব পাত্রী বদলায় কিন্তু প্রেম বদলায় না। কিন্তু···কিন্তু···

বলতে বলতে আমি উঠে এলাম। একেবারে ওর পাশে এসে বসলাম। যতটা সম্ভব অন্তরঙ্গ হয়ে বললাম—কিন্তু তোর প্রেমের পাত্রী মনে হচ্ছে মাত্র একজনই ছিল। বদলায় নি।

রাত আরো গভীর হয়ে এল।

ওর গলার স্বরও আরো গভীর হয়ে এল।

তুই ত জানিস, ডক, পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে কত ব্যথা পেয়েছিলাম। গবীব দেশের গরীব ছেলে। মনে ছিল চাঁদ হাতে পাবার আশা। কিন্তু আকাশের চাঁদ দেখে শুধু মনে হত উনুনে সেঁকা রুটিরও ওই রকম রঙ, ওই রকম চাক্তির মত চেহারা। কিন্তু সেই চাঁদ যখন দূর আকাশেই রয়ে গেল, তখন প্রায় পাগল হয়ে গেলাম।

হিতৈষী বন্ধুরা বলল যে আমার হাওয়া বদলান দরকার। অবশ্য তার চেয়ে অনেক বেশী দরকার ছিল বাসা বদলান। কারণ, আরো সস্তা বোর্ডিং-হাউসে না গেলে খরচ চলবে না। কিন্তু মনকে কিছুতেই সামলাতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে চলে এলাম প্যারিসে।

—প্যারিসে?—আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ, প্যাবিসে। ভাবতীয় ছাত্ররা আসে লণ্ডনে শিক্ষার জন্য, আর প্যারিসে অভিজ্ঞতার জন্য। আমি ভাবলাম যে আর একবার প্যারিস থেকে ঘুরে আসি।

—কিন্তু তোর মাসোহারা যে এক নিশ্বাসে নস্যির মত উড়ে যাওয়ার কথা সেখানে।

—তা জানতাম। তবু ভাবলাম যে জীবনের গন্ধে সর্বস্ব উজাড় করে অনেকেই ত দেউলে হয়। আমি না হয় পদ্মেই সামান্য সম্বলটুকু বিকিয়ে দেব। সেটুকু ভাগ্যই বা ক'জনেব হয়?

খুব আন্তরিকতার সুবে জানালাম—তোর এই সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন করছি। অনেকেরই এমন সাহস হয় না। সৌভাগ্যও হয় না।

সে আশ্বাস পেয়ে বলে চলল—আমি জানি, ডক, যে তুই আমায় ভুল বুঝবি না। সন্ধ্যাবেলা কাফে দ্য লা প্যার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতবের জাঁকজমক দেখছিলাম। দেখলাম যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আবো একজন। তাব চোখ বিস্ময়ে ভরা। অথচ সে নিজে যে কত বড় বিস্ময়, তা সে নিজেও জানে না। আমি থাকতে পারলাম না। সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলাম। মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—মাদমোজেল, আপনাকে যেন আগে কোথাও দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

সে হেসে উঠল। তার গলার মূর্ছনায় জলতরঙ্গের বাজনা জাগিয়ে

তুলে বলল,—আলাপ করতে যদি ইচ্ছে হয়েছে ত এতখানি বাজে অছিলার দরকার কি?

ভরসা পেয়ে আরো ভাল করে তাকালাম। মোটে বোধ হয় কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে। ছোট্ট একটি ফুলের কুঁড়ির মত মুখ। মাথাটি গ্রীক দেবীদের ছাঁচে গড়া। আঁখি দুটি ভায়োলেট রঙের সমুদ্র। পরীক্ষার দুঃখ আমায় দিশেহারা করেছিল, কিন্তু কাঁদাতে পারে নি। কিন্তু রূপ দেখে আমার চোখ জলে ভরে গেল।

ভিয়েনার মেয়ে। এসেছিল প্যারিসে বেহালা বাজান শিখতে। অনেক দূর এগিয়েছে তার শিক্ষা। ছোট ছোট রেস্তোঁরাতে মাঝে মাঝে বাজাবার কাজও পাচ্ছে। ওই কাফের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল যে, যদি ওখানে একবার কাজ জুটে যায় ত বেশ হয়। অনেক সমজদার গুণী আসে ওখানে। কেউ হয়ত তাহলে ওকে আবিষ্কার করে ফেলবে।

তার বদলে ওকে আবিষ্কার করলাম আমি।

আমার দরজায় তখন অনাহার টোকা দিচ্ছে। কিন্তু জানলা দিয়ে প্রেম উড়ে এল। তাকে ফিরিয়ে দিই কোন্ প্রাণে?

প্রেমে পড়ে লোকে নিজেকে অতিক্রম করে যায়। থেলমাও শিল্পী হয়ে ফুটে উঠল। তার 'ইকোল' তাকে জানাল যে আর কিছু শেখানো বাকী নেই। সে এখন নিজেই ওস্তাদ হয়ে স্বাধীনভাবে বাজাতে পারবে। মনের আনন্দে সে ভিয়েনায় ফিরে গেল। আমিও গেলাম তার সঙ্গে।

দেশে কলেজে পড়বার সময় রবি ঠাকুরের মহুয়া মুখস্থ করেছিলাম:—

আমরা দুজনা
স্বর্গ খেলনা
গড়িব না ধরণীতে

কিন্তু মর্ত্যে বসেই আমি চাইলাম যে পৃথিবীর সব অতীত প্রেমিকরা আমাদের হাসি আনন্দ দেখে নিজেদের প্রেম তুলনা করে বিষাদ অনুভব করুক। এত অসহ আনন্দ। আচ্ছা ডক, তুই কখনো প্রেমে পড়েছিস ?

মৃদুস্বরে বললাম—তোর কথাই এখন বল, রামু।

থেলমার বাবা-মা আপত্তি করলেন। করবার ত কথাই বটে। শুধু দেশ বা গায়ের রঙ নয়। চালচুলো পর্যন্ত নেই। ভিয়েনায় বসে সস্তায় ইংরেজী শিখিয়ে খরচা চালিয়ে যাই। ওর বাড়িতে যাবার আগে নিজের হাতে নিজের স্যুট ইস্ত্রী করে নিই। জুতোয় ঘষি পালিশ।

ওর বাবা-মা বললেন,—তোমায় এই ইণ্ডিয়ান ছেলেটা জাদু করেছে।

থেলমা প্রতিবাদ করল—সেই জাদুর মন্ত্র যেন না ভেঙে যায় এ জীবনে।

—কিন্তু এত অল্প দিনের জানাশোনা লোক সম্বন্ধে তোমায় সাবধান করে দেওয়া দরকার।

—না, মামি, ওকে জানা মানেই বিশ্বাস করা।

—থেলমা, তুমি পাগলামী করছ।

—আমি প্রেমে পাগল মা-মণি। তুমিও নিশ্চয়ই এককালে এমনি পাগল হয়েছিলে।

—কিন্তু তুমি জাননা, রামু দেশে আর কাউকে বিয়ে করে রেখেছে কিনা। আর কাউকে ভালবেসেছে কিনা।

—ও নিশ্চয়ই আর কাউকে বিয়ে করেনি বা ভালবাসেনি। ওর অনভিজ্ঞ পবিত্রতাই তার প্রমাণ।

থেলমার মা ও কথায় ভরসা পেলেন না। বললেন—তুমি প্রেমে পড়ে অন্ধ হয়েছ।

—না, প্রেমে পড়ে আমার চোখ খুলে গেছে। আমাদের দেশে তৃতীয় স্বামী মারা গেলে শোকে নয়, টাকার গরমে মেয়েদের মাথার চুল প্ল্যাটিনাম-ব্লন্ড্ হয়ে যায়। বড়লোকেরা বিয়ে করে—প্রজাপতির সবচেয়ে ভাল নমুনা সংগ্রহ করার বৈজ্ঞানিক মতলব নিয়ে।

মাথা নাড়লেন থেলমার মা। অনেক পূবালী-পশ্চিমী বিয়ে আছাড় খেয়েছে পদে পদে। সামাজিক নিয়মের পাথরে ঠুকে মরেছে। প্রেম যেখানে বিয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে, পরিবার সেখানে চোরা-গোপ্তা মেরে দম্পতিকে দিয়েছে বিচ্ছিন্ন করে। প্রণয়ের কচি চারা লোপ পেয়ে গেছে ভুল বোঝাবুঝির বালুচরে।

ইয়োরোপের খবরের কাগজে মাঝেমাঝে বড় বড় হেড-লাইন দিয়ে এ সব খবর বেরোয়। ভারতীয় ছাত্রকে মহারাজা মনে করে কোন ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করেছিল। দেশে গিয়ে দেখেছে যে রাজত্ব ত ছার, মাথা গোঁজবার মত ভাল বাড়িও একখানা নাই। হয়ত আছে দেশীমতে বিয়ে-করা বৌ, অন্ততপক্ষে একেবারে দেশী সংস্করণের শ্বশুর-শাশুড়ী আত্মীয়-স্বজন। হয়ত অবস্থা স্বচ্ছল ; কিন্তু শুধু টাকায় সংসার চলে না। প্রথম মোহের, নবীন যৌবনের, রঙীন অ্যাড্-ভেঞ্চারের ঝলমলে আয়না তখন কালো হয়ে যায়। সে-সব খবর আর ছবি বেশ ফলাও করে রবিবারের কাগজগুলিতে ছাপান হয়। মাটির নীচের বেসমেণ্ট তলার কয়লাকুড়োণী থেকে এয়ারকণ্ডিসন্ করা বুডোয়ার (বৈঠকখানার) বড় ঘরণী পর্যন্ত সবারই মুখে মুখে সে খবর ফিরতে থাকে।

সেই সব ঘটনাও থেলমার মা ওকে শোনালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

শেষ পর্যন্ত থেলমার মা বললেন,—তুমি রামুর সমাজের লোকদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। বিদেশে একঘরে হয়ে থাকা আর জেলে থাকা একই কথা। শুনেছি ইয়োরোপীয়ানরাও ভারতীয়ের মেম বৌদের পাত্তা দেয় না।

থেলমা একটুও ঘাবড়াল না,—তোমার সমাজের জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। সোসাইটির মধ্যে থাকলেই বোরিং, অতিষ্ঠ মনে হয়।

— কিন্তু তার বাইরেও মানুষ তিষ্ঠোতে পারে না।

—কিন্তু আমি পারব মা। আর আমার এই সঙ্গীত-সাধনা বিফলে যাবে না। সঙ্গীত আমায় সঙ্গ আর স্বচ্ছলতা—দুই দেবে। রামুর উপায় বা তার বাবা-মার দয়ার উপর আমাদের সুখ নির্ভর করবে না।

রামুর কাহিনী শুনতে শুনতে মনটা সমবেদনায় ভরে উঠতে লাগল। শুধু রামুর জন্য নয়। তার স্বপ্নদেখা স্বপ্নের মত সুন্দর প্রণয়িনীর জন্য। তখনকার পরাধীন দেশের রাজনীতি, সমাজ, সব রকম অবস্থাই যে রাহুর মত এই স্বপ্নকে গ্রাস করবার জন্য অপেক্ষা করছিল, তা ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। অনেক বিদেশিনী মেম-বৌ দেখেছি দেশে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যের খোঁজে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু থেলমার মত স্বপ্নও হয়ত দেখেছিল অনেকে।

রামু বলে যেতে লাগল: থেলমা আমার সঙ্গে লণ্ডনে এল। আমি সংসারে আর কিছুতেই সফল হলাম না। শুধু পরম ভাগ্যের ব্যাপারটিতে ছাড়া। তাই পড়া ছেড়ে দিয়ে শুরু করলাম উপায় করতে।

বরাত খুলে গেল। যুদ্ধ তখন লাগে লাগে। সবাই কাজ পাচ্ছে। আমিও মোটামুটি ভাল কাজই পেলাম।

আমি প্রশ্ন করলাম—কিন্তু তাতে কি থেলমা খুশী হয়েছিল?

আমার ত মনে হয় সে তোকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তোর দেশকেও ভালবাসতে চেয়েছিল। অজানার টানেই সে এগিয়ে এসেছিল তোর পানে।

রামু স্বীকার করল—সেকথা ঠিক। লণ্ডনে লোকে ঘর সাজায় হট হাউসে জন্মানো ফুল, ফরাসী নভেল আর বিদেশী নতুন-চেনা নিমন্ত্রিত লোক দিয়ে। কিন্তু সে চেয়েছিল একটি ভারতীয় ঘর। তাতে থাকবে বাগানে ফোটা টাটকা রজনীগন্ধা, হাতের তৈরি সুন্দর টুকিটাকি জিনিস আর সহজ সরল মন।

জিজ্ঞেস করলাম—কে তাকে শিখিয়েছিল যে আমাদের দেশে সে এই সব পাবে ?

রামু খুব মৃদুস্বরে বলল—বিশ্বাস কর ভাই যে, আমি তাকে এই স্বপ্ন দেখতে শেখাই নি। আমি নয়, আমি নয়। সঙ্গীতের সাধনা করতে করতে সে আমাদের গানের মেলডিতে আকৃষ্ট হল। তার মধ্যে সন্ধান পেল সহজ সরল সুন্দরের। বলল যে, ইয়োরোপের সঙ্গীতের পাঁচমিশেলী উচ্ছ্বাসের সমন্বয়ে হার্মনি আছে, কিন্তু মেলডি নেই। সে বলল যে, চারদিকে সাজ সাজ রবের মধ্যে এদেশের জীবনের তাল কেটে গেছে। তাই স্নায়ুতন্ত্রীতে (নার্ভস্) তাল-গোলপাকানো পাশ্চাত্ত্য জীবনের সঙ্গীত তার আর ভাল লাগছে না। ভাই, অনুমান করে নে শিল্পীর মনকে। একটা অজানা ফুলের হঠাৎ-ভেসে-আসা সুরভি, একতারার তারে হঠাৎ-জাগানো একটা ধ্বনি, ভুলে যাওয়া কবিতার একটি হঠাৎ-মনে-পড়া লাইন শিল্পীর মনে যে সাড়া জাগায়, তা আমরা বুঝতে পারি না। ইণ্ডিয়ান মিউজিকের রস পেয়ে সে দেশ থেকে আনাল সেতার, সরোদ আর তানপুরা। পড়তে লাগল রবি ঠাকুরের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ। আমাদের সংস্কৃতি ওকে মুগ্ধ করে তুলল। আমাকে ছাড়িয়ে আমার দেশ বড় হয়ে উঠতে লাগল।

খুশী ভাব দেখালাম। বললাম—দেখ রামু, তোর ভাগ্য কত ভাল। থেলমাকে আমাদের দেশে নিয়ে এলে ও ভারতকে বুঝতে পারত। আর ভারতও নিশ্চয়ই ওকে ভুল বুঝত না।

ক্লান্তস্বরে রামু জবাব দিল,—সেই জন্যেই ত যুদ্ধের সময় দেশে ফিরে গেলাম। অবশ্য একা গিয়েছিলাম। যদি দেখি যে, আমার বাবা-মা ওকে প্রসন্ন মনে নিতে পারবেন, কলকাতায় ওর গুণের আদর হয় এমন কোন কাজ জোটান সম্ভব হয়, তাহলে আর সব বাধা থাকলেও থেলমাকে দেশ নিয়ে যাব। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম যে তা অসম্ভব। কেন? সে সব কারণ তোকে খুলে বলতে হবে না। তোর সঙ্গে ত তর্ক করতে বসিনি।

স্বীকার করলাম। সব বুঝি। তবু সব মানতে পারি না। সংসারে রামু আর থেলমারা যদি সব কিছুর উপরে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা না করে, তবে আর কারা করবে?

থোড় বড়ি খাড়া পর্যন্তই যাদের নজর তারা সে চেষ্টা করবে না। করলেও এক আধটা ধাক্কা খেলেই সরে পড়বে। কিন্তু এখানে একজন শিল্পী আর একজন প্রেমিক হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়াবে অচলায়তনের সামনে। বলবে—আমরা এসেছি। সুন্দরের বাণী নিয়ে এসেছি। মন্দির-দ্বার খোলো।

কিন্তু সে দ্বার খোলেনি। অন্য সব কথা দূরে থাক। রামু হাড়ে হাড়ে বুঝল যে, থেলমা ভারতবর্ষে তার শিল্পের এমন কোন দাম পাবে না যাতে-রাহা খরচটুকু পর্যন্ত চলে। আর রামুর নিজের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। দশ বছর বিলেতে কাটানোর পর যে কাজ সে পেতে পারে সেই কাজের আয়ে শুধু হরিমটর ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

আস্তে আস্তে বললাম,—এ রকম যে হবে এ ত জানা কথা।

গভীর ক্লান্তিতে সে বলল,—তা বুঝতে পেরে বোমা-বর্ষণ মাথায় করেও লণ্ডনে ফিরে এলাম। এদেশে আমাদের যা আয়, তাতে

দেশের মত ঝি-চাকর রাখা চলে না বটে, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। সব জিনিসের র‍্যাশন, কিন্তু পাওয়া যায়। অসুবিধা আছে, কিন্তু অভাব নেই। নিজের হাতে রাঁধতে কষ্ট নেই যদি উনুনে কয়লা জ্বালাতে আর বাসনে ছাই ঘষতে না হয়।

সে সব ব্যাপার জানি। যুদ্ধের সময়ের র‍্যাশন আর টানাটানিতে বিলেতে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়নি। মোছেনি মুখের হাসি। তাই রামুর এই চেহারার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। ওর মুখের দিকে তুলে-রাখা আমার চোখজোড়া একখানা প্রশ্ন হয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত খুলে জিজ্ঞেস করলাম,—আমি আশা করছিলাম যে থেলমার সঙ্গে দেখা হবে। তোদের দু'জনের মুখে হাসি দেখে সুখী হয়ে ফিরে যাব।

অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ।

তারপর সে বলল,—সেই কাহিনীই অবিশ্বাস করবার মত। শুধু তুই কেন, আমাদের দেশের অনেকেই বুঝতে চাইবে না। মানতে চাইবে না। কারণ এর পরে যা ঘটেছে, তা হয়ত আমাদের দেশের আবহাওয়াতে সহজে হত না। অন্তত এ যুগে হত না।

বাধা দিলাম,—তোর যদি কোন সঙ্কোচ থাকে, তাহলে না হয় নাই বল্‌লি বাকীটুকু।

রামু মানল না,—অন্তত একজনকে ত বলতেই হবে। জানি তুই সহানুভূতি দেখিয়ে আমায় দুর্বল করে দিবি না। তাই তোকেই জানাব। বিশেষ করে এজন্য যে, তোর সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না।

লণ্ডনে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা পড়তে আর পশ্চিম উপকূলে দলে-দলে মার্কিন সৈন্য নামতে লাগল। ন্যাশন্যাল সার্ভিস অ্যাক্টে গভর্নমেণ্ট থেলমাকে সৈন্যদের আনন্দ-বিনোদনের কাজে অজ্ঞাত সব জায়গায়

চালান দিল। আর আমায় যেতে হল জার্মানদের ইস্টার্ন সার্ভিসের বেতার খবর যাচাই করতে। কত বছর ছাড়াছাড়ির মধ্যে কেটে গেল।

যেন কয়েকটা জন্মান্তর। হ্যাঁ, যুদ্ধ থামার বছর খানেক পরে আমরা আবার একসঙ্গে মিলিত হলাম। কিন্তু এক মন নিয়ে নয়। কথাটা বিশ্বাস করবার মত নয়, কিন্তু সত্যি।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হলাম। জিজ্ঞেস করলাম,—তার মানে তুই থেলমাকে আর ভালবাসিস না?

রামু উত্তর দিল,—সেটা বড় কথা নয়। দেখলাম যে থেলমাই আর ভালবাসে না। আমাদের প্রেম ছিল আদর্শ। দু'জনের সংসার ছিল একটি গীতিকবিতার মত সম্পূর্ণ। দশ বছরেরও বেশী আমরা দু'জনে দু'জনকে মধুচন্দ্রের আবেগ দিয়ে ভালবেসেছি।

—কিন্তু জীবন ত শুধু দশটা বছব নয়! তাছাড়া খাঁটি প্রেম জীবনকে ছাপিয়ে মরণকে ছাড়িয়ে অমর হয়ে যায়। অন্তত সারাটা জীবন জড়িয়ে থাকুক তোদের প্রেমে।

—না ভাই, তাও হয়না আজকালকার অহরহ যাওয়া-আসার পৃথিবীতে। থেলমা চলে গেল অন্য জায়গায়। রইল শুধু আমার স্মৃতি; মাঝে মাঝে লেখা সেন্সরে কাটাকাটি করা চিঠি আর 'হঠাৎ হাওয়াই হামলায় মারা গেছে' এই খবর পাবার ভয়। কতদিন, কতদিন একটি একা মেয়ে,—প্রেম থেকে, পরিজন থেকে ছিনিয়ে-আনা একা মেয়ে,—মনকে তালাচাবি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? যত ব্যাকুলতা, তত ভয়। যত ভয়, তত অসহায়তা। সে যে কী অবস্থা তা তোরা, যুদ্ধ থেকে দূরে বসে ভাগ্যবান তোরা, বুঝতে পারবি না। তুই লণ্ডনের ভাঙা ঘর বাড়ি পাড়া ঘুরে দেখেছিস। কিন্তু ভাঙা সংসার আর পোড়া মনের ছবি কে খুলে দেখাবে?

একটু পরে সে আবার শুরু করল—অবশ্য এটা ঠিক যে এমনিতেও বিয়ের বছর দশেক পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ

থাকে না। শুধু হয়ত থাকে একটা সখাসখী ভাব, সহানুভূতি, একই রকমের চিন্তা আর উদ্দেশ্য।

আমিও সায় দিলাম—আষাঢ়ের প্রেম ভরা ভাদর পেরিয়ে অঘ্রাণের নদী হয়ে দাঁড়াবে এই তো নিয়ম। প্যাশনকে ছাপিয়ে জেগে উঠবে সমপ্রাণতা। কাজেই তোদের ভালবাসায় ভাঁটা পড়েছে একথা মনে করেছিলি কেন?

রামু উঠে দাঁড়াল। ম্যান্টলপীসের কাছে গিয়ে একটা সাদা লাইলাক ফুল তুলে নিল। সেটা শুঁকে কি মনে করে ফায়ারপ্লেসে ফেলে দিল।

তারপর বলল,—ভাঁটা কথাটা একেবারে ঠিক বর্ণনা। থেলমা ভালবেসেছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত। অমনি পাগলা ঝোরা। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া প্লাবন। কিন্তু নিঃসঙ্গ দিন আর ভয়ে ভরা রাতগুলির মধ্যে দিয়ে সে জোয়ার কখন যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তা নিজেই জানতে পারেনি। আমরা যুদ্ধের বছরখানেক পরে আবার একসঙ্গে সংসার পাতলাম। কিন্তু দেখলাম যে সেই থেলমা আর নেই।

—আর তুই?

—আর সেই আমিও বোধহয় নেই। তবে আমি নিজে সেকথা স্বীকার করতে চাই নি। মনকে ঠেরেছি চোখ। দেহকে করেছি বঞ্চনা। তবু নিজে বদলিয়েছি বলে স্বীকার করতে চাইনি।

—আর সে?

—সে আমার চেয়ে অনেক বেশী সোজাসুজি। সহজে ভালবেসে অনায়াসে তার বাপ-মার বাধা উড়িয়ে দিয়েছিল। ঠিক তেমনি সহজে আমাকে আর ভালবাসে না একথা বুঝে বিয়ের বন্ধনকে মনে করল অসার।

অবাক হয়ে রামুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ম্লান হাসি হেসে রামু বলল,—জানি, ডক, যে তোর বোহেমিয়ান মন হচ্ছে শুধু একটা মুখোশ। মুখ কিন্তু তোর পূব দিকেই ফেরানো। কাজেই তুই বোঝাপড়া, মানিয়ে চলা—এসব সমাধানের কথা ভাববি। কিন্তু থেলমা অন্য জগতের লোক। আমি যখন দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসি, তার বুক করে না দুরুদুরু। আমি যখন ঘরের ভিতরে এসে ওভারকোটটা খুলে রাখি আমার দু'বাহুর বাঁধনে পিষে যাবার জন্য হয়ে ওঠে না সে ব্যাকুল। এইসব ছোটখাট পরিবর্তন ঘটে মনের অগোচরে। কিন্তু তার আয়নায় সব-কিছু ফুটে উঠল। স্পষ্ট রূপ ধরে তারা তাকে জানাতে লাগল যে তার ভালবাসায়…

বাধা দিলাম। বলে উঠলাম,—তুই নিশ্চয় বলতে চাচ্ছিস—বাসনায়?

—না, না। ভালবাসায়। ভালবাসায় পড়ছিল ভাঁটা। একটা মায়াবী রাতে আমরা নাচতে গেলাম একসঙ্গে। খানিকক্ষণ নাচতে নাচতে লক্ষ্য করলাম যে থেলমার চোখ অন্য কিছু খুঁজছে। অন্য কিছু, অন্য কোন খানে। আমারো পা ঘুরছে শুধু যন্ত্রের মত। থেলমা, সেই থেলমাকে এক হাতে হাত ধরে অন্য হাতে জড়িয়ে ধরে ওয়ালজ্ নাচছি। অথচ শুধু দম-দেওয়া একটা কল। নেই বাসনা, নেই স্পন্দন। ক্লান্ত হয়ে নাচ থামিয়ে দিয়ে সে আর আমি ফিরে এলাম। হঠাৎ সে পরম সত্যটা শেষ পর্যন্ত খুলে বলল,—ডার্লিং, কই আমি ত আর তোমাকে ভালবাসছি না।

রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলাম,—আর তুই কি জবাব দিলি?

রামু মাথা নীচু করে বলল,—নিজেকে যাচাই করবার সাহস আমার ছিল না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম,—তোরা দু'জনে কি নতুন করে বিয়ে করেছিস অন্য কাউকে?

মাথা আরো নামিয়ে সে জানাল,—না। আমরা আর বিয়ে

করিনি। আমরা যে অত্যন্ত সুখী ছিলাম একসময়। মেয়েরা দ্বিতীয়-বার বিয়ে করে প্রথম স্বামীকে ঘৃণা করে বলে…

ফস করে বললাম,—কিন্তু পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে প্রথম স্ত্রীকে পূজো করে বলে।

কথাটা বলে ফেলে আফসোস হল। তাই বললাম,—আবেগের ভরে ভুল করছিস। প্রেম আর বিয়ে এত ঠুনকো বস্তু নয়। এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে নেই।

রামু গভীর স্বরে বলল,—না, ডক, বিশ্বাস কর। আমি এখনো হাল ছাড়িনি। সেই জন্যেই ত প্রেমকে তার সহজ পরিবেশ দেবার জন্য বাপ-মা-দেশ সব কিছু ছেড়েছিলাম। কিপলিং লিখেছিল যে, পূর্ব আর পশ্চিম কখনো মিলবে না। আমি নিজের জীবনে দেখাতে চেয়েছিলাম যে, প্রেমের মধ্যে দিয়ে তারা মিলবে। মিলেছিলও তো বটে। কিন্তু বিয়ে করে, সংসার গড়ে মনকে সিন্ধুকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখা যায় না। আমরা ছু'জনেই চেষ্টা করেছিলাম আবার ভালবাসতে, আবার মিলিত হতে। কিন্তু পারলাম না।

একটু থেমে রামু বলল,—তবে সে নিয়ে কোন ক্ষোভ নেই। এই সংসারেই সে-ও আছে, আমিও আছি! মাঝে মাঝে দেখাও হয়। কিন্তু কেউ কাউকে দোষ দিইনা। শুধোই না মনের নতুন খবর। বন্ধন নেই, কিন্তু বন্ধুত্ব আছে।

আজকের জগতে লোক দেখছে যন্ত্র আর বিজ্ঞান কত জটিল হয়ে উঠেছে। ওরে, মন যে আরো বেশী জটিল হয়ে উঠেছে সে খবর কে রাখে? পঞ্চাশ বছর আগে হলে আমরা এতদিনে নিশ্চিন্ত মনে বিয়ের রূপোলী জুবিলী উৎসব করতাম। আর এ যুগে…

আশ্চর্য! পঁচিশ বছর দেশ ছাড়া, ইংরেজ নাগরিকের ন্যাশনালিটি নেওয়া রামু চোখ বুজে রইল! প্রীতিতে, না স্মৃতিতে, না বিস্মৃতিতে জানি না। চোখ বুজে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে গেল:

আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো…।

বলতে বলতে রামু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গা আড়ামোড়া দিয়ে উঠে গেল। জানলার দিকে এগিয়ে বিড় বিড় করে বলল,—ওই চাঁদটাকে মনে হত মধুর। মধুর মত তার রঙ। এখন আবার মনে হচ্ছে চাঁদের সেকা রুটির মত চেহারার কথা। তার চেয়ে পর্দাটা টেনে দিই।

গেরস্থালী আর আড্ডা

ঘরোয়া আড্ডাটা বেশ জমে উঠল। অথচ একেবারে আন্তর্জাতিক বৈঠক একখানা।

ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মত। ইংলণ্ডে নাকি আড্ডা জিনিসটা জমে না। তার মানে আমরা যেমন আয়েস করে পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে বসে আড্ডা দিই তেমন একখানা বস্তু ওদেশে সম্ভব নয়। তার ওপর ওরা চোখ তোলে তো মুখ খোলে না। মুখ খোলে তো মন ভোলে না। কাজেই রঙ্গরস যেটুকু বয়ে যায় তাতে মিছরীর দানা বাঁধে না।

তবু সেই অঘটন ঘটল।

বোধ হয় তার প্রধান কারণ যে ইংরেজ আজ এখানে মাইনরিটি। আগে বলেছি যে, ভি হচ্ছেন ইংরেজ। ভিনী স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। নরওয়ে, ডেনমার্ক কি সুইডেন কোন্ দেশের লোক তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চান না। তিনটে দেশেরই গুণগুলি তিনি নিজের ঘরে তুলতে চান। আর দোষগুলি তাড়াতাড়ি অন্য দুটো দেশে পাচার করে দেন। কিন্তু খবরদার, তার নিজের আসল দেশটির কোন সমালোচনা যেন করে বসবেন না। কুরুক্ষেত্র অবশ্য হবে না। তবে করুণ রসের জন্য তৈরি হয়ে থাকবেন।

একটা উইক-এণ্ড আমরা বাইরে কাটাব। অল্পদিনের মধ্যে যতটা সম্ভব পশ্চিমের পৃথিবীকে আবার দেখে নিতে হবে। আবার পুরনো পরিচয় ঝালিয়ে নিতে হবে। যে কাজ সারা যায় না সারা জীবনে,

তা করতে গেলে চাই অনন্ত মন আর অতন্দ্র চোখ। কোথায় পাই সে দুটি ধন?

আমরা তিনজনে চলেছি অক্সফোর্ডে। ছাত্রজীবনের গুরু অধ্যাপক 'ড'র কাছে। সেই বিশ-বাইশ বছব আগেকার সম্বন্ধ। শুধু ছাত্র আর অধ্যাপক নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী, অনেক কাছের সম্পর্ক। এত দিন এত দূরে থেকেও তা কমেনি।

তাঁরই কাছে চলেছি আমরা। কিন্তু ট্রেনে নয়, মোটরে নয়। ক্যারাভ্যানে চার চাকার ওপরে চড়ানো এই বাড়ি আর গাড়ি দেশ বেড়ানোর সবচেয়ে সুবিধার উপায়। নেই ট্রেনের তাড়া, নেই হোটেলের ভাড়া। রান্নাবাড়াও চলবে এরই মধ্যে। আমাদের সংসার আর বিহার দুয়েরই সাধ মিটছে ভি-র ক্যারাভানে।

শোবার ঘর একটি। সেটি, বলা বাহুল্য, বন্ধু দম্পতির ক্যাস্‌ল অর্থাৎ নিজস্ব দুর্গ। বসবার ঘরে বিরাজ করি আমি। আর লাগোয়া রান্নাঘরটা ভিনীর একেবারে নিজের রাজ্যপাট। যদিও আমরা দুজনেই সেখানে হানা দিয়ে নিজেদের বিদ্যার বহর প্রমাণ করি। অর্থাৎ আমি ফোটাই গরম জল আর ভি ফাটায়—ঘোড়ার নয়—মুর্গীর ডিম। পথে যেতে যেতে ক্যারাভানে থাকি। হোটেলের ঘর ভাড়া, ঘড়ি ধরে চলা আর খাওয়া-খরচ বাঁচিয়ে বেশ চমৎকার চলতি চাকার গেরস্থালী।

ভি তো শুধু ছুটি কাটাতে যায় এই ক্যারাভানে। কিন্তু ইংলণ্ডে কমসে কম তিরিশ হাজার লোক ক্যারাভানে বাসা বেঁধেছে সারা জীবনের জন্য। পয়সায় কুলোলেও তারা ইঁট-কাঠের খাঁচার বাঁধনের মধ্যে আসতে রাজী নয়। যে সময় যে পাড়ায় যে তল্লাটে খুশি ক্যারাভ্যানটি নিয়ে বসিয়ে দিলেই হল। সেখানে জল আর বিজলীর বন্দোবস্ত পেতে অসুবিধা হবে না। তার জন্য খাজনা দিলেই হল। রান্নাঘর, বাথরুম সব কিছুই আছে তার মধ্যে। শোবার খাটগুলি

দেওয়ালে কেমন করে যে লুকোনো থাকে। বোতাম টিপলেই বেরিয়ে এসে মেঝেতে লম্বা হয়ে সেলাম জানায়—অ্যাট ইওর সার্ভিস, স্যার। দাসী শ্রীচরণে।

রান্নাঘরটি নিয়েই আজ কথা শুরু হয়েছিল। তার দেওয়াল, তার টুকিটাকি যন্ত্রপাতি, দেওয়ালের গায়ে ঢোকান হরেক রকম আলমারি আর দেরাজ, সব কিছুরই কলার স্কীম রঙের খেলা একেবারে চমৎকার। ভিনীকে বলেছিলাম যে, দেখেই সন্ন্যাসীরও সংসার পাততে সাধ হবে।

উনি হেসে বলেছিলেন,—তোমাদের হিমালয়ে এসব চালান দিয়ে দাও। দেখবে সব তীর্থ আর সন্ন্যাসী একেবারে সাফ। কিন্তু মহারাজারা চলে গেছে; সন্ন্যাসীরাও যদি না থাকে তাহলে ইণ্ডিয়ার বাকী থাকবে কি ?

আমিও হেসে গলার টাইটা উঁচিয়ে ধরে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম,—কেন আমাদের মত ইংরেজী-শেখা প্যাণ্ট-পরা বিশ্বমানব।

ভিনী তাতেও ভড়কালেন না,—কিন্তু বিশ্বমানবরাও যে সন্ন্যেসী হয়ে যাবে বলে যখন তখন ভয় দেখায়। শুনেছি যে আমেরিকা-ফেরৎ সাধুদেরই নাকি সব চেয়ে বেশী কদর।

তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা তর্জমা করে শুনিয়েছিলাম :—“আমি হব না তাপস, হব না তাপস, যদি না মেলে তপস্বিনী”। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কিন্তু তোমার তপস্বীটি যে ঈ ওল্ডি ট্যাভার্নে গিয়ে দুটি অতিথিকে লাঞ্চের জন্য নেমন্তন্ন করেছেন সে খবর পেয়েছ কি ? আমাদের দেশে কাউকে নেমন্তন্ন করলে দু’চার পদ বেশী রাঁধতে হয়।

কথাটি না বলে ভিনী একটা বোতাম টিপলেন। ফুস মন্তরে একটা দেওয়াল ফুঁড়ে ছোট্ট দেরাজ বেরিয়ে এল। তাতে থরে থরে টিন সাজানো আছে। স্যুপ, মাছমাংসের খাবার, পুডিং হরেক রকমের।

কোন্ খাবারগুলো আজ চাই, বলে দাও। শুধু টিন কেটে গরম বা রিফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডা করে নিলেই হবে।

বললাম—তার চেয়ে খাবার টেবিলে গোটা কয়েক বড়ি আর পুরিয়া সাজিয়ে দাও না কেন? চারটে বড়িতে চারটে পদের কাজ হয়ে যাবে। আর একটা বড়ি জলে গুলে নাও। ব্যস্, শ্যাম্পেন পান করাও তাতে হয়ে যাবে।

ভিনী ঠাট্টা করলেন,—তোমাদের দেশে এই ব্যবস্থাটা কর না চালু। দেখবে ঘর ছেড়ে বাইরে মেয়েরা সহজেই এসে যাবে। গোটা দেশের বাহার খুলে যাবে।

মাথা নাড়লাম,—উঁহুঃ। অত সহজ ব্যাপার নয়। রান্নাঘর জাঁকিয়ে থাকাটা যে ঘরণীদের 'ডিভাইন রাইট' তা আমরা বেশ ভাল করে ওদের সমঝে দিয়েছি। রসনার রস ছাড়াও পতিসেবা, পরিজনদের তৃপ্তি এসব অনেক রকম পুণ্যও তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তোমরা বস্তুতন্ত্রমার্কা পশ্চিমের লোকরা অতশত ভেতরের কথা সহজে বুঝবে না।

রঙীন এনামেল করা বিজলীর উনানে টিন থেকে সদ্যকাটা খাবার ঢালতে ঢালতে ভিনী বললেন,—আমরা জানি যে তোমাদের দেশে অনেকে আমাদের বাস্তববাদী বলে। কিন্তু আমরাও যে কত কাব্য করি, সুন্দরের স্বপ্ন দেখি তা অনেকে জানে না। মানে না যে সুন্দরের মধ্যে দিয়েই করি শিবের পূজা, সত্যের সম্মান।

মনে মনে নিজেকে বললাম যে, সে সবই বুঝতে পারছি। দেশে দেখেছি কত প্রিয়ার পদ্মহস্ত বাসন ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে রুক্ষ হয়ে উঠেছে; হাত ধরাধরি করে বেড়ানতে বা বনভোজনে কোমল স্পর্শ এনে দেয় নি জীবনে। দেখেছি কত বধূকে ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা। আর ভেবেছি যে বিজলী বোতাম টিপে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ঘর সাফ করে নিতে পারলে তারও আঁখি দুটি অন্য রকমের বিজলীতে ঝলমল করতে

পারত। দেখেছি কত কর্তাকে সকালে গোগ্রাসে যা হোক কিছু গিলে অফিসে দৌড়াতে। এদিকে কড়াই মাজতে মাজতে গিন্নীর মেজাজ গেল চড়ে। দিনগত পাপক্ষয়ের পর সন্ধ্যার আঁধার ভরে গেল মনের ভারে।

তার বদলে এদেশে দেখলাম অন্যরকমের ছবি। কর্তাকে রোজ ভোরে উঠে নিজে হাতে স্যুটটি ইস্ত্রী করতে হত। এখন তিনি টেরিলিন কাপড়ের স্যুট পরছেন আর ইস্ত্রী করার সময়টুকু কাটাচ্ছেন ছেলেমেয়ে-স্ত্রীর সঙ্গে হাসি গল্পে। শার্টটা ইস্ত্রী হয়নি বা সাফ হয়নি বলে ঝগড়াঝাঁটি নেই। নাইলনের 'ড্রিপ-ড্রাই' শার্টটা ঘরে কেচে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে, কয়েক ঘণ্টায় আপনি শুকিয়ে নিভাজ হয়ে ঝুলতে থাকবে।

অথচ ওদের আয়ের তুলনায় এগুলোর দামও নাগালের বাইরে নয়। জিনিস তৈরি হচ্ছে অফুরন্ত; তৈরির খরচ কম হবে বলে। বিক্রী হচ্ছে এন্তার; কম লাভে বিক্রী হলেও পড়তায় লাভ থাকবে বেশী। আর তবু যদি রেস্ততে না কুলোয়, কিস্তিবন্দীতে কিনে নাও। টাকা বাকী ফেলে খদ্দের পালাবে এ হেন ভয় দোকানদার করে না।

ওকি, ওকি, উনানটা ধরো না; হাতে ছ্যাঁকা লেগে যাবে—ব্যস্ত হয়ে আমি ভিনীকে বারণ করলাম।

ভিনী হেসে রেডিওর মত ছিমছাম ছোট উনানটা ঠেলে সরিয়ে রাখলেন। বললেন—এ বড় মজার জিনিস। এর আঁচে ভেতরের খাবার রান্না হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর গায়ে হাত দিলে গরম লাগবে না। আর এই দেখ, নতুন বাসন-ধোয়ার যন্ত্রটা।

বললাম,—নেই কয়লার ধোঁয়া, নেই লালচে চোখের জল। হাতে ফোস্কা পড়বে না, ছাই ঘষতে হবে না। বাস্, রান্নাটা তা হলে সত্যিই শিল্প হয়ে উঠল যে।

ভিনী হেসে উত্তর দিলেন,—শুধু রান্না কেন? সারা জীবনটাই হয়ে উঠুক শিল্প। গানের সুরে তাকে বেঁধে নাও। দিনগুলো হয়ে উঠুক এক একটা সনেট। জীবনযাত্রায় না থাকে যেন কোন জড়তা, নজরে কোন নোংরামি আমরা ইয়োরোপের সাধারণ লোক তাই চেয়েছি। এই হচ্ছে আমাদের অধ্যাত্মবাদ।

দুপুরে খাবার টেবিল পাতা হল ক্যারাভ্যানে নয়, খোলা মাঠে। আড়ালে; একটা নানা রঙের প্রকাণ্ড ছাতার তলায়। হলদে লাল নীল আর সবুজ রঙের ফালি ফালি কাপড়ের ছাতা। তা থেকে ঝুলছে রঙবেরঙের রেশমী ঝুলমি। রঙ ধরে গেল মনে।

চমৎকার স্বাদের খাবার খেতে খেতে বলে উঠলাম,—এতদিনে ঠিক বুঝতে পেরেছি ইংরেজ কি করে পৃথিবীময় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল।

মুড়ে রাখা যায় এমন ক্যানভাসের আর প্লাস্টিকের চেয়ার ক্যারাভ্যান থেকে এনে পাতা হয়েছিল বাইরে। অতিথি দু-জন হচ্ছেন এক ফরাসী অধ্যাপক আর এক মার্কিন ব্যবসায়ী। আমি অবশ্য অতিথি নই। ঘরেরই একজন।

মার্কিন আমার কথাটি শুনে তাড়াতাড়ি তাকালেন ফরাসীর দিকে। অবশ্য আড়চোখে। একজনের দেশ একটা নতুন রকমের রূপোর সাম্রাজ্য গড়ে তুলছে। আরেকজনের দেশ একটি সাম্রাজ্য হারাতে বসেছে। আমি একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া সাম্রাজ্যের লোক। সেই সাম্রাজ্য যারা হারিয়েছে ভি তাদের প্রতিনিধি। নরওয়ের মেয়ে ভিনীর মুখে যে হাসিটুকু জেগে উঠেছে তা থেকে কিছু ধরা ছোঁয়া যায় না।

হাল্কা হাওয়াটা কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠল।

আমি কিন্তু তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলাম না। বেশ গম্ভীরভাবে বললাম—ইংরেজ মেয়েরা এত সাদামাঠা রাঁধে যে ওদের ওই রান্নার চোটেই বিবাগী হয়ে যেত ছেলেরা। মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়ে

যেত। তার পর সাম্রাজ্য তৈরী করে বসা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকত না ওদের।

মাথার উপরের রঙীন ছাতার মত নানা রঙের আলোয় ঝলমল করে উঠল ওদের মন।

ফরাসী অধ্যাপক রসিক লোক। সাবেকী প্রজাপতি-মার্কা গোঁফজোড়া এখনো ছাড়তে পারেন নি। তাতে খুশি মনে তা দিতে দিতে বললেন—একথা শোনার পরে আমরা যদি সাম্রাজ্য রাখতে বা তৈরি করতে না পারি, আমার অন্তত কোন দুঃখ থাকবে না। দুনিয়ার গুণীজন ফরাসী রান্না চেখে দেখেছে। তারা হলপ করে বলবে যে, আমাদের বিদেশে যাওয়ার কোন কারণ নেই।

মার্কিনও খুশি হলেন নেহাৎ কম নয়। প্রায় একখানা শিষ দিয়ে ফেললেন। বললেন,—বাঁচা গেল। আমাদের ইকনমিক এমপায়ারে তাহলে কোনদিন ফাটল ধরবে না। আমরা ত রান্নার পাট একরকম তুলেই দিয়েছি। আমাদের হরেক রকম খাবার সেরা শেফ অর্থাৎ ওস্তাদ মহারাজরা তৈরি করে। আমরা ব্যবসাদাররা টিনে ভরে সেই খাবার দুনিয়া ভর চালান করি। সব জায়গাতেই তা পাই। আর খাই।

ভি-ও ছাড়বার পাত্র নন। বিশেষ করে মার্কিনকে। খাস ইংরেজের সব চেয়ে বড় মুরুব্বি হচ্ছে মার্কিন। আবার সবচেয়ে বড় সম্বন্ধীও। ভি তাই মার্কিনকে তাক করে একখানা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাড়লেন। বললেন,—সেই জন্যেই এককালে ইংরেজদের মধ্যে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করার এত রেওয়াজ ছিল। ওদের হাতের রান্না খেতে হবে এমন ভয় থাকত না।

মার্কিন ফোঁস করে উঠলেন,—সেই সঙ্গে ভরসা থাকত যে একটি সত্যি সুন্দরী আর ধনী বৌ লাভ হয়ে যাবে। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা যাকে বলে।

ভি ছাড়বার পাত্র নন। কথাগুলির মধ্যে একটা লড়াইয়ের ইশারা আছে। আছে ঝাঁজ, যদিও নেই ঝাল। ঠিক ব্রিটিশ মাস্টার্ডের মত। ভি হাঁকলেন,—তাহলে সত্যি সুন্দরী আর ধনী রাজকন্যেরা বিদেশে ঘর করতে আসতেন কিসের দুঃখে সেটা ভাবার কথা।

এবার আমি ফোড়ন দিলাম—কিচ্ছু ভাববার কথা নয়। আমেরিকান মেয়েরা বলে যে আমেরিকা হচ্ছে মেয়েদের পক্ষে স্বর্গ। এত স্বাধীনতা, এত সুবিধা, এত সম্পত্তি তাদের মুঠোর মধ্যে আপনা থেকে এসে পড়ছে। তবে ওরাই ত হচ্ছে এ যুগের সবচেয়ে সাহসিনী ঈভ। ঈভের মতই স্বর্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যাকুল।

ভিনী মধ্যস্থতা করলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রায় কখনো লড়াইয়ে যায় না। তিনিও গেলেন না। অনুরোধ করলেন যে টেবিলের স্বর্গে সবাই এখন ফিরে এলে ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন, প্রাচ্য দেশের বিজ্ঞ লোকটিই খাবার সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়েছে।

ওঃ! একেবারে পুরোপুরি মেয়ে বটে! কিবা সুয়েজের এ-পারে আর কি বা ও-পারে।

ভিনী এক লাফে ক্যারাভ্যানে চলে গেলেন আরো কিছু নতুন পদের খাবার আনতে। ভি গেলেন পিছু পিছু। এদেশে চাকর-বাকরের সাহায্য আর ঝামেলা নেই বহু সংসারে। লোকে যখন দেশ বেড়াতে বেরোয় তখন চাকর রাখবার কথাই ওঠে না। কাজেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য করে কাজ চালিয়ে নেয়। আমায় ইশারায় জানিয়ে গেলেন অতিথিদের দেখবার জন্য।

সেই সুযোগে ফরাসী অধ্যাপক তার ঝুলি থেকে নয়া রসিকতা বের করতে শুরু করলেন! মার্কিনকে জিজ্ঞেস করলেন—শুনেছি মার্কিন মেয়েরা নাকি খুব বেশী পিউরিটান অর্থাৎ নীতিবাগীশ নয়?

মার্কিন ছাড়বার পাত্র নন। পাল্টা টিপ্পনী ঝাড়লেন—পিউরিটান হোক শুধু সেই মেয়েরা যারা একেবারে গোবরগণেশ-মার্কা; প্লেন

অর্থাৎ সাদামাঠা। অন্য মেয়েরা পিউরিটান হলে তাদের ক্ষমা করা যায় না।

ফরাসী আরো এক কাঠি উপরে উঠে গেলেন—কোন মেয়ে যে পিউরিটান হয় তা আমি বিশ্বাসই করি না। দেখান, কোথায় সেই মেয়ে যার প্রতি প্রেম নিবেদন করলে সে পুলকিত হয়ে উঠবে না? সে যদি একটু বাধা দেয়, জেনে রাখবেন যে সেটা ছল। ওই করেই নিজের আকর্ষণ বাড়াচ্ছে।

আমেরিকানের বয়স ফরাসীর চেয়ে কম। বললেন—আপনার নিশ্চয় এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশেষত আপনার নিজের দেশে। আচ্ছা, ফ্রান্সে কোন বিদেশী যদি ফরাসী মেয়েকে হঠাৎ চুমু খেয়ে বসে মেয়েটি কোন আপত্তি করবে?

ফরাসী গোঁফ চুমরিয়ে খুব আমেজী ভাব দেখিয়ে বললেন—সে হয় আপনাকে বিয়ে করে ফেলবে, না হয় হাতের দস্তানা দিয়েই এক ঘা চড় কষিয়ে দেবে। কিন্তু যদি চড় কষিয়ে দেয় আপনি তাহলে কি করবেন?

মার্কিন উচ্ছ্বসিত ভাবে উত্তর দিলেন,—সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাব।

ফরাসী খুশি হয়ে উঠলেন—শাবাশ! আপনার কন্টিনেণ্টে ছুটি কাটাতে আসবার অধিকার হয়ে গেছে। এই কাঠখোট্টা ইংলণ্ডে আর বৃথা সময় অপব্যয় করবেন না। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে চলে আসুন। একটা টিপ (সঙ্কেত) দিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গে এমন ভাবে কথা কইবেন যেন তার প্রেমে পড়েছেন। আর প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গে—যেন সে আপনাকে 'বোর' করে তুলছে, উত্যক্ত করছে। ব্যস, এক সন্ধ্যাতেই মাজাঘষা সমাজে মজলিশি বলে আপনার নাম হয়ে যাবে।

মার্কিন উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়োরোপের সমাজে

ঢুকতে পারা বেশ শক্ত বলে শুনেছি। আমেরিকানরা টাকার জোর থাকলেও নিজেদের মধ্যেই কোণঠাসা হয়ে থাকে।

ফরাসী বেশ মুরুব্বি ভাবে জবাব দিলেন—ঠিক তা নয়। উপর-তলার সমাজে মিশতে গেলে তাদের হয় খুব খাওয়াতে দাওয়াতে হবে, আর না হয় 'শক' করে দিতে হবে। কবি লেখক প্রভৃতিরা আমাদের দেশে শেষের পথটা বেছে নিয়েছে। আর ওদের প্রত্যেকেরই সাফল্য, প্রতিপত্তির পিছনে আছে সমাজের মাথা বড় বড় মহিলার নেকনজর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু ওদের এত ক্ষমতা কি করে হল আপনাদের দেশে? ওরা আমেরিকান মেয়েদের মত নিজেরা সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেন না, বা ব্যবসা চালান না।

ফরাসী বললেন—আপনি ইণ্ডিয়ার লোক। তাই বোধ হয় জানেন না, হয়ত মানেন না, যে মেয়েদের ইতিহাস হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারের ইতিহাস। সবলের উপর দুর্বলের অত্যাচার।

হেসে প্রতিবাদ জানালাম, পৃথিবী শুদ্ধ রসিক লোকরা ত সেই অত্যাচারই মনে মনে চেয়ে এসেছে। প্রমাণ চাই?

মার্কিন বাধা দিলেন—থাক, থাক। মেনে নিলাম আপনার কথা। কিন্তু প্রফেসার, আপনি কি কখনো বিয়ে করেছিলেন?

ফরাসী চোখা জবাব দিলেন—বিয়ে পুরুষরা করে প্রেম করে করে হাঁফিয়ে পড়ে বলে। আর মেয়েরা করে প্রেম করে করে ওদের ঔৎসুক্য বেড়ে যায় বলে। বলা বাহুল্য দু'পক্ষই পস্তায়।

হাওয়াটা এত হাল্কা হয়ে উঠেছে যে কোন কিছু দ্বিধা না করেই জিজ্ঞেস করলাম—তবে আপনি কি বিয়ে করে সুখী হন নি?

ফরাসীর গোঁফজোড়া যুদ্ধং দেহি ভাবে জেগে উঠল। তিনি বললেন—অবশ্য হয়েছি। কারণ বিবাহিত লোকের সুখী হওয়া নির্ভর করে সেই মেয়েদেরই উপর যাদের সে বিয়ে করেনি।

এ হেন তালেবর লোকটির প্রতি প্রায় শ্রদ্ধার ভাব এসে গেল। সে-কথা বলতে যাব এমন সময় ভিনী আসছেন। শ্‌ শ্‌।

অর্থাৎ স্ট্যাগ পার্টিতে অর্থাৎ তরুণ হরিণদের মধ্যে যে রকম মুখের বল্‌গা আল্‌গা করা যায়, হরিণীরা হাজির থাকলে তা করা চলবে না। আমরা সবাই একটু ভদ্রমার্কা হয়ে গেলাম।

ভিনী দূর থেকেই জিজ্ঞেস করলেন—কই ডক, তোমরা একটু চুপচাপ মনে হচ্ছে।

তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে ভিনী বললেন—আপনারা বোধহয় এই মেঠো মধ্যাহ্ন-ভোজনে আরাম পাচ্ছেন না। ঈ ওলডি ট্যাভার্নে সেই পুরোনো সরাইখানায় হয়ত এতক্ষণে জমাট একটা লাঞ্চ-পার্টি বসে গিয়েছে।

মার্কিন তাড়াতাড়ি ভদ্রভাবে আপত্তি জানালেন—না, না, ওই সব লাঞ্চ-পার্টি আমার তেমন পছন্দ লাগে না।

আমিও সায় দিলাম। বললাম,—আমারো তেমন পছন্দ লাগে না। কারণ, সেখানে বোকারা কথা কয়ে মরে, আর চালাকরা শোনে না। আমরা এই মুহূর্তে সবাই একটু চালাক হয়ে ওঠবার চেষ্টায় ছিলাম।

ভিনী হেসে উঠলেন—তার চেয়ে বরং সবাই একটু বোকা হওয়া যাক।

মার্কিন এবার সায় দিলেন—আমি ত বোকাই হতে চাই। এই চমৎকার গরম-আমেজে-ভরা গ্রীষ্মের ইংলণ্ড আমায় বোকা বানিয়ে তুলছে। কিন্তু আমাদের ফরাসী অধ্যাপক বন্ধু অতি চালাক লোক। ওরা দেশসুদ্ধ লোক ঠিক করেছেন যে আমেরিকার শুধু ডলারটুকু নেবেন এবং আর কিছু নয়। দুধ থেকে জল বাদ দিয়ে বাকীটুকু ছেঁকে নেবেন—রাজহংসের মত।

ফরাসী বলে উঠলেন—যুদ্ধের পর থেকে আমরা আপনার কোন্‌ জিনিসটা নিতে বাকী রেখেছি? নিয়েছি আপনাদের রকন্‌রল নাচ

আর জুকবক্স কলের গান, কাউবয় স্যুট আর খাটো নীল জিন পাৎলুন। পিন-আপ গার্লের ছবি আর স্লট মেশিনে জিনিস কেনা।

মার্কিন সে কথা শুনে বিচলিত হয়ে উঠলেন—আহা, সে কী দুর্ভাগ্য! ফ্রান্সের রেস্তোরাঁ থেকে যদি পরিবেশন করবার তরুণীরা চলে যায় তাহলে ফরাসী মেনুর সঙ্গে সঙ্গে রস পরিবেশন করবে কারা? কন্টিনেণ্টে খাওয়ার রোমান্সই যে চলে যাবে ক্যাফেটেরিয়া চালু হলে।

অধ্যাপক বললেন—তার বদলে আপনি দেখবেন প্যারিসের পথে ঘাটে—শুধু প্যারিস কেন, সারা ইয়োরোপের পথে ঘাটে—হাজার হাজার হলিউডের নকল-করা নায়ক-নায়িকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনাদের মুভি···

মার্কিন বাধা দিলেন—হ্যাঁ, কথাটা খেয়াল করুন। আমাদের জগৎজোড়া শিল্পটার নাম দিয়েছি মুভি। চলচ্চিত্র—চলতি দুনিয়ার জন্য। আমরা কোন স্থায়ী শিল্প বা জিনিস তৈরি করবার জন্য ব্যস্ত নই। চাই শুধু এগোনোর পথে এগিয়ে যেতে। ইয়োরোপ থেকে সভ্যতার চাকা এগিয়ে এসেছে আমেরিকাতে 'প্রডাক্ট' থেকে 'প্রসেসে'র পথে। আমরা ফল চাই না, চাই পাকিয়ে তোলা। প্রতিষ্ঠা করি না, গড়ি প্রতিষ্ঠান। বাস্তব সংসারের এত কিছু বস্তু আমাদের আছে যে তাদের দিকে আমাদের নজর নেই। এই দেখুন না, আমরা বছরে পঞ্চাশ লাখ মোটরগাড়ি তৈরী করি এক বছর মাত্র হাওয়া খাবার জন্য। কুড়ি বছর ধরে জমিয়ে রাখার জন্য নয়। আমরা পোশাক বানাই বছরের পর বছর পরবার জন্য নয়, শুধু একটা সীজ্‌নের হালফ্যাশন দুরস্ত হওয়ার জন্য।

আমি বলে উঠলাম—অর্থাৎ আমেরিকা আর এশিয়াতে একটা খুব বড় মিল আছে। দুটোই অপচয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা করেছি মানুষের অপচয়; আমেরিকা জিনিসের। এদিকে

ইয়োরোপে দুটোরই অভাব। তাই ওরা মানুষ আর জিনিস দুটোকেই দিয়েছে সম্মান। দিয়েছে স্থায়িত্ব।

ভি কখন থেকে উসখুস করছিলেন। খাবার টেবিলটা ক্লাসরুম হয়ে উঠলে চলবে কেন? তাতে যিনি খাওয়াচ্ছেন আর যারা খাচ্ছেন দু' পক্ষেরই লোকসান শেষ পর্যন্ত। তাই তিনি হেসে বললেন—যাই হোক, এটা ভাল ভাগ বাঁটোয়ারার বন্দোবস্ত হয়েছে যে, ইয়োরোপ বড় বড় পেন্টিং আঁকে আর আমেরিকা তা খরচ করে কেনে। প্যারিসে বসে ক্রিশ্চিয়ান ডিয়র খুব চোখ-ধাঁধানো পোশাক তৈরি করে; আর সব চেয়ে বেশি কাপড়-চোপড়ে জড়ানো সব চেয়ে অনাবরণ নাচ দেখান হয় নিউইয়র্কে।

কিন্তু মার্কিনের আঁতে একটু ঘা লেগেছিল। তিনি সহজে ছাড়বেন না। বললেন—তবু দেখুন, আমরাই ত ইয়োরোপকে দিয়েছি যুদ্ধের পর নতুন করে গড়ে ওঠার মালমশলা। তা না হলে কি থাকত ইয়োরোপের রাস্তায় রাস্তায় এত মাছের ডানার মত লেজওলা লম্বা লম্বা মোটর, নতুন নতুন আকাশছোঁয়া বাড়ি, পৃথিবীজোড়া ব্যবসা, কলকারখানা?

ফরাসীও ছাড়বেন না,—তা হোক, তবু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমরা এখনো আমাদের ক্রাই আর লাল ওয়াইন ভালবাসি। হট ডগ আর রকন্‌রলের জন্যে আমাদের পুরোনো প্রেমকে ছাড়তে রাজী নই।

আমিও যোগ দিলাম—আমরাও রাজী নই। বিশেষ করে বিদেশী টুরিস্টদের জন্য।

নতুন একটা মজার কথার সন্ধান হয়ত পাওয়া যাবে। তাই ভি তাড়াতাড়ি বললেন,—বলত ডক, তোমার দেশের কথা। আমাদের মার্কিন বন্ধু নিশ্চয়ই শিগগিরী ভারতে বেড়াতে যাবেন।

আহা ইণ্ডিয়া! মিস্টিক তন্ত্রমন্ত্র সাপুড়ে মহারাজার দেশ। সেখান থেকে ঘুরে এলে সমাজে পাঁচজনকে ডেকে গল্প শোনাবার ব্যবস্থা করা

যায়। এমনি জাদুর দেশ। মার্কিন একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন—আমি নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়া "করব"। ডুইং ইণ্ডিয়া ইজ মাই ড্রিম। আমার গিন্নী বলেছেন যে নির্ঘাৎ আগা খান বাই মুনলাইট দেখবেন; কারণ, তার আগে যে পরাণখানা ত্যাগই করতে পারবেন না।

আমিই যেন মুন থেকে পড়লাম।

অর্থাৎ আকাশ থেকে পড়লাম—চাঁদের আলোতে আগা খান? আমাদের দেশে? সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝলাম—হরি হরি! তাজ বাই মুনলাইট। তা, আর কি কি দেখতে চান বলুন? ঠিক সেই সব জিনিসগুলোই আমরা টুরিস্টদের জন্য জিইয়ে রাখতে চাই।

ওরা সবাই আমায় ধরলেন যে ইণ্ডিয়া দেখার একটা আদর্শ পঞ্জিকা করে দিতে হবে। দিল্লী আগ্রার খবর ওদের কাছে ভাল করেই জানা। কিন্তু বেনারস থেকে কলকাতা পর্যন্ত একদিনে সেরে দিতে হবে। স্রেফ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। সময় যে নেই। পশ্চিমে বিশেষ করে পশ্চিমেরও পশ্চিমে আমেরিকার জীবন জেট প্লেনের গতিতে উড়ে যাচ্ছে।

কফির পাট ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য লাঞ্চ-পর্বটা এত মুখরোচক হয়েছিল যে আড্ডাটা আপনা থেকেই বয়ে এসেছিল। একেবারে আধুনিক কবির প্রেরণার মত।

বললাম—লিখে নিন তবে আদর্শ টুরিস্টের ছক কাটা ডায়েরি।

তাকিয়ে দেখলাম যে কচি ঘাসের গালিচায় ফোটা তাজা ডেইজী ফুলের মত ভিনীর মুখে ফুটে রয়েছে তৃপ্ত কান্ত হাসি।

ভোর সাড়ে পাঁচটাতে—চা।

পৌনে ছটাতে—হোটেল থেকে রওনা। তার পর গঙ্গায় নৌকো-বিহার। তখন গুজরাটি কবিতা থেকে ছোট পকেট ডায়েরিতে টুকে

রাখবেন যে নৌকোটা হচ্ছে বাদামের খোলার মত। আমার প্রেয়সী যেন এটিকে আমার খুশীর জন্য জলে ভাসিয়েছিল। কবিতাটা আমেরিকায় ফিরে প্রত্যেক ডিনার-পার্টিতে আওড়ান চলবে। নৌকোটা ককটেলের গেলাসে বরফের কুচির মত দোলা খেতে থাকবে। দেখবেন নৌকো যেন পাল তুলে যায়—হাওয়া না থাকলেও। ঘাট মন্দির সাধু আর ভিখারীদের ফটো তুলতে হবে। ভেনিসের সান মার্কো গীর্জায় যেরকম করে খাবার ছড়িয়ে পায়রাদের জড় করা হয়, পয়সা ছড়িয়ে তেমনি করে ভিখারী ছোকরাদের জড় করতে হবে। বুড়ো, অথর্ব, নাঙ্গা এদের ছবিও তুলতে হবে।

সকাল সাতটা—হোটেলে ফেরা।

সোয়া সাতটা—ব্রেকফাস্ট।

সাড়ে সাতটা—ট্যাক্সি করে পুরোনো শহর দেখতে যাবেন। কেনাকাটা করতে হবে। নোট করে নিন যে বেনারসী ব্রোকেড কিনতে হবে। দুঃখের বিষয়, সকালে হয়ত কোন কালচারাল শো থাকবে না।

বেলা ১১টা—হোটেলে ফেরা।

১১-১৫—চটপট লাঞ্চ সারা।

১১-৪৫—এয়ারপোর্টে প্লেন ধরার সময় হিন্দী-মার্কিন ভাই-ভাই সোসাইটির পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া। তার ছবিটা অ্যালবামে রাখতে হবে।

১২-৪০—পাটনায় পৌছান। এখানে শহরের খুব কাছে আধঘণ্টা প্লেন থামবে; তার মধ্যে এক ছুটে শহরটা দেখে নিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে নেপাল যাবার প্লেন পাবেন। সেখানে গিয়ে কাঠমাণ্ডুটাও সেরে আসা সম্ভব। সেখানে রাজপুরীর কারুকার্য আর বাজার আর প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল দেখলেই হবে। তার জন্য শহরে আধঘণ্টা আর যেতে আসতে আড়াই ঘণ্টা।

বিকেল পাঁচটা—কলকাতা। এখানে ফোর্ট উইলিয়ামের গেট পর্যন্ত মোটরে, তারপর কালীঘাটের আশেপাশে আর কেওড়াতলার শ্মশানে গেলেই কলকাতা সারা হয়ে গেল। দিনের কলকাতা না দেখাই ভাল। কাজেই বিকেলে পৌঁছানর ফলে কিছু লোকসান হবে না। কিছুই 'মিস' করা হবে না।

সন্ধ্যার পরে—কালচারাল শো; কলকাতায় হরেকরকম কালচারাল শো হয়। একটু শান্তিনিকেতন ঘেঁষা হলেই ভাল হয়। ট্যাগোর 'সঙের জন্য অর্ডার নিশ্চয়ই দেবেন।

রাত সাড়ে নটা—ক্যাসানোভায় ক্যাবারে এবং খানা। সেখানে শিগ্গিরই দিল্লীর অশোক হোটেলের মত ভারতীয় নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতি 'মিষ্টিক' ললিতকলা দেখানর বন্দোবস্ত হবে বলে আশা করা যায়। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন সেখানে যা 'ফ্লোর শো' হবে তার নাম জিজ্ঞেস করবেন না। তবে বাঈজী নাচ নামটা জেনে রাখা ভাল। দেশে ফিরে এসে ক্লাবে কথাটা ব্যবহার করার সুবিধে হবে। তাতে সবাই তাক মেরে যাবে।

রাত সাড়ে দশটা—বিশ্রাম আর ছবিগুলো ডেভেলাপ করার বন্দোবস্ত। তাছাড়া সাতখান ছবিওলা পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে।

ভিনী বললেন—বাঃ, কোথায় গেল আমার সাপুড়ে?

—আর আমার গণৎকার? জিজ্ঞেস করলেন ফরাসী।

—আর আমার কিউরিয়ো শপ?—শুধোলেন মার্কিন।

হেসে ওদের ভরসা দিলাম। হৃদয়ের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। সাপুড়ে আর গণৎকার আর ঝুটো প্রাচীন কিউরিয়ো যদি না রইল তাহলে টুরিস্টের ইণ্ডিয়ার রইল কি? সব সাহেবী হোটেলের সামনেই ওরা মোতায়েন থাকবে। থাকবে ওদের পুঁথি, পুঁজি আর বেসাতি। কোন বিদেশীই নিরাশ হয়ে ফিরবে না। শুধু নিরালা একটেরে অজানা রয়ে যাবে আসল ভারতবর্ষ।

ফরাসী ঠাট্টাটা বুঝলেন। জানতে চাইলেন আমিও এই ধরনেই ইয়োরোপ দেখছি কিনা।

আমায় তার উত্তর দিতে হল না। ভিনী খুব আবেগভরে বলে উঠলেন,—পড়ে দেখুন আপনারা ডকের লেখা বই 'ইয়োরোপা'। ইংরেজী অনুবাদেই আমরা তা পড়েছি।

ওহো, আপনিই সেই বইটির লেখক?—প্রশ্ন করলেন আমেরিকান। তার চোখে প্রশংসা ফুটে উঠল।

কিন্তু ফরাসী অধ্যাপক মন্তব্য করলেন,—বুঝেছি। আর কাউকে বলতে হবে না। কিন্তু এত যাচাই করে পশ্চিমকে দেখতে দেখতে আপনি বোধহয় 'ডিস্ইলিউশনড' হয়ে যাবেন। পশ্চিম সম্বন্ধে কোন মোহই আপনার বাকী থাকবে না।

মানলাম না সে কথা। বললাম—হয়ত অনেক মোহ টুটে যাবে। কেটে যাবে অনেক মায়া। তার পরেও যেটুকু বাকী থাকবে তার দাম নেই। সেই অমূল্যের সন্ধানই আমি করতে চাই।

ভিনী হাসলেন স্নিগ্ধ ভাবে।

আমি প্রশ্ন করলাম—কি, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?

ভিনী আরো বেশী হাসলেন,—বিশ্বাস ত করতে চাই ডক, কিন্তু পুব দেশে যে অনেকে আমাদের বলে মেকী, নকল, আরো কত কি। বস্তুবাদের নাগপাশে পাশ্চাত্ত্যের নাকি নাভিশ্বাস হয়ে আছে। অবশ্য সুখের কথা যে তোমাদের চিন্তাশীলরা আমাদের অতখানি দোষ দেয় না।

আমি বললাম,—বিকেল গড়িয়ে এসেছে। আমরা ত আজই এখান থেকে ক্যারাভ্যান গুটিয়ে নিয়ে যাব। তার আগে একটা ছোট্ট গল্প বলি।

গল্পের গন্ধ পেয়ে সবাই চুপচাপ বসে পড়লেন। সবাই শুনতে চান আমার-চোখে-দেখা ইয়োরোপের কাহিনী।

আমি যে অফিসে রোজ কন্‌ফারেন্সে যাচ্ছি এই কিছুদিন থেকে সেখানে ঠিক সেই সময়ে সেখানকার দু'জন তরুণ-তরুণী কাজে আসে। রোজই দেখি মেয়েটির ব্যাকুলতা; ছেলেটির নজরে ভাল করে পড়তে হবে। সামান্য থেকে হয়ে উঠতে হবে অসামান্য। কিন্তু ছেলেটির যে তেমন কিছু উৎসাহ আছে তা মনে হয়নি। রোজই নজরে পড়ে দুটিকে। একজন ব্যাকুল, আরেকজন উদাসীন।

ইভ যেদিন স্বর্গে সেই নিষিদ্ধ আপেলটি খেয়ে আবিষ্কার করল যে তার পরনে কিছু নেই সেদিন থেকেই বোধহয় মেয়েদের পোশাকের সাধনা শুরু হয়েছে। সেটাই সব চেয়ে বড় প্রসাধন। মেয়েটি ছোটখাট: সাদামাঠা তার গড়ন পেটন। ছেলেটির চোখ ঘুরে বেড়ায় অন্যদিকে। কিন্তু একদিন দেখলাম একটা অদ্ভুত রূপান্তর। সন্ধ্যাবেলা পিকাডিলি দিয়ে চলেছে সেই মেয়ে আর সেই ছেলে। কিন্তু ছেলেটি একেবারে তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে চলেছে তার সঙ্গিনীকে। কোন্ জাদুর পরশ পেল সে? কোন্ বশীকরণ মন্ত্র?

ফিনফিনে শিফনের একটি স্বপ্ন যেন পায়ে হেঁটে চলেছে। আকাশ থেকে নেমে এসেছে মাটিতে। তার কটিতট ঘিরে একটা কালো রেশমের বন্ধনী; কোমর দেখাচ্ছে সরু আর চলন রাজহংসীর মত। গাউনের গড়নে তাকে দেখাচ্ছে একটু লম্বা আর গলাটি যেন ফুলের বৃন্ত। কোথায় দেখেছি এই ছবি? কোথায় দেখেছি? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল প্যারিসের মেয়েদের নতুন পোশাকের প্রদর্শনীর ছবি। তারই নকল দেখলাম মেয়েটির গায়ে। হাসিমুখে সে আমার দিকে খুশী হয়ে মাথা হেলিয়ে গেল। সেটুকু আমার নজর এড়াল না।

একশ বছরের উপর প্যারিস এই পোশাকের ব্যবস্থা চালাচ্ছে। একে দরজীগিরি বলব না, পোশাকের ব্যবসা বলব না—বলব প্রিয় প্রসাধন শিল্প। ক্রিশ্চিয়ান ডিয়র একাই বারশ লোক এই কাজে খাটায়। আর বছরে প্রায় সাত কোটি টাকা কামায়। পৃথিবী

জুড়ে তার সাতাশটা শাখা অফিস। দশ বছর আগে তার পোশাকের প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছিল নিউ লুক, নতুন চেহারা। বছর বছর উৎসব করে ঘটা করে নতুন চেহারার পোশাক ডিয়র বের করে। এমনি সব ডিজাইন যা নারীকে করে তৃপ্ত আর পুরুষকে অতৃপ্ত। কিন্তু ওই মেয়েটির একটি সন্ধ্যার মিষ্টি মুখভরা হাসির দাম এই সাতকোটি টাকায় কুলোবে না।

ভিনী কিন্তু আবার হাসলেন, বললেন—আচ্ছা ডক, তোমার কাব্য এখন থামিয়ে গল্পটা বলে ফেল এবার।

আমিও হাসলাম—আমাদের শাস্ত্রে বলে আনন্দ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। তার আসল ব্যাখ্যা জানি না, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানি না। তবে আনন্দ থেকে কি সৃষ্টি হল তা দেখলাম।

ভিনী জিজ্ঞেস করলেন—কি দেখলে ?

উত্তর দিলাম—তা-ও ঠিক জানি না। তবে এটুকু বুঝলাম যে ডিয়র ঠিক কথাই বলেছে যে তার মন্ত্র হচ্ছে নারীকে প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচান। যেখানে আছে অপূর্ণতা, যতটুকু আছে খুঁত, তাকে সারানই হচ্ছে সাধনা। কটি তোমার যদি না হয় ক্ষীণ, দেহ যদি না হয় রজনীগন্ধার বৃন্ত, সে দুঃখ কমাবার স্বপ্ন দেখছে সে।

—কিন্তু মেয়েটার কি হল ?

—কি হল তা তোমরাই বানিয়ে নাও।

—বাঃ রে! ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললেন ভিনী—তোমার গল্পটার কি হল ?

—গল্পটার বাকীটুকু অজানা। আবার জানাও ত বটে। একজন আর একজনকে ভালবাসে, তার মন পেতে চায়। সেইটুকুই সত্য। সেইটুকুই দেখেছি। বাকীটা নিজেদের মনে তৈরি করে নাও।···ঠিক এই যেমন আমি নিজের হাতে এক কাপ কফি তৈরি করে নিচ্ছি।

কিশোর সুর আর যৌবন সুরা

রসগোল্লার শুধু রূপ আর রসটুকুই সেদিন পথের ধারের আড্ডায় দেখেছিলাম। তার পুষ্টিকর ছানাটুকুর স্বাদ কয়েক দিনের মধ্যেই পেলাম।

অক্সফোর্ডে অধ্যাপক 'ড'র বাড়িতে বসে আছি। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। এখন বসে বসে শুধু গল্প, নানা রকম স্মৃতির রোমন্থন। কফি তৈরি করে দেওয়ার পর শ্রীমতী 'ড' দোতলায় চলে গেছেন। বয়স হয়েছে, এত বড় বাড়ির কাজকর্ম প্রায় সবই নিজের হাতে করতে হয়। স্বামীও সাহায্য করেন। একটি 'মেড' অর্থাৎ ঝি আসে শুধু সকালে আর বিকেলে। একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট নিলেই দুটি প্রাণীর চমৎকার চলে যেত। একমাত্র ছেলে অন্য শহরে কাজ করে। সেখানে নববধূ নিয়ে থাকে। পরিবারবর্গ নেই ; কিন্তু বই সে জায়গা জুড়ে বসেছে। বাড়িতে একতলা আর দোতলা ঠাসা শুধু বই আর বই।

ড্রইংরুমে আরো একজন লোক রয়েছেন। কে আন্দাজ করুন ত ? আপনি সম্ভবত অবাক হয়ে যাবেন। আমিও হয়েছিলাম, যখন খাবার টেবিলে নিমন্ত্রিত ফরাসী অধ্যাপক 'ল'কে দেখলাম।

আরো অবাক হয়েছিলাম তাঁর বিদ্যার বহর দেখে। বিদ্যার সাগরে একেবারে নৌবহর। রসশাস্ত্রের নয়, সাহিত্যের নয়, একেবারে গুরুগম্ভীর দর্শনের অধ্যাপক।

আর শ্রী 'ড' ইতিহাসের।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অজানা অধ্যায়ের উপর তাঁর গবেষণা আলো এনে দিয়েছে। তার জন্য তিনি যে কত কষ্ট সয়েছিলেন

শুধু সেটুকুই এখানে জানাচ্ছি। কারণ তিনি নিজেকে জানাতে খুব কুণ্ঠিত। তাঁর অধ্যায়টির জন্য তিনি পঁচিশ বছর আগে ইংরেজ সৈন্যদলে ঢুকে একটা খুব দুর্গম আর বিপজ্জনক এলাকাতে এসেছিলেন। সাধারণ পদাতিক সৈন্য হয়ে বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কষ্টের কথা তিনি কখনো বললেন না। ক্লাসে শুধু ঠাট্টা করে বলতেন, —ভারতবর্ষ একটা কাঠখোট্টা দেশ। আর বড় একচোখো। ওখানকার ছেলেরা ইয়োরোপে এসে কত খোলাখুলি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে। আর পোড়াকপাল আমার, আমি কিনা ওদেশে একটুখানি মোকাও পেলাম না। বোর্খার নীচে, পর্দার আড়ালে, আহা, না জানি কত বসরাই গোলাপ ফুটে আছে।

আমি যখন ওঁর কাছে চিঠি লিখলাম যে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে চাই, তিনি শুধু যে আসতে লিখলেন তা নয়। তাঁর অতিথি হয়ে থাকতে হবে। পুরোনো ছাত্রের কাছে নতুন ইণ্ডিয়ার খবর পেতে চান। নতুন করে পুরোনো অক্সফোর্ডকে দেখাতে চান।

আমাকেও দেখাতে চান তাঁর স্ত্রীকে। শ্রীমতী 'ড'কে তখন দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু তেইশ বছর আগে তোলা সহপাঠিদের একটা গ্রুপ ফটো অধ্যাপকের কাছে ছিল। সেটি বের করে তার মধ্যে তিনি আমার চেহারা শ্রীমতীকে দেখিয়ে চিনিয়ে রেখেছেন। দেখলাম যে, আমি তাঁর কাছে অদেখা হলেও অচেনা নই। অজানা নই।

আমার প্রতি অধ্যাপক এবং শ্রীমতী 'ড'র এত স্নেহ, এতখানি আন্তরিকতা আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। কফি খাওয়া কখন যে শেষ হয়ে গেছে খেয়াল করিনি। ভাবছি সে কথা আর একদৃষ্টিতে চেয়ে আছি। পূর্ণ মনে তাকিয়ে আছি শূন্য ছাইদানিটার দিকে। এইমাত্র অধ্যাপক 'ল' তাতে সিগারেটের একটু ছাই ঝেড়েছেন। আর একটু পোড়া টুকরো। কলকাতার পীচ-ঢালা রাস্তায় বৈশাখী দুপুরে

হালকা একটু ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব দেখা যায়। তেমনি ধোঁয়াটে একটু আভাস ছাইদানির উপরে উড়ে যাচ্ছে।

উৎসুকভাবে অধ্যাপক 'ল' জিজ্ঞেস করলেন,—কি অত দেখছেন ছাইদানিটাতে ?

—শত শত হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নের চিতা।

'ল' একেবারে অবাক হয়ে গেলেন,—অ্যাঁ! এরকম একটা বর্ণনা দেওয়া হল একটা অ্যাশট্রের সম্বন্ধে? উনি একলাফে উঠে এসে আমার হাত তুলে ধরে হ্যাণ্ডশেক করতে লাগলেন। হ্যাণ্ডশেক নয়, একখানা আর্থশেক, অর্থাৎ ভূমিকম্প বলা যেতে পারে।

বিব্রত হয়ে অধ্যাপক 'ড'র দিকে তাকালাম। তাঁর নীল চোখে স্নেহভরা প্রশংসার ছায়া।

টিউটন আর ল্যাটিন, ইংরেজ আর ফরাসীতে এরকম তফাৎই হয়।

ইউ ডিজার্ভ অ্যানাদার কাপ অফ কফি। তোমার আরেক কাপ কফি পাওয়া উচিত—এই বলতে বলতে তিনি আবার কফি তৈরি করতে বসলেন।

ততক্ষণে 'ল'র মনে আরেকটা ঢেউ এসে গেছে। তিনি উঁচু গলায় ঘোষণা করলেন,—ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে। আমাদের শিশু কবি মিনু ক্রুয়ে এরকম একটা কথাই লিখেছে তার কবিতাতে। সে লিখেছিল—এতগুলো হারানো স্বপ্নের 'ইনসিনারেটার' অর্থাৎ আবর্জনা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলার ছোট্ট এই চুল্লী—যাকে বলা হয় অ্যাশট্রে।

হঠাৎ একটা ভাব, একটা আইডিয়ার ছবি মনে এসে গিয়েছিল। তার সঙ্গে কোন কবির ভাব বা কোন শিশুর বর্ণনার তুলনা করাতে একটু কুণ্ঠা লাগল। তার চেয়ে মিনু ক্রুয়ের কথাতে চলে যাওয়া যাক। সম্ভবত এই শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক বিস্ময় হচ্ছে আট বছর বয়সের কবি মিনু ক্রুয়ে।

হঠাৎ একদিন একজন ফরাসী প্রকাশক একটি বাচ্চার হিজিবিজি

হাতের লেখা একটা কবিতা দেখে চমকিয়ে উঠলেন। তার অল্প কিছুদিন আগেই এই প্রকাশক আরেকটি অল্পবয়সী ফরাসী মেয়েকে আবিষ্কার করেছিলেন। আঠার বছরের মেয়ে ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর প্রথম উপন্যাসখানাই সারা দুনিয়ার মধ্যে বেস্ট সেলার হয়ে গেল। সেরা ফরাসী সাহিত্যের পুরস্কার ত পেলই। এক ফ্রান্সেই কিছুদিনের মধ্যে 'বঁজুর ট্রিস্টেস' বইটি বিক্রী হল তিন লক্ষ কপি। আমেরিকায় ইংরেজী অনুবাদ বিক্রী হল এক লক্ষ। কিন্তু মিনু ক্রুয়ে তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর আবিষ্কার।

বাপ-মা নেই বলতে গেলে জন্ম থেকেই। দু' বছর বয়সে মিনুকে পালিতা মেয়ে বলে গ্রহণ করল একজন কুমারী বুড়ি। মিনু আর তার পালিতা মাকে গ্রাম থেকে উঠিয়ে আনলেন দূরদর্শী প্রকাশক। ছোট একটি কবিতার বই বের করলেন। মোটে দশখানা কবিতা আর দশটি সিঁড়িভাঙা ছন্দে লেখা চিঠি।

খুঁজিনু নভতলে
একের পর এক
স্নিগ্ধ তারা দলে
অনিমেখ।
রাতের শীতল কপোলেতে
তারা অশ্রুর মত পিছলায়।
যে বালিশে মাথা গোঁজ হায়
তারে যবে ফুলে ভরে তোলে
অনেক অনেক সব তারা,
মোর নীল বেদনায় ভরা,—
ঝিকিমিকি বিনুনীর ফিতে
দিয়ে বাঁধি সে ফুলের তোড়া।

ফিতে দিয়ে বিনুনী বাঁধা কচি মেয়ে মিনু। ফরাসীতে মিনু হচ্ছে বিড়াল ছানার আদরের ডাক নাম। সেই মিনু সর্বহারা একলা অনাথা মেয়ের অনুভূতি নিয়ে লিখল—

গাছ

একটা অগোছাল শিশুর আঁকা—
বড় গরীব সে,
পারেনি রঙীন খড়ি কিনতে।
তার ইস্কুলের ম্যাপ আঁকা খড়ির
শেষ বাদামী টুকরোগুলো নিয়ে
হিজিবিজি এঁকেছে সে।
গাছ, আমি এলেম তোমার কাছে।
সান্ত্বনা দাও আমাকে,
আমি শুধু আমি বলে।

একেবারে স্বাভাবিক শিশু; কিন্তু পরিণত তার দৃষ্টিভঙ্গি; পূর্ণ তার প্রকাশের পরিকল্পনা শক্তি। কবি ও সাহিত্যিক জ্যঁ কক্‌তো বললেন —এ মেয়ে ত একটি ছোট্ট মেয়ে নয়, এ হচ্ছে 'আশী বছরের বুড়ি বামন'।

কিন্তু মিনু তার বয়সের সঙ্গে তাল রেখে পশুপক্ষী, গান আর প্রকৃতির টানে আকুল হয়ে আছে। নিষ্প্রাণ জিনিসে প্রাণ আছে মনে করে কবিতা লেখে। মানুষের অনুভবে রাঙিয়ে দেয় তাদের। একটা রাস্তার উপর সে লিখেছে :—

সাদা পথ,
কোথায় চলেছ তুমি?

তুমি শুধু একটি প্রসারিত বাহু
সুদূরে ছড়ানো—যা আমায় ডা
কাছে আসতে
আরো কাছে—
সেই বালাটির কাছে
যা ওই শেওলার দাড়ি গজানো সাঁকো
পরিয়েছে তোমার মণিবন্ধে।
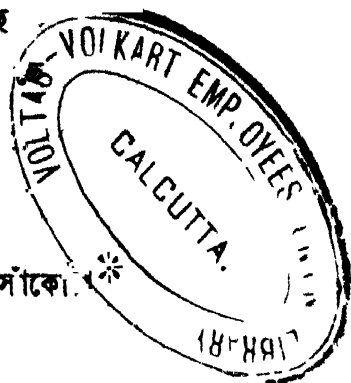
রোজ পাঁচ লাখ বিক্রী হয় এমন একটা প্যারিসের কাগজ এই কবিতাগুলোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফেটে পড়ল। একেবারে প্রথম পাতায় মোটা হরফে বেরোল সে খবর। ফরাসী সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভ্যরা মিনুর কবিতা সম্বন্ধে যা বলতে লাগলেন তাকে বলা চলে র‍্যাপসডি অর্থাৎ সংগীতময় উচ্ছ্বাস।

কিন্তু খ্যাতির পথে ছড়ানো থাকে অনেক চোরকাঁটা আর চোরাবালি। বাচ্চা মেয়ে। তাকে আক্রমণ করল ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মেয়েদের পত্রিকা। সাত লাখ কাটতির এই সাপ্তাহিক কাগজে বড় বড় শিরোনামা ছাপাল—মিনু দ্রুয়ে শিশু বিস্ময়, না বিস্ময়কর ঠক? দিনে এগার লাখ বিক্রীর পত্রিকা 'প্যারি সোয়া' সঙ্গে সঙ্গে মিনুকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য লেখালেখি শুরু করল।

মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় বাধা। বড় পথের কাঁটা। মহিলা পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি গিয়ে পাড়া-পড়শীদের কাছে গোপনে খোঁজখবর নিতে লাগল। মিনুর মা মেয়ের সম্বন্ধে যা যা বলেছে তার সঙ্গে সে সব খবর মেলে কি না তা যাচাই করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কাগজে ঘোষণা করল যে, মিনু আদপেই সে-সব কবিতা লেখেনি। লিখেছে হয়ত তার মা। হয়ত মা নিজের অবচেতন মনের, ব্যর্থ জীবনের আশা আর বিফলতাকে রূপ দেবার জন্য এসব

কবিতা লিখেছে। টাকা হবে তাতে। হবে কত নামডাক। তাই শিশু মিনুর নামেই চালিয়েছে। নইলে মিনু বেচারী যে-সব কথা এই কবিতাগুলোতে লিখেছে তার মানেই বোঝে না!

কিন্তু ফরাসীদের শিভ্যাল্‌রীর দিন এখনো যায় নি। তলোয়ার তুলে নেওয়ার দিন অবশ্য আর নেই। সেটা এখন আর ফ্যাশন নয়। আইনও নেহাৎ বেদরদী এ সম্বন্ধে। তাই অসির বদলে মসী নিয়ে চলল লড়াই।

একটা বড় কাগজ দরদ দিয়ে দু' পাতা জোড়া বড় বড় হরফ নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ডুয়েলে নামল। রক্ষা করতে হবে "সেই সবচেয়ে ভঙ্গুর মানব মনোবৃত্তিকে—যার নাম হচ্ছে কবি।"

কবি আর বিপ্লবীদের জন্মভূমি বলে বিদেশীর কাছে নাম আছে বাংলা দেশের। সেই বাংলার একজন আমি। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মান নয়, ধন নয়, প্রিয়া নয়, কবি নিয়ে এই ন্যাশনাল ডুয়েলের কাহিনী শুনতে লাগলাম। এই কাগজখানা সবুজ কালিতে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা মিনুর পাণ্ডুলিপিগুলোর ছবি ছাপাল। তার পাশে হস্তাক্ষর এক্সপার্টদের পরীক্ষার ফল। এক্সপার্টের মতের উপর কথা বলতে যাবে কোন্ অর্বাচীন?

মেয়েদের কাগজ তাতেও ছাড়ল না। লিখল যে এসবই হচ্ছে ঠগবাজী। বুড়ি কুমারী ক্রুয়ে তার পালিতা কচি মেয়ের হয়ে সব কবিতাগুলো নিজে ভেবে নিয়েছে। রচনা করে দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—ছেলেমানুষী হরফে নিজেই লিখে দিয়েছে।

এর পরে শুরু হল বিড়ালছানার বিজয় অভিযান। মিউ মিউ থেকে তার সকরুণ ডাকের রূপান্তর হল—ম্যয় হুঁ, আমি আছি। তোমাদের সব চুকলী চুকে যাক এবার। আমি আত্মপ্রকাশ করলাম। একজন সমালোচক ঠাট্টা করে মিনুকে শোনাল,—বিল্লী বাচ্চা, তুমি বাছা পুতুলগুলির কাছে ফিরে যাও।

বিল্লু উত্তর দিল,—পুতুলগুলো হচ্ছে প্রাণহীন। আমার কি এই পৃথিবীতে আর কিছুই করবার নেই? তোমাদের মধ্যে?

ফ্রান্সের লেখক, গীতিকার আর সঙ্গীত-প্রকাশকদের সংঘের সভ্য করে নেওয়া হবে মিল্লুকে। এও একটা ফাঁদ। কারণ ওকে পরীক্ষা করে দেখা হবে যে সত্যি নিজে লেখে কিনা। একটা ঘরে একলা ওকে ছেড়ে দেওয়া হল। আর দেওয়া হল কয়েকটা বিষয়—যা থেকে যা খুশি বেছে নিয়ে কবিতা লিখতে হবে। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে মিল্লু বেরিয়ে এল আটত্রিশ লাইনের এক কবিতা নিয়ে। প্যারিসের আকাশ। ভোরবেলা একটা থালার উপর সোনালী আর রুপোলী ডিম ভেসে ওঠে। তারা অপেক্ষা করে কার? দ্বৈত-সঙ্গীত গায় কাদের জন্য?

টেলিভিসনের সামনে দাঁড়িয়ে সে কবিতা রচনা করল। লণ্ডনের উপর প্রায় পঞ্চাশ লাইনের কবিতা। প্রায় ঝড়ের মত লিখে ফেলল।

এই পর্যন্ত বলে অধ্যাপক 'ল' একটু মন্তব্য করলেন—ওয়ার্ডস্বার্থ লণ্ডনের উপর তাঁর চোদ্দ লাইনের কবিতা লিখতে কত সময় নিয়েছিলেন জানি না।

অধ্যাপক 'ড'র কথাটা তেমন পছন্দ হল না। তিনি বললেন,—বয়স আর সময় দিয়ে কবিতার গুণ মাপা যায় না। শুধু কবিতা কেন, সব সাহিত্যই। এই ধরুন না, টি. এস. এলিয়ট সাত বছর বয়সে একটা জীবনী লিখেছিলেন।

'ল' মাথা নাড়লেন,—আমি কবিতার কথা বলছি। গদ্য অনেকেই লিখতে পারে।

'ড' হার মানবেন না,—অত্যন্ত খাঁটি কথা। গদ্য-লেখকরাও কবিতায় কম যায় না। এই ধরুন, ঔপন্যাসিক জিন স্ট্যাফোর্ডের ছ' বছর বয়সে লেখা কবিতা:—

গ্রাভেল

কঙ্কর, কঙ্কর, মাটির উপরে
শুয়ে আছ নিরাপদ নির্ভরে ;
তোমাকে দেখায় কেন যেন তুমি মরা ?
কারণ কি এই যে তুমি শির-হারা ?

'ল'র মধ্যে একটু যেন ডুয়েলের ভাব জেগে উঠল—তা ত বটেই। শির-হারা নয়, শিকড়-ছেঁড়া। এখন আপনাকে অডেন, ডাইলান টমাস, স্পেণ্ডার এসব শিরওয়ালা কবিদের শরণ নিতে হবে ইংরেজী কবিতার পক্ষ নেবার জন্য। অবশ্য দুনিয়াসুদ্ধ সবাই এদের কবিতা জানে। কাজেই এ সম্বন্ধে আলোচনা না করলেও চলবে।

অধ্যাপক 'ড' হচ্ছেন গৃহস্বামী। নিজের অতিথির সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করবেন না। কারণ অতিথির মানরক্ষা হলেই নিজের মান। শুধু বললেন,—ইংরেজী ভাষাতেও শিশু কবিদের সম্মান দেওয়া শুরু হয়েছে। অবশ্য একেবারে সবচেয়ে উঁচুদরের শিশু-কবি বা শিশু-সাহিত্যিক হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া সহজ নয়। মিনু দ্রুয়ে একটা আকস্মিক বিস্ময়। কিন্তু এই ত সেদিন "রাইট মি এ পোয়েম, বেবি" এই নামে একটা শিশু-কবিতার সংগ্রহ বেরোল। শিশুদের লেখা। শিশুদের মন আর চোখের ছবি। পরিণত বয়সের ছাপ অকালে পড়েনি তাতে।

আমি কথাটা অন্যদিকে ঘোরাবার একটু চেষ্টা করলাম,—ফ্রান্সে কস্ট অফ্ লিভিং অর্থাৎ খাই-খরচার হার চড়চড় করে বেড়ে চলেছে। অবশ্য মিনুর কবিখ্যাতি তার চেয়েও বেশি হারে আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। আমার কিন্তু মনে হয় যে ছোটদের গল্পের বাজার এখনো আরো বেশি মাৎ হয়ে উঠতে পারে।

ওঁরা দু'জনেই জানতে চাইলেন আমার বক্তব্যটা কি।

আমি বললাম,—এই ধরুন বেলজিয়ামের মেয়ে য়্যান বোদার্তের গল্পগুলো। বয়স ত ছিল মোটে চোদ্দ। কিন্তু কি গল্পই না লিখেছে।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র, গ্রীক ঈশপ আর আমেরিকান ওয়াল্ট ডিসনী সবার সঙ্গে পাল্লা দেয়। ওর বাপ্ হচ্ছে কবি আর মা নাট্যকার। মেয়ে কিন্তু লেখে কিশোরদের গল্প। যখন স্কুল যেতে হয় না বা বাড়িতে পড়তে হয় না, তখন সে ঘুরে বেড়ায় বনে বনে।

বনেতে পরাণ পায় কাহিনী
কুকুর বেড়াল ভেড়া বাহিনী।

বোদার্তের কিশোরদের আর বাচ্চাদের গল্পের মধ্যে বাচ্চাদের ভাব একেবারে খাঁটিভাবে ফুটেছে। পঞ্চতন্ত্র আর হিতোপদেশে জন্তু জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। করছে নানা রকম মজার কাণ্ড-কারখানা। কিন্তু তারা বয়স্ক লোকের বুদ্ধি দিয়ে তৈরি। বাচ্চার মন দিয়ে নয়। তারা কিছু শেখাতে চায়। শুধু দেখাতে নয়। তাই বোদার্ত শিশু-সাহিত্যে হয়ত অমর হয়ে থাকবে।

এই কিশোরীর সবচেয়ে মজার সৃষ্টি' হচ্ছে কুকুর আর বেড়াল। একটা রাস্তার কুকুরের গায়ের রঙ নীল। সেজন্য বেচারীর কী মনের কষ্ট। সে শীতের ঠাণ্ডায় মরার সময় তার মনটাও ঠাণ্ডা হল। যাই হোক, সাদা বরফে তার শরীরটা ঢাকা পড়ে গেলে তাকে সাদা কুকুর বলে লোকে মনে করবে। একজন বড়ঘরের ঘরণীর ছোট্ট পুড্‌ল্ কুকুর ডিনার-জ্যাকেট পরে খেতে এসেছে। খেতে খেতে মনে হল যে মানুষরা থিয়েটার করে; ওরাই বা করবে না কেন? তখন ওদের শত্রু নর্দমার ইঁদুরদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে একটা নাটক অভিনয় করে ফেলল।

বোদার্তের কুকুররা কেউ কেউ ডায়েরি রাখে—কিশোর-কিশোরীদের মত। বিড়াল ভেড়া-তাড়ানী কুকুরের সঙ্গে কথাবার্তা কয়। ওদের জীবনে মানুষের উদাসীনতা বা নিষ্ঠুরতা যে ছায়া ফেলেছে তার বেদনা প্রত্যেক অল্পবয়সী পাঠক-পাঠিকাদের আকুল করে তোলে।

—বেদনা? বেদনার চেয়ে মিষ্টি আর কিছু কি আছে? বিশেষ করে যদি কিশোরীর মনের বেদনা হয়?

প্রশ্নটা করলেন অধ্যাপক 'ল'। বয়স হল প্রায় সাড়ে তিন কুড়ি। বিদ্যা অর্জন করেছেন ঝুড়ি ঝুড়ি। কিন্তু মনে ফুটছে সর্বদাই ফুলঝুরি।

আমরা উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

উনি তখন আবেশে প্রায় চোখ বুজে ফেলেছেন। মনে একটা খুশির আমেজ। একটা রসোত্তীর্ণ কবিতা বা কাহিনী মাথায় এলে বোধ হয় এইরকম হয়। তিনি মৃদুস্বরে বলে চলেছেনঃ—

"একটা অদ্ভুত বিষাদ আমায় ছেয়ে ফেলেছে। আমি একে বেদনা এই গম্ভীর সুন্দর নামটা দিতে ইতস্তত করছি। আগে বেদনার ভাবনা আমায় সব সময় আকর্ষণ করত। আজকাল এর পুরোপুরি আত্মপরিপূর্ণতার জন্য প্রায় লজ্জা বোধ করি। আমি বিরক্তি, দুঃখ আর কখনো কখনো অনুশোচনাও অনুভব করতাম। কিন্তু বেদনা কখনো জানি নি। আজ নরম করে দেওয়া তুলতুলে রেশমী জালের মত কিছু একটা আমায় ঢেকে দিচ্ছে, একলা করে দিচ্ছে।

সেই বসন্তে আমি ছিলাম সপ্তদশী আর সম্পূর্ণ সুখী।"

মুগ্ধ হয়ে গেলাম শুনতে শুনতে। সত্যি, কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেলা; সেই বয়ঃসন্ধিতে মধুর আনন্দ বেদনার কি চমৎকার বর্ণনা।

আবৃত্তি শেষ করে 'ল' আমার দিকে তাকালেন। বেশ রসমধুর একটি দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করলেন—হয়েছে কি আপনার নিবিড় পরিচয় এই বেদনার সঙ্গে?

হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলাম,—আপনি 'মিন' করেছেন—এই রকম কোন বেদনাময়ীর সঙ্গে?

প্রজাপতি যেন ফুলবন ছেড়ে উড়ে এসে বসেছে ওঁর মুখে, গোঁফের জায়গায়। সম্ভবত মনের মধুর সন্ধান পেয়ে। সেই গোঁফে স্নেহভরে

তা দিতে দিতে তিনি উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই একই কথা হল। আধারকে না পেলে ধরবেন কোথায় সে বেদনাকে ?

ব্লাশ করবার অর্থাৎ সরমে অরুণবরণ হবার বয়স বা বর্ণ কোনটাই নেই। তবু পুলকিত হয়ে বললাম,—এই বেদনা এঁকেছে যে মেয়ে তার…তার…মুখ নয়, লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ। সুপ্রভাত বেদনবিষাদ (বঁজুর ট্রিসট্রেস্)।

ব্রাভো, ব্রাভো, বাংলা সাহিত্য যে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে তার প্রমাণ পাচ্ছি—খুশি মনে আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ঘোষণা করলেন আমার অধ্যাপক 'ড'।

ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর প্রথম উপন্যাসই ধূমকেতুর মত সাহিত্যে তোলপাড় জাগিয়েছে। অষ্টাদশী কিশোরীর কলমের বন্দনা করেছে সারা পৃথিবী। হিস্পানী বংশের মেয়ে কিন্তু প্যারিসের বাসিন্দা। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বছরই পরীক্ষায় ফেল করে বুঝল যে পড়ার চেয়ে লেখাই তার আসল লাইন।

আর এমন ভাবে লেখা, এত দরদ আর আন্তরিকতা দিয়ে যে বোঝাই যায় না যে আত্মকাহিনী, না অন্য কিছু। আমি আমার কাহিনী বলছি। সবে স্কুল ছেড়ে এসেছি বাবার সঙ্গে থাকবার জন্য। বাবার স্ত্রী নেই, কিন্তু আকর্ষণী শক্তি আছে, আছে জীবন উপভোগের ইচ্ছা আর ক্ষমতা। বান্ধবী ছাড়া জীবন কাটে না। এমন সুখের পায়রার আকাশে উদয় হল আমার মৃত মায়ের এক বান্ধবী য়্যান। সে বাবার সঙ্গে প্রেমে পড়ল আর তাকে বিয়ে করে সম্মানিত শহুরে সংসার পাততে চাইল। বাবার রক্ষিতা বান্ধবী বিদায় হল। এবার শুরু হল সংগ্রাম—হৃদয় দিয়ে, মানসিক প্রবৃত্তি দিয়ে। রূপসী, সভ্যতার পালিশে চকচকে য়্যান চায় বাঁধাধরা ছক-কাটা জীবন। কাটতে চায় আমার নতুন-উড়তে-শেখা পাখা। অথচ আমি চাই স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ান ; চাই বাবার নিজেরও স্বাধীনতা আর আমার

প্রতি উদাসীনতা। তাই দেখে বাবার মনে ফিরে আসবে আগেকার আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত য়্যানের হার হল। কিন্তু সেই পরাজয়েই হল আমার পূর্ণ পরাজয়। তাকে ম্লানমুখে মোটর নিয়ে বাড়ি ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে দেখলাম। য়্যানও এক সময় আমারি মত ছোট্ট মেয়ে ছিল। তারপর হল কিশোরী; আরো পরে—পরিণত নারী। আজ সে হয়েছে চল্লিশ আর একেবারে একা। সে একজন পুরুষকে ভালবেসেছিল। আশা করেছিল সে দশ বিশ বছর তার সঙ্গে সুখে কাটাবে। আর আমি? ওর দুঃখী অসহায় মুখ আমারি সৃষ্টি। আমি পাথর বনে গেলাম।

খুশী হয়ে ফরাসী অধ্যাপককে শোনালাম—অনেক কিছু আশা করবার আছে বলেই আশা নেই, সুখ নেই এরকম ভাব দেখায় অল্প-বয়সীরা। ইয়োরোপের জীবনে এটা হচ্ছে একটা 'পোজ'। ফরাসীরা, বিশেষ করে ইনটেলেকচ্যুয়ালরা, বোধ হয় এই রকম অকাল নিরাশার মুখোশে খুব সুখ পায়।

উনি পাল্টা জবাব দিলেন,—এই একটু 'যাহা পাই তাহা চাই না' গোছের ভাব আর কি। অথবা 'নেতি' বাদ বলা যেতে পারে। যৌবনের ঢঙই হচ্ছে নির্বাণ।

সঙ্গে সঙ্গে শোনালাম—কিন্তু তার রঙ হচ্ছে গেরুয়া নয়, সিঁদুরে, ক্রিমসন।

আরো যোগ করলাম—কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে আজকের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে মাঝবয়সকে যে দাম দেওয়া হচ্ছে, তা বোধহয় আগে কখনো দেওয়া হয়নি। কন্টিনেণ্টাল আর আমেরিকান সাহিত্যে উঠতি বয়সের নায়িকারা সহকার লতা হয়ে জড়াতে চায় মাঝবয়সী নায়কদের সঙ্গে। ভাবি যে মধ্যবয়সের মধ্যে এত অফুরন্ত প্রেরণা হঠাৎ কি করে আবিষ্কার হল!

অধ্যাপক 'ড' হেসে বললেন—তার মানে আমাদের বয়সীদের জন্য

পথ খুলে যাচ্ছে। যাই বল, মাঝবয়স ভরসা দেয় বেশি, কিন্তু আশা করে কম। দায় নেয় সহজ মনে, কিন্তু আদায় করে না শক্ত হাতে।

মাথা নাড়তে নাড়তে সায় দিলাম—বোধ হয় আরো একটা কথা আছে। সংসারের কোন কিছুরই অর্থ নেই, সার্থকতা নেই এমন একখানা ভাব এই সাহিত্যে খুব বেশি। সে জন্যেই বোধ হয় নরনারীর অনন্ত বন্ধনের আদর্শকে এরা এত ভয় করে। পথে যেতে যেতে পূর্ণিমা রাতে যে দেখা হয় তার মধ্যে থাকে না বাঁধন, থাকে না বাধ্য-বাধকতা। ক্ষণেক প্রণয়ের পুলক উত্তাপের দিক দিয়ে যেটুকু লোকসান করে, উন্মাদনায় সেটুকু পুষিয়ে নিতে চায়। তারপর···

—আমি বলছি তার পরের কথা—বাধা দিয়ে বলে উঠলেন অধ্যাপক 'ল'। আমি বলছি। তারপর একদিন আসে ঠিক সেই সমাপ্তি যাকে প্রায়শ্চিত্ত বলতে পারা যায়। কিন্তু যা পছন্দ করে না কেউ। আসে অপেক্ষায় বসে থাকা সেই টেলিফোনের কাছে, যা বেজে ওঠে না। আসে বুক ফাটিয়ে মুখ ফুটে ভিক্ষা চাওয়া যে তোমা বিনে আমি বাঁচব না। আসে সেই সর্বদা মুখে লেগে থাকা ছাইয়ের স্বাদ যা কোন হুইস্কিই ধুয়ে নিতে পারবে না।

বলতে বলতে চটপট দাঁড়িয়ে উঠলেন অধ্যাপক 'ল'। হাত বাড়িয়ে দিলেন বিদায় নেবার জন্য। বললেন—আমারো টেলিফোন বেজে ওঠবার সময় হয়ে এসেছে। ইংলণ্ডে এসেছি। হুইস্কির দৌলতে ছাইয়ের স্বাদটা এখন একটু ধুয়ে নিতে হবে।

পরিহাসে ভরা কথা আর রহস্যে ভরা হাসি দিয়ে তিনি বিদায়ক্ষণকে অপরূপ করে তুললেন। চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ঘরটাতে যেন রয়েই গেল।

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর আধখানা খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দূরে সরে যাওয়া মূর্তিটা দেখতে পেলাম। অধ্যাপককে বললাম—অদ্ভুত চরিত্র, স্যার, এই লোকটির। সেদিন ক্যারাভানের পাশে বসে

খেতে খেতে মনে হয়েছিল একেবারে হাল্কা মেজাজের লোক। আজ বুঝলাম যে ওটা শুধু বাইরের রঙ, চটকদার রূপ। আসল মালটুকু যেমন ভারী, তেমনি শাঁসালো।

উনি হেসে ফেললেন—গতিশীল জীবনের মজাই হচ্ছে ওই। জানি, তুমি অনুযোগ করবে যে তোমাদের দেশে এরকম সহজে দেখা যায় না। কিন্তু দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, মনের বেড়ীও এবার খুলবে ক্রমে ক্রমে। খুব বেশি দেরি লাগবে না। খুব দ্রুতগতিতে সমাজ, জাতি এ সম্বন্ধে তোমাদের আইনগুলো বদলাচ্ছে।

তারপর বললেন—জ্যান্ত জাতির কথাই আলাদা। তাই তুমি দেখছ যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে এত অল্পবয়সী কবি শিল্পী প্রভৃতির আবির্ভাব। এই দেখ না জার্মানীর অবস্থা। জান, সেখানকার উৎসবগুলি কেমন হয়? 'ফাশচিং'-এর ঋতুতে কার্নিভ্যাল? তার মধ্যে ইয়োরোপের জীবনোচ্ছ্বাসের আরেকটা ছবি দেখতে পাবে।

জানি তাদের উৎসবের কথা। দেখেছি কেমন করে ওরা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। জার্মানীতে যে সব এলাকায় রোমান ক্যাথলিকরা দলে ভারী, সেখানেও সঙ আর রঙ কিছুমাত্র কম যায় না। ওরা ল্যাটিন জাতের উচ্ছ্বাস আর টিউটন জাতের পুরোপুরি কাজ হাসিলের ইচ্ছা—এই দুই মিলিয়ে শুরু করে কার্নিভ্যাল। এমন কি লোকে বাড়িভাড়া বা লীজ নেবার সময় শর্ত করে নেয় যে এই ভাড়ার মেয়াদের মধ্যে অন্ততঃ একবার বেপরোয়া ফুর্তি করে নিতে পারবে। তার জন্য বাড়ি মেরামত বা খেসারৎ কিছুরই দায় থাকবে না ভাড়াটের।

ডুসেলডর্ফে ফেব্রুয়ারিতে যে কার্নিভ্যাল হয় তার নামই হচ্ছে বুদ্ধুদের মিছিল। যত ফুর্তি নাচ-গান হৈ-হল্লা কর, তোমার সাত খুন মাপ। কারণ তুমি তখন বুদ্ধু। সেইটেই তোমার পরিচয়, তোমার ছাড়পত্র। সারা রাইনল্যাণ্ড জুড়ে চলবে এর জের। সমাজের

বাঁধন, রাজনীতির শাসন সব ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে যায়। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর বাঁধনও যদি সেদিন আলগা হয়ে যায় সেদিনকার জন্য, কেউ তার জন্য দায়ী নয়। যদি সেজন্য হয় রাগারাগি বা বিচ্ছেদ বা তার চেয়ে বেশি কিছু, পাঁচজনের হাসি-ঠাট্টার চাবুকই অবুঝ বুদ্ধুকে সমঝে দেবে। সন্ধ্যার পর নাচের পার্টিতে যাবার নিয়ম হচ্ছে যে দোরগোড়ায় স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। তার পরেও পার্টিতে খবরদার তোমরা দু'জনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলো। না হলে কি হবে বুঝতেই পারছ।

অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলাম—এই ত মোটে বছর দশেক হল যুদ্ধ শেষ হল। সব ভাঙাচোরাও এখনো মেরামত হয়ে ওঠেনি। অথচ এক মিউনিকেই এ বছর দু' হাজার এই ধরনের পাব্লিক বল-নাচ হল। কি করে সম্ভব হল?

উনি বললেন—অদ্ভুত জীবনী-শক্তিই হচ্ছে এর উত্তর। তোমার মন যদি থাকে স্বাধীন, কিছুতেই কিছু তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আর এ সব বন্যার জল উপচে যেতে না দিলে বাঁধই যে ভেঙে যাবে। কথায় বলে, মদের পিপেতে একটু ফুটো না রাখলে সেটা নির্ঘাৎ ফেটে যাবে। জীবনের সুরের মধ্যে আছে যে সুরা তার চেয়ে সেরা মদিরা আর কোথায় পাবে?

ভাবলাম—সত্যি, ঠিক কথাই বটে। আমাদের কবিরাও ত গেয়েছেন—

আমার এ দেহ নদী
যতই বাঁধি
বাঁধ ত মানে না।

জীবন তৃষ্ণা

হা ডু ডু—জিজ্ঞেস করল এক জন ইংরেজ আরেক জন ইংরেজকে।

হা ডু ডু—সেও শুধু এই কথাটুকু দিয়েই উত্তর দিল।

কিন্তু এই কথাগুলি তো শুধু প্রশ্নও নয়। শুধু উত্তরও নয়।

দু'জন ইংরেজের মধ্যে থাকে অপরিচয়ের বরফ। তাকে গলিয়ে ঝর্ণা বওয়াবার সুযোগ আছে এই কথাগুলিতে। কিন্তু সব বিদেশীই জানে কত শক্ত সে ঝর্ণার মুখ খুলে দেওয়া।

যদি বা মুখ খোলে, কথাগুলো হবে মাপজোক করা। এত ঘোরান পেচান যে, সে কথাগুলির জন্য কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে কিনা সন্দেহ হবে। ধরুন, আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করল,—আপনি কোন ইংরেজের সঙ্গে বাঙালী আড্ডা দিয়েছেন? আপনি নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিতে পারেন —আমার ভয় হয় আমি জানি না যে, আমি যদি আপনি হতাম তাহলে এমন একটা সাধু চেষ্টা করতাম কি না।

করবেন না। পঁচিশ বছর লণ্ডনে থেকেও হয়ত পারবেন না।

তার চেয়ে সেই পঁচিশ মাইল ইংরেজী খাল অর্থাৎ চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্সে চলে আসুন। কাফেতে এসে বসুন। অর্ডার দেবার জন্য তাড়া নেই। বিল নিয়ে ছুট করে হাজির হবে না। অর্থাৎ নেই চেয়ারের ভাড়া, নেই কেটে পড়বার ইশারা। জীবনের রাজপথে ঠিক উপরেই ফরাসী কাফে।

আর, আর—দোহাই 'শক' পাবেন না—ফরাসী ক্যাবারে।

কফির কাপ খালি। চোখ ঘুমে ভরা। কান কিন্তু সজাগ।

মাধবী দিনগুলি মিলায়ে যায়,
আকাশ তারা-ভরা ঘোরে চাকায়;
তুমি শুধু চলো অজানা পানে;
আঁধার রাত আর মরণ টানে।

ফরাসী কবি রেমঁ ক্যেনো লিখেছেন এই গান। গাইছে প্যারিসের মনোহারিণী তরুণী গায়িকা গ্রেকো। শুনছে বেঁচে থাকার দল। আমিও।

ফিস ফিস করে টেবিলে ঠিক আমার সামনে-বসা যুবকটি কি যেন বললেন।

আমাকেই নাকি? কিন্তু আর কেউ নেই এই দু'জনের টেবিলে। কাজেই আমাকেই নিশ্চয়। তাকালাম তার দিকে চোখ মেলে।

আহা! কালো চকোলেটের মত গহীন সুর!

চমকে উঠবার মত বর্ণনা। দেশে অনেক আসরে গানবাজনা শুনেছি। কিছুই না বুঝে অনেক বোঝার ভান করার অভ্যাস আছে। হরেক রকমের গালভারী কথা আর টেকনিক্যাল টার্ম মকস্ রাখতে হয়েছে তার জন্যে। কিন্তু গানের গলার এমন একটা বর্ণনার জন্যে তৈরি ছিলাম না।

তবে প্যারিসে নদীর বা পারের আঁধারে-ভরা ক্যাবারেতে এমন সব চটকদার কথাই আশা করা উচিত। নৈশ ক্লাবটির নাম হচ্ছে লে তাবু্য। অর্থাৎ নিষিদ্ধ। বারণ। যদি বারণ কর তবে…

সম্মতি জানালাম। সত্যি এমন মিঠে বেদনায় ভরা দরদী গলা শোনা যায় না। গানের কথাগুলো যেন কাঁপছে। সঙ্গের অর্কেস্ট্রাতে ধ্বনিত হচ্ছে মূর্ছনা নয়, মূর্ছা।

অপরিচিত যুবক একেবারে হাত বাড়িয়ে আমাকে আহ্লাদে যেন

জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—বাঃ, আপনিও তো দেখি কম যান না। আমাদেরই দলের কেউ হবেন নিশ্চয়ই।

মৃদু হেসে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ, হ্যাঁ অথবা না, যা খুশি ধরে নাও। এ ওস্তাদ নিজেকে ধরা দেবে না।

কিন্তু ছোঁয়া দিতে হল। তা না হলে নিজেই ঠকব। তাই শেষ পর্যন্ত বললাম—ফ্রান্সকে জানতে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই প্রতিবাদ করলাম—না, না। সেটা বড্ড বড় কথা হয়ে গেল। এসেছি শুধু এই রকম জায়গার হাওয়াটুকু নিজের মধ্যে নিতে।

মঁসিয়ে রেনো হেসে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন—সে কেমন করে হবে? এই নাচঘরের জাপানী ঠোঙায় মোড়া বাতি তো আপনার দেশের কড়া আলোতে ধরা পড়বে না।

বললাম, বেশ একটু আগ্রহ দেখিয়েই বললাম—মনের মধ্যে করে নিয়ে যাব সে আলো।

ঘরের আলো আরো কমিয়ে দেওয়া হল। গলার স্বর আরো নীচে নেমে এসেছে। আরো বেশী নিবিড়, মদির হয়ে মনের উপর মেঘ নামিয়ে দিচ্ছে। "আঁধার রাত আর মরণ টানে।"

এমনি আঁধার, আরো অনেক বেশী নেমে এসেছিল গায়িকা জুলিয়েট গ্রেকোর জীবনে। গেল বিশ্বযুদ্ধে প্যারিস বিনা যুদ্ধে জার্মানদের দখলে এল। পনের বছর বয়েসের জুলিয়েটের দিদি আর ডিভোর্স-করা অনাথা মাকে জার্মানরা ধরে নিয়ে গেল। কুলীদের ক্যাম্পে চালান দিল। যেখানে শত্রুর বোমা আর হামলা চলে সেখানে তো আর নিজেদের দেশের কুলী দিয়ে কাজ করান চলে না। পনের বছরের জুলিয়েটের কি হবে তা ভাববার দায়িত্বও জয়ী শত্রুপক্ষের নয়।

রাস্তায় চরে বেড়াত এমনি আরো অনেক ঘরভাঙা ভাগ্যভাঙা ছেলে মেয়ে। দিনে চুরি আর রাতে গেরস্তর দোরের পাশে ঘুমোন এই

মাত্র সম্বল। ইংরেজ আমেরিকানরা যখন পাল্টা হামলা দিয়ে প্যারিস দখল করল, তখন সেটুকুও রইল না। জুলিয়েট আর তার পথিক-বন্ধুর দল প্যারিসের শ্যামবাজার ছেড়ে বেলেঘাটা খালের ওপারে আস্তানা গাড়ল।

সেখানে একটা বোমায় ভাঙা খালি ক্লাব পড়েছিল। দুঃখের বরষায় ওরা সেখানে দল বেঁধে গান গাইত। যেন সামনে বসে আছে টিকিট কিনে একদল শ্রোতা, সমঝদার দর্শক। পরে যখন ক্লাবের মালিক ফিরে এল, সে এই দলের মধ্যে একটা নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পেল। সত্যিই ত। এখন ফ্রান্স ভরে আছে মিত্রপক্ষের সৈন্যে। তাদের পকেটে অঢেল টাকা, হাতে অনেক সময়। অনেকে তাদের মধ্যে ভদ্রঘরের লোক, কলেজের পড়ুয়া পর্যন্ত। যুদ্ধে যে দেশের কি দশা হয়েছে তার এমন একটা নমুনা এই ছন্নছাড়া দলের নাচগানের মধ্যে দিয়ে দেখালে দরদী মিত্ররা গলে পড়বে।

মিত্রসৈন্যরা গলে পড়ুক আর নাই পড়ুক, একজিস্টেনশিয়ালিস্টরা অর্থাৎ বেঁচে থাকার দর্শনবাদীরা জুলিয়েট আর তার দলকে খাইয়ে পরিয়ে জিইয়ে তুলল। সার্তর্, জ্যাঁ ককতো প্রভৃতি অস্তিত্ববাদের মন্ত্রগুরুরা ওদের নাম দিলেন "গুহার ইঁদুর দল"।

সেই দলের রাণী জুলিয়েট গ্রেকো পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাকে সারা দেহ ঢেকে গান করছে। অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে সুরের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছে। ওর যত্নে-ভরা অযত্নে-বেড়ে-ওঠা কালো চুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত নেমে ছড়িয়ে পড়েছে মরণের ঝর্ণাধারার মত। হতাশ প্রেম, অতীতের স্মৃতি আর আশাকে রূপ দিচ্ছে ওর "হাস্কি" গলার সুর। নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া সাহিত্যিক ফ্রাঁসোয়া ম্যরিয়াক ওর জন্য বিশেষ করে গান রচনা করেন। সার্তর্ লেখেন যে, ওর কণ্ঠে আছে এখনো না-রচনা-করা লক্ষ লক্ষ গান। গুহার ইঁদুরের জীবনকে গড়ে দিয়েছে যুদ্ধের সময়কার প্যারিসের রাস্তা। কিন্তু নিজের রাস্তা

সে গড়ে নিয়েছে সুরে সুরে গানে গানে। পিছনের দিকে সে ফিরে তাকায় না। নেই তার কোন পিছুটান।

নিজের মদের কাপে কঁয়ত্রো ঢালতে ঢালতে রেনো জিজ্ঞেস করলেন—কই আপনার যে পাত্রই নেই দেখছি।

একটু লজ্জামাখানো হাসি মুখে ফুটিয়ে বললাম—না, না, ঠিক আছে।

চোখ বড় বড় করে রেনো টিপ্পনী কাটলেন—ওঃ, আপনার বুঝি এতে শানায় না?

—না, না।

—বুঝেছি, আঁবসাঁত?

আঁবসাঁত খেলে নাকি এই দীন দুনিয়ার মালিক হয়ে পড়া যায়। সে এমন এক নেশা যার আমেজে বেহেশতের হুরী আর স্বর্গের ইন্দ্রপুরী কোনটাই এমন বেশী কিছু বলে মনে হবে না। তবে অত সুখ কপালে সয় না। অর্থাৎ ওর পরে আবার ওই বস্তুটাই চাই। তা না হলে জীবনটা মিছে হয়ে যায়। মাত্রা চড়াতে হয়। পুঁজির ঘড়াও গড়াতে হয় বেশী। কারণ এ নেশার নেই শেষ।

জোরে মাথা ঝাঁকুনী দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে না, ও রসেও বঞ্চিত এ অধম। এতটা জোরে আপত্তি জানাতে দেখে রেনোর হাসি পেল। তিনিও ছাড়বেন না। বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে বললেন—তা, আপনাদের দেশে ইংরেজী বা মার্কিন মাল এ সব খুব চলে। সম্ভবত চীনে চরস আর আরবী হাশিশ আজকালকার কেতাদুরস্ত লোকদের কল্কেতে আর ঠাঁই পায় না। সেজন্যেই মার্কিনী মালের কদর হয়েছে ইণ্ডিয়াতে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে বোকা ভাববে। তা ছাড়া কলকাতায় বড় জব্বর রকমের নেশার কারবার আছে বলে শুনেছি। ওই বেণ্টিক স্ট্রীট চীনেবাজার ওই তল্লাটে কোথায় না জানি। সুন্দরীদের

প্রসাধনের জন্য পাউডারের কৌটোয় করে সাদা নিরীহ চেহারার হেরইন আমদানি হয়। আবগারী বিভাগের নজর যত কড়া, মালের দামও তত চড়া। কাজেই নেহাৎ দেশের মুখ রক্ষা করবার জন্যেই একটু সবজান্তা গোছের পোজ দেব ভাবছি, এমন সময়—

—ও, বুঝেছি। আপনার পছন্দ বোধ হয় একেবারে হালের কো-পাইলট। তা ভাল মানুষ ভদ্রলোকদের জন্য কো-পাইলট হচ্ছে একেবারে আইডিয়াল।

নামটা শুনেছি। ব্যাপারটা জানলাম রেনোর কাছে। চণ্ডু, চরস ওসবের দিন চলে গেছে। ভদ্রলোকরা ওসব কড়া নেশা সহজে করতে চান না। হাঙ্গাম হুজুত অনেক। স্মার্ট ভাবটাও নেই। কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্র জীবন যাপন করতে করতে তার মধ্যেই একটু মোকা মাফিক 'কোটা'র বাইরে বেশী স্ফূর্তি করে নিতে চান কি? তাহলে কো-পাইলট বা বেণী হচ্ছে আপনার মনের মত দাওয়াই।

দশটা পাঁচটা দিনগত পাপক্ষয়, সংসারের ঝামেলা নিজে হাতে নিজের মাথায় বওয়া এ সবের পরে প্রাণে রসকষ আর কিছু বাকী থাকে না। কিন্তু রসের আকর্ষণ তো তা বলে কমে যায় না। পশ্চিমে সেজন্যেই সন্ধ্যেবেলা একটু আধটু সামাজিক মাত্রায় পানের রেওয়াজ আছে। মনকে তা রাঙিয়ে তোলে, দেহে আনে নতুন জোয়ার। কিন্তু তাতেই ত সবার আশ মেটে না। উত্তাল তারুণ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে যারা রাতের পর রাত ভোর পর্যন্ত নাচে, হৈহল্লা করে, পৌরুষের পরিচয় দিতে চায়, তাদের জন্য দরকার আরো অন্য কিছু। যে বেচারী চুক্তি করে সারারাত ট্রাক চালিয়ে বেশী কামাই করতে চায় আর যে সারাদিন কাজ করেও সারা সন্ধ্যে নাচঘরে নাইট ক্লাবে অনন্ত-যৌবনা উর্বশী বা অফুরন্ত অ্যাপোলো সাজতে চায়, তারা দু'জনেই এই ওড়ার কারবারে খোঁজে কো-পাইলট।

বে-আইনী ব্যাপার। অনেক চোরা-কারবারী চড়া দামে

অ্যাস্পিরিন বড়িকেই বেশী বলে চালিয়ে দেয়। হায়! সংসারে ভেজাল নেই কোথায়?

ঠিক বলেছেন—মন্তব্য করলাম আমি। সেই ভেজালের মুখোশ খুলে ধরবার চেষ্টাই ত করছে আপনাদের বেঁচে থাকার দর্শনবাদ। একজিস্টেনশিয়ালিজ্‌ম্‌।

ভদ্রলোক গরম হয়ে উঠলেন এ কথাতে—ঠিক বলেছেন। একেবারে হক কথা। আমিও দিনকেদিন বেঁচে থাকার দিকে একটু আধটু ঝুঁকে পড়ছি। তবে অবশ্য আমার একটা খুঁটি ঠিক রেখেছি। ভেসে যাবার তালে নেই আমি

হেসে শুধোলাম,—আপনার খুঁটি কি এইখানে গেড়েছেন না কি?

উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন,—আপনি প্যারিসের কতটুকু জানেন? কতটুকু চেখেছেন?

'চাখা' কথাটাই ব্যবহার করলাম। রেনো যে কথাটা বলেছিলেন তাতে শুধু দেখা বললে কিছুই হয় না। আস্বাদ করা বললে একটা ক্ষীণরক্ত অর্থাৎ এনিমিক বুর্জোয়া গম্ভীর বাঁধাধরা ভাব এসে পড়ে। কিন্তু চাখার মধ্যে একটা বেপরোয়া বেহিসেবী ব্যাপারের আভাস। আছে। মঁসিয়ে রেনোর বয়স অল্প, কিন্তু কথা বাছাই করার বাহাদুরি খুব বেশী।

জবাব দিলাম—লুভ্‌র্‌ মিউজিয়াম ভাল করেই দেখেছি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নামী মিউজিয়াম। তার সবচেয়ে দামী সংগ্রহ রেনোর এক ফুঁয়ে নস্যাৎ হয়ে গেল। ওটা তো অতীতের ইতিহাস। বেঁচে থাকার মন্ত্র ওখানে কোথায়?

ভার্সাই আর এফেল টাওয়ার প্যারিসের সবসে সেরা দ্রষ্টব্য। ভার্সাই প্যারিস থেকে অনেকটা দূরে হলেও প্রত্যেক প্যারিসযাত্রীই ভার্সাইয়ে তীর্থ করে আসে। সেই ভার্সাইও রেনোর ধোপে টিকল না।

বললাম—কিন্তু এফেল টাওয়ার থেকে প্যারিসের কি না দেখা যায়? শুধু জনমনিষ্যি নয়, তার প্রেম আর বেদনা দুই-ই নজরে আসে। আড়ালে আবডালে সব টেরেই।

রেনো মাথা নাড়লেন—হুঁঃ, দূর থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মঙ্গল গ্রহ দেখাও ওই একই জিনিস। মাটিতে নেমে আসুন, মঁসিয়ে। মাটিতে নেমে আসুন।

মঁসিয়ে অর্থাৎ মশায় মাটিতেই নেমে এলেন। বললেন—ফলি বারজেয়ার দেখেছি। অপেরা বা সীন নদীতে বজরা বিহারের কথা না হয় নাই তুললাম। ফ্রান্সের যা যা দ্রষ্টব্য সবই দেখেছি।

রেনোর মুখ ঠাট্টায় ভরে গেল,—ওঃ, ফলি বারজেয়ার! আমাদের বিদেশীর টাকা লোটবার সবচেয়ে বড় চৌরাস্তা। আরে মঁসিয়ো, ফ্রান্সে, বিবেচনা করে দেখুন, কিছুই না টেঁকার নিয়মটুকুই টিঁকে আছে। যেখানে রাজা আর রিপাবলিক, ফুর্তি আর ফরেনার শুধু যায় আর আসে, সেখানে ফলি বারজেয়ারই একমাত্র ধোপে টিঁকল। কেন জানেন?

সাগ্রহে জানতে চাইলাম। হয়ত কিছু বেসামাল কথাও কইবে। কিন্তু জানা মানেই ত আর মানা নয়।

রেনোর মুখে তোড় এসে গেল,—স্রেফ চোখের নেশা, মঁসিয়ে। চোখের নেশা। ফলি কথাটার মানে ছিল প্রেমিকদের জন্য জুৎসই ঘন ঝোপঝাড়। 'ফলি'র কর্তারা বলে যে সুঠাম সুন্দরীদের সাটিন আর নাইলনে মোড়া দেখেও যদি আশা না মেটে, তা হলে ওসব মানুষের তৈরি মোড়কের বাইরেই মেয়েদের দেখিয়ে দাও। ওঃ, জানেন না আপনি সে সব কথা। আমার নিজের বাবা বলেছেন সে সব কাহিনী আমাকে। উনি নিজেও অবিশ্যি অনেক কিছু দেখেন নি। সে প্রায় নব্বই বছর আগেকার কথা। প্রথম যখন ফলি খুলল তখন মেয়ে বলতে শুধু একটা দু' মাথাওয়ালা "ক্রিক"

অর্থাৎ অস্বাভাবিক মেয়ে ছিল। আর থাকত জাদুকর, গাইয়ে, কসরৎওয়ালা এসব। একটা জাদুকর নাকি জ্যান্ত সাপ গিলে ফেলত আর নিজের পেট কেটে খুলে বের করত মুক্তোর মালা। সে মালাগুলো আবার মহিলা দর্শকদের মধ্যে বিলিয়ে দিত।

একটু ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না,—অমন একটা মালা বোধহয় আপনার দাদু তাঁর প্রেয়সীকে দিয়েছিলেন।

রেনো অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ব্যাপার বুঝিয়ে দিলাম। ভারতবর্ষে দাদু এবং তস্য সহধর্মিনী বা বকলমে প্রেয়সীকে অমন ঠাট্টা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

—ভারী ত মহাভারত! এ আর এমন কি হল? আমরা ছেলের প্রেয়সীকে নিয়েও ঠাট্টা করি। ম্যরিয়াকের উপন্যাসে হয়ত পড়েছেন যে ছেলে বাপের রক্ষিতার সঙ্গেও প্রেম করে। যাই হোক। শুনুন তবে ফলির গল্প। ক্যানক্যান নাচ দেখেছেন?

স্বীকার করলাম যে দেখিনি, কিন্তু নেপল্‌সে শুনেছি। কি রকম একটা সন্দেহজনক বস্তু।

রেনো হাসলেন—বুঝেছি, সে সব আপনার রক্তে সইবে না। যাক। প্রথমে শুধু ঝুলমী ঝুলমী প্যান্টি আর পায়ের কালো রেশমী মোজার মাঝখানের আঢাকা অংশটুকুই ক্যানক্যান নাচের সময় ফলিতে দেখান হত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ওরা পুরানো কেলে মামুলী মেলামেশার ঢাক ঢাক গুড় গুড় ম্যরালস ভুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের খোলশও ছাড়তে শুরু করল। ইটালী যখন আমাদের পক্ষে যুদ্ধে নামল, তখন ফলিতে অর্কেস্ট্রায় ঘোর ঘটা করে মিলিটারী মার্চের বাজনা বাজানো হল। আর কি হল আন্দাজ করুন।

বলা বাহুল্য, পারলাম না।

কিন্তু রেনোকে তখন গল্পের নেশায় পেয়েছে। আমার কল্পনাশক্তির অভাবের জন্য তিনি পেছপা হলেন না। তিনি বর্ণনা করে গেলেন—

ওই মিলিটারী ঝাঁঝর বাজনার তালে তালে রেশমী পর্দা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক কুড়ি সৈন্ত নয়, সোনালী স্বপ্ন। পরণে ইটালিয়ান মিলিটারী পোশাক, কিন্তু একদিকে বক্ষ অনাবৃত। সেই দিক দিয়েই তারা চোখের আগুন-জ্বালা হানতে হানতে দর্শকদের মাঝখানে চার্জ করে এল। হাততালি আর নিশান ওড়ানর মাঝখানে যা কাণ্ডটা হল, কোন্ ইন্‌সেন্‌ডিয়ারী (আগ্নেয়) বোমাতে তা হতে পারত বলুন তো?

হার মানলাম।

কিন্তু রেনো থামলেন না—আমার বাবা কিন্তু আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে বলেন আরেকটা দৃশ্যের কথা। ১৯১৮-তে যুদ্ধ যখন শেষ হল তখনকার ব্যাপার। দেখুন, যুদ্ধের ধাক্কায় ধাপে ধাপে কেমন রীতি-নীতি সমাজে এগিয়ে চলেছে।

জানতে চাইলাম, কি রকম। ওদের দেশের এগিয়ে যাবার কথা ওদের দৃষ্টি দিয়ে জানতে চাওয়াই ভাল।

রেনো খুব খুশী হয়ে বললেন—এই ত চাই। রসগ্রাহী হয়ে উঠছে আপনার মন—বেশ বুঝতে পারছি। তবে শুনুন। প্রথম যে দিন 'ফলি'তে মঞ্চে নগ্নিকা নারী দেখান হল, তার বর্ণনা বাবা যা দিয়েছেন তা বলবার নয়। সমস্তটা 'হল' একেবারে নিঃশব্দ, সবগুলো চোখের দৃষ্টি আঠা মেরে আছে স্টেজের দিকে। একজন সোনালী ব্লন্‌ড ফুলে ফুলে ছাওয়া রথে চড়ে স্টেজে এসে রথে চড়েই বেরিয়ে গেল। মাথায় তার একটা ফুলের মুকুট আর পরনে শুধু ঝিকমিকে হাসি।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—পরনে শুধু মুখের হাসি?

হেসে জবাব দিলেন রেনো—কেন নয়? জানেন না মেরিলিন মন্‌রোর সেই চমৎকার জবাবটা? এক সময় বেচারীর বড় দুর্দশা যাচ্ছিল। অন্নজল জোটে না এমন অবস্থা। তখন এক দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের ব্যাপারী মার্লিনের নগ্ন ফটো তোলে। বেনামীতে ক্যালেণ্ডার ছাপাবার জন্য। পরে সে হলিউডে অভিনেত্রী হিসেবে

খুব নাম করতে শুরু করল। এত তাড়াতাড়ি এমন ভাবে কপাল ফেরান অনেকের সইল না। তারা সেই পেটের দায়ে ক্যালেণ্ডারের ছবি তুলতে দেবার খবরটা ফাঁস করে দিল। অনেকটা যেন বেফাঁস ভাবেই। ছুটে এল খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা। জানতে চাইল ঘটনাটা সত্যি কি না। সত্যি হলে কেরিয়ারের দিক দিয়ে ক্ষতি হবার ভয় আছে। ওরা সোজাসুজি মেরিলিনকে জিজ্ঞেস করল— সত্যিই আপনার গায়ে কিছুই ছিল না? ইউ হ্যাড নাথিং অন?

খুব সরল ভাবে অভিনেত্রী উত্তর দিল—ইয়েস, আই হ্যাড দি রেডিয়ো অন।

এমন একটা সরল অথচ চমৎকার জবাবে কাগজের লোকদের মনে সংবেদনা জাগল। ওরা বেশ গুছিয়ে মরিলিনের জীবনকাহিনী লিখল। প্রায় অনাথা বালিকার বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ। মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। বিধিলিপির সঙ্গে বোঝা পড়া। কোন অভিনয় বা শত রূপ লাবণ্যের পশরা এতখানি ওকালতি করতে পারত না। অভিনেত্রীর নাম সব তারাদের মাঝে জ্বলজ্বল করে উঠল। শুধু তাড়াতাড়ি নয়। রাতারাতি।

এদিকে রাত অনেক হয়ে গেছে। জমাট ভীড় চাঁদের মত গোল হয়ে একমনে দেখছে 'ফ্লোর শো'র মস্করা। যত গহীন হচ্ছে রাত, তত জমে উঠছে ক্যাবারে। রঙ চড়ছে সবারই মনে। কিন্তু এবার উঠতে হবে।

অথচ রেনোর মত দিলখোলা যুবকের সঙ্গও খুব লোভের। ক্যাবারেতে গেয়ার্স'রা (বয়রা) শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপিগুলো পপ্ পপ্ করে লাফিয়ে খুলছে। তার চেয়ে বেশী উৎসাহে, বেশী আমেজে খুলেছেন তিনি তাঁর মন। মুখের আগল।

বললাম—কিন্তু আপনাদের বেঁচে থাকার দর্শনের মর্মকথাটা এখনো বুঝলাম না। একজন জলজ্যান্ত একজিস্টেনশিয়ালিস্টের সন্ধানে আছি। যদি কারো দেখা পেতাম···

আমার কণ্ঠে হতাশা।

কিন্তু ওর কণ্ঠে ভরসা।

রেনো বললেন—ওদের কোন আড্ডায় ঢুঁ মেরেছেন কখনো?

ঘুমন্ত গলায় জানালাম—অবশ্য চেষ্টা করেছি। মোঁমার্তরে অনেক কাফে আর সরাইখানায় গেছি।

মুচকী হেসে ঠোঁট বাঁকালেন রেনো—এবং দেখেছেন আপনারই মত সব সন্ধানীদের। ঝাঁকে ঝাঁকে টমাস কুকের টুরিস্টের দল। না হয় বড়ঘরের বিধবা বুড়ী। ওদের দিয়েই এ সব জায়গার পয়মন্ত অবস্থা।

স্বীকার করলাম। এটুকুও কবুল করলাম যে বইয়ের বাইরে কোথাও এখনো ঠিক এক্‌জিস্টেনশিয়ালিস্ট যাকে বলে তা দেখতে পাইনি। সেজন্যেই অপথে বিপথে হাতড়াতে হাতড়াতে এই ক্যাবারেতে এসে পৌঁছেছি। যদি খোঁজ মেলে।

এটুকুও যোগ করে দিলাম যে, মঁসিয়ে রেনো মনে হচ্ছে একজন সমঝদার লোক। শুধু তাই নয়, একজন ইনটেলেকচ্যুয়াল। উনি কি আমায় নিশানা বাতলে দেবেন না?

গেল বিশ্বযুদ্ধের হানাহানিতে কোন নোঙরছেঁড়া, নিশানাছাড়া হারানো জেনারেশনের জন্ম হয়নি। কিন্তু ইনটেলেকচ্যুয়ালরা তা বলে বঞ্চিত হয়নি। তারা সৃষ্টি করেছে একটা নতুন চোলাই-করা ভাবের ধারা। নয়া ডিস্টিল-করা দার্শনিকতার পাঁচমিশেলী সুরা। পায়ে চলার পথের পাশে কাফে, আঁটসাট নীল রঙের খাটো পাণ্টালুন ("জিন") পরণী তরুণী, আর বিশ্বলুট বিপ্লবী ভাব—বামপন্থী আর বামাপন্থী দুই-ই: এগুলি মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকুনী দিতে থাকুন। অস্পষ্ট চিন্তার বরফে সবটা জমে আসবে। অথচ আপনাকে করে তুলবে গরম। যে ককটেল তৈরি হল তাতে মুখ ডুবিয়ে দিন। হয়ত আপনি চুমুক দেবেন না। হয়ত শুধু গুঞ্জরণ করবেন যে, আমি চাই

যে আমি মরেই যাই। অথচ বাঁচবার সাধ থাকবে অফুরন্ত। আমি কে? কেন আমি এই সংসারে এলাম? এই সব প্রশ্নবিলাসে মশগুল হয়ে থাকবেন, কিন্তু উত্তর যোগাবে না। তখনি আপনি হবেন এক্জিস্টেনশিয়ালিস্ট। অস্তিত্ববাদী।

উপনিষদেও এমনি ধারা প্রশ্ন আছে; এমনি সব জীবন-জিজ্ঞাসা। কিন্তু তার উত্তর, তার সমাধান হয়েছে অন্য পথে। আজকের পাশ্চাত্ত্য জগৎ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। কিন্তু উত্তর আসবে কোন্ পথে?

ফরাসীরা বিদেশীকে আমল দেয় না। অবশ্য ব্যবসা বা অন্য কোন খাতিরে ছাড়া। কিন্তু মঁসিয়ে রেনোর মন খুলে গেছে। তিনি একটা নামকরা এটর্নী অফিসের অংশীদার। প্যারিস থেকে কিছু দূরে একটা ছোট্ট শহরে একটা খুনের মামলা হচ্ছে। তাতে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে তাতে এই মতবাদের অনেক দিশা পাওয়া যাবে। আমি কি রেনোর সঙ্গে যেতে রাজী আছি?

সমাজের প্রতি, নরনারীর সম্বন্ধের প্রতি ফরাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চেয়ে অনেকখানি অন্যরকম। ওর মুখ থেকে এ পর্যন্ত যা শুনেছি, তাতে দেশে অনেকে 'শক্‌ড' হয়ে যাবেন হয়ত। ফরাসী জীবনের শাশ্বত ধারার চিহ্নও এতে হয়ত খুঁজে পাবেন না। তবু এদিকটার খবর জানাবার দুঃসাহস আমার আছে। জীবন তৃষ্ণাই পরম তৃষ্ণা। মৃত্যুকে জয় করেছে জীবন।

খুনের মামলা। তায় প্রেমঘটিত। তার চেয়ে বড় কথা, বেঁচে থাকার মতবাদের কথা এতে আলোচনা হবে। অবশ্যই যাব।

ব্যারিস্টারী না হয় না-ই করেছি। তিন বছর তো আর শুধু শুধু মিডল টেম্পলে ডিনার খাইনি।

বেঁচে থাকার তত্ত্ব

শুধু প্রেম নয়।

প্রেম আর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আদালতে তার প্রমাণ। সেই আদালতের জবানবন্দীতেই এই বেঁচে থাকার দর্শনতত্ত্ব অর্থাৎ একজিস্টেন শিয়ালিজমের গল্পটা খুলবে ভাল।

"মা হয়ে তুমি নিজের আড়াই বছরের মেয়েকে স্নানের টবে ডুবিয়ে খুন করেছ। পাছে সে চেঁচায় সে জন্যে তার মাথা জোর করে নিজের হাতে জলে ডুবিয়ে ধরে রেখেছিলে। ঠাণ্ডা মাথায়, ঠাণ্ডা জলে। তোমার প্রেমিকের প্ররোচনায়। কি শাস্তি তোমার উপযুক্ত?"

জজসাহেব তার রায় থেকে এই পর্যন্ত পড়ে একবার মাথা তুললেন। আসামী ত্রিশ বছরের মেয়ে। তাঁর সহ-আসামী প্রণয়ী পঁচিশ বছরের যুবক। দু'জনের দিকেই জজসাহেব তাকালেন। আদালত লোকে লোকারণ্য।

ফরাসী প্রেম। একেবারে পুরোপুরি ফরাসী ধাঁচে প্রেম আর পাপ। প্রেম আর প্রাণহানি। কিন্তু তার বিচার প্রমাণের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম, সাহিত্য, দর্শন সব কিছুরই আলোচনা চলেছে। বড় বড় জীবিত সাহিত্যিক পর্যন্ত বাদ যাননি। তাদের রচনা, তাদের জীবনবাদের ধারা, তাদের বাঁচা মরার বাসনার নেশা সব কিছুই মামলার আদালতকে জাঁকিয়ে তুলেছিল।

ফরাসী এটর্নি বন্ধু তাই আমায় এই মামলা দেখতে আর শুনতে টেনে এনেছেন। বাংলা দেশের সাহিত্যিক যদি ফরাসী সাহিত্যের একটা দিক একেবারে ভেতর থেকে দেখতে চায় তাহলে রেনোর মত

অনুসারে এই তার সুন্দর মোকা। সাহিত্য ওদের জীবনে আলো-বাতাসের মত সব ঠাঁই জুড়ে আনাগোনা করে। সব আনাচে কানাচে।

আদালতের আঙিনাও বাদ যায়নি।

প্রায় বছরখানেক আগে এই তুই আসামীকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। আদালতে হাজির করবার দিন থেকেই লোকের আর খবরের কাগজের এদিকে পুরো নজর পড়ল। ওদের নাম হল ভূতে-পাওয়া যুগল। কিন্তু ঠাণ্ডা মেজাজে, কালো পোশাকে ছিমছাম চেহারা নিয়ে সুঠাম ভাবে ওরা কাঠগড়ায় বসে ছিল। কে বলবে ওদের ভূতে পাওয়া?

মানুষের চোখ ভুল দেখে, কিন্তু আইনের নজর ভুল করে না। মায়ের জেল হল যাবজ্জীবন আর তার অবৈধ প্রণয়ীর কুড়ি বছর। রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের জমাট মেঘ যেন ভেঙে পড়ল। একসঙ্গে অনেকগুলো বাজ ডেকে উঠল। কোর্ট কামরার বিজলী ফিউজ হয়ে নিভে গেল। ঘোর বর্ষাকালের আকাশ থেকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে হঠাৎ ঘরটা আলো কবে দিতে লাগল। অল্প শিক্ষিত ক্যাথলিক গেঁয়ো লোকরা বুকে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে নিল। বলাবলি করল,—বলিনি, ওরা হচ্ছে ভূতে পাওয়া?

একজন বুড়ি ফরাসিনী আমার দিকে তাকিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যাচাই কবে নিল। জিজ্ঞেস কবল, আপনি নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ার লোক? ভগবান ভূত এসব সম্বন্ধে আপনাদের দেশে খুব পরিষ্কার ধারণা আছে।

হাওয়াটা কোন দিকে বইবে ঠিক বুঝতে না পেরে শুধু একটু হাসলাম।

উনি আবার আউড়ে গেলেন, ভগবান আর ভূত···। এই ভূতে-পাওয়া লাভার্স! আহা, ইণ্ডিয়াতে হলে ওদের বোধ হয় এমন দুর্মতি

হত না। ওঝা বা ভূতের ডাক্তাররা সারিয়ে দিতে পারত। নেহাতই ভূত...

কিন্তু এ ভূত ত' ভৌতিক নয়। সে কথা এই ছোট্ট ফরাসী শহরের গেঁয়ো বুড়িকে বোঝাবে কে? যে সব সাক্ষী প্রমাণ হাজির করা হয়েছিল সেগুলির কথা ভাবতে লাগলাম। ফরাসী বিচারের ধারা ইংরেজীর চেয়ে—একটু অন্য রকম। আমাদের দেশে ইংরেজী কাঠামোতেই বিচার হয়। সেই কাঠামোতেই ব্যাপারটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলাম।

ধরুন, ওদের নাম মারী আর ভিক্তর। আসল নামধামে আমাদের আর দরকার কি?

মারী গরীবের মেয়ে। বছর দশেক পেরোতে না পেরোতেই বাপ-মা মারা গেল। কিন্তু নিজের চেষ্টায় গতর খাটিয়ে সে লেখাপড়া শিখেছিল। অবশ্য ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যেতে পারেনি। সুবিধে হয়নি বলে। কিন্তু একটা সরকারী দপ্তরে কেরানীর কাজ পেয়ে গেল। গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে বলে হল নাম। আর কাজে সুনাম।

ভিক্তর অবৈধ সন্তান। বাপ-মা ভবিষ্যতে সুবিধা হবে মনে করে ভেবে চিন্তে পরে বিয়ে করেছিল। কিন্তু জন্মের ছাপটা সে মুছতে পারেনি। ইউনিভার্সিটিতে সে বি. এ. পাস করে সৈন্য-বিভাগে অফিসার হয়েছিল। নেশা কিন্তু যুদ্ধশাস্ত্রে নয়, সাহিত্যে। একটু দর্শনঘেঁষা সাহিত্যে। ফ্রান্সে আবার সব কিছুকেই ফিলসফির ফোড়ন দিয়ে মুখরোচক করে তোলার রেওয়াজ আছে।

ভিক্তর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে ভিক্ হয়ে গেল। অর্থাৎ নাম থেকে ব্যাঙাচির ল্যাজ ছেঁটে ফেলল। ভিক্‌কে মারী প্রথম পরিচয়ের সময়ই জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কি মেয়েদের সঙ্গে মিশবার সময় সাধু চরিত্রের লোক থাক?

উত্তরে ভিক্ তরোয়ালের ধারাল দিকটা মেলে ধরেছিল। অর্থাৎ

পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, নারীঘটিত ব্যাপারে কোন সন্ন্যাসী পুরুষ দেখেছ কোথাও ?

সাক্ষী প্রমাণে পাওয়া গেল যে সেই প্রথম দর্শনের দিন থেকেই ওদের ভাব হয়ে গিয়েছিল।

মারী, পাঁচ বছর বেশী বয়সের মারী খেয়েছে অনেক ধাক্কা, পেয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা। সে হুঁশিয়ার হয়ে শুধিয়েছিল তরুণকে,—তুমি কি মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট কর ?

বেপরোয়া ভাবে ভিক্ বলেছিল,—মেয়েরাই আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করে।

চোখ বড় বড় করে মারী আবার জিজ্ঞেস করেছিল—সেটা কি রকম ?

চোখ ছোট ছোট করে ভিক্ উত্তর দিয়েছিল,—মেয়েরা হয় আমায় ভালবাসে, না হয় দেখতে পারে না। কিন্তু শেষের দলের দিকে আমি ঘেঁষি না। কিন্তু প্রথম দলেব সঙ্গেও আমি সোনা মানিকের মত খেলি না। আই ডোণ্ট প্লে দি ডার্লিং উইথ দেম।

মারী হতাশ হয়ে পড়ল,—তবে তোমায় আমি কি করে পছন্দ করব ?

ঘষা-মাজা গলায় ভিক্ উত্তব দিয়েছিল—কেন ? এখনো টেঁব পাওনি যে আমি হ্যাণ্ডবিলের বিজ্ঞাপনেব মত আমার আকর্ষণ (চার্মস্) ছড়িয়ে বেড়াই চারদিকে ? আমার চাবদিকে ? এই যে এতক্ষণ তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম তাতে বুঝতে পারনি যে, আমি কেমন নিজের বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেললাম ?

মারীর স্বরে এখনো হতাশা। বলল,—কিন্তু তুমি যে সত্যি মেয়েদের পছন্দ কর তার কোন নমুনা এতক্ষণের মধ্যেও দেখাওনি। অন্তত যে ভাবে ফরাসী বা ইটালিয়ানরা দেখায় সে ভাবে নয়।

ভিক বেশ একটু দার্শনিকের মত পোজ নিয়েছিল। মিলিটারী

ইউনিফর্মের মধ্যে সেটা ঠিক মানায় না। কিন্তু সে যা বলেছিল তার সবটুকুই মানানসই।

সে বলেছিল,—ঠিক বলেছ, আমি হচ্ছি ইংরেজের মত। ইংরেজরা ফরাসীদের মত করে মেয়েদের পছন্দ করে না। মেয়েদের দিকে আগুনরাঙা নজরে তাকাতে পর্যন্ত জানে না। কিন্তু ইংরেজ হচ্ছে ওস্তাদ নাবিক। প্রত্যেক বন্দরে বন্দরে আছে তার বান্ধবী। আমি মেয়েদের শুধোই, কেন তোমরা আমার সঙ্গে সখীর মত মিশতে পার না। পুরুষের নারী হয়ো না, ইংরেজের বান্ধবী হও।

মারীর সওয়াল জবাব থেকে পড়ে কৌঁসুলী দেখালেন যে, সেই ভাগ্য-বেঁধে-দেওয়া দিনটিতে ওরা একসঙ্গে মোটরে বেড়াতে গিয়েছিল। ভিক্ এত কথাবার্তার পরেও কিন্তু নিজে মনে মনে বেসামাল হয়েছিল। রুমাল দিয়ে বার বার মুখ মুছছিল। শেষ পর্যন্ত মারী নিজের সুগন্ধি রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে ভিকের স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে আসে।

সে রাতে বিদায় নেবার সময় ভিকের কথাগুলি কিন্তু ঠিক ইংলিশম্যানের মত হয়নি। সে বলেছিল—মারী, আমি অনেকক্ষণ নিজেকে ধরে রেখেছি, কিন্তু আর পারছি না। যে নিমেষে তোমায় দেখেছিলাম তখন থেকেই তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছি। ঠিক তুমি যেমন হয়েছ…

মারী ব্যাকুল কণ্ঠে সাড়া দিল,— ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

ভিক উত্তর দিল—এই প্রথম চুম্বনটি আমি ভুলে যাব মারী। ঠিক যেমন করে আমি অনেক, অনেক মেয়েকে ভুলে গেছি। কিন্তু বাকী সারা জীবন ধরে এই চুম্বন তোমায় আবেশে ভরে রাখবে।

এমনি করে ওদের প্রেম মুকুলিত হয়েছিল।

কিন্তু চতুর বুদ্ধিবাদী ভিক্ হঠাৎ রুখে দাঁড়াল। ফরাসী আদালতের বিচার-ধারা ইংরেজদের মত বা আমাদের মত নয়। খুনী

মত জজ, কৌঁসুলী এমন কি আসামী প্রত্যেকেই সাক্ষীদের জেরা করতে পারে। এমন কি মোকা মত সাক্ষীরা নিজেদের মধ্যেও পরস্পরকে জেরা করতে ছাড়ে না। বলা বাহুল্য দর্শকরাও কখনো কখনো রেহাই পায় না।

বেচারা আমিও রেহাই পেলাম না।

হঠাৎ ভিক্ রুখে উঠল। সে আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। চেঁচিয়ে উঠল—ওই যে ওখানে একজন ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক দেখছি। ওঁকেই আমি সাক্ষী মানছি। উনি বলুন, পূব দেশেব সব বিজ্ঞ লোকদের জ্ঞান নিয়ে বলুন যে, প্রেম সব কিছুব উপরে ছাপিয়ে ওঠে কিনা।

এটা জানি যে, এমন একটা মুখরোচক মামলা ফবাসী শহরে সব জায়গায় মুখে মুখে আলোচনা হবে। রকবাজ, থুড়ি, কাফেবাজ, খবরের কাগজের লোক, উকিল, জুরী সবাই এমন রসিয়ে ফলিয়ে মন্তব্য ঝাড়বে যে আমাদের দেশে হলে কনটেম্পট অফ দি কোর্ট অর্থাৎ আদালতের অপমান হচ্ছে বলে তাদের বিরুদ্ধেও মামলা ঠোকা যেত।

কিন্তু তা বলে আমি সে ঝক্কির মধ্যে নেই। মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম।

কিন্তু কোর্টসুদ্ধ সবাই আমার দিকে তাকাতে লাগল। তাদের নয়নবাণে আমিই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

প্রসেকিউটার তা বলে ছাড়বেন কেন? আজ তাঁর জেরা আর বক্তৃতা জবর জমে উঠেছে। পশারের সোনার কাঠি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। ছাড়বেন কেন তিনি?

তাই তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে আবার শুরু করলেন,—মঁসিয়ে প্রেসিডেণ্ট, এই যে প্রেমের ব্যাপার দেখছেন, এই প্রেম হচ্ছে টেনিস খেলা। লন টেনিস।

তাক লেগে গেল এ হেন যুক্তি শুনে। প্রথমে ভাবলাম যে বোধ হয় অনেক লোক লম্বা কিউ দিয়ে সকাল থেকে আদালতের সামনে টেনিস খেলা দেখার মত ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল বলে এ হেন তুলনা করছেন উকিল মশায়। উম্বলডনে টেনিস খেলা দেখতে গিয়ে শেষ রাত থেকে স্যাণ্ডুইচের প্যাকেট হাতে করে ভীড়ে লাইন দিতাম বিশ-বাইশ বছর আগে। এখন সে কথা মনে পড়ল।

কিন্তু অত নিরেমিশ ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে যাকে বলে উপমা কালিদাসস্য। উপমা আর রূপক ঝাড়বার বেলা ফরাসী ব্যারিস্টার কালিদাসের চেয়ে কম কিসে ?

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ওয়েস্ট কোটের আর বগলের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলেন কৌঁসুলী। ডান হাতের লাল পেন্সিলটা উঁচিয়ে তুললেন মাথার পেছনে। যেন এখনি ঝাড়বেন একখানা ক্যানন বল সার্ভিস।

ঝাড়লেনও তাই।

কোর্টসুদ্ধ সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে তিনি হাঁকলেন—ভেবে দেখুন আপনারা, বোরেট্রা বা কোশের টেনিস খেলা। তাদের তুলনাহীন টেনিসের চেয়ে এই হৃদয় নিয়ে বল চালাচালি কিছুমাত্র কম যায় না। টেনিসের সূক্ষ্মতর মারগুলির চেয়ে পঞ্চশরের তীরের আনাগোনা এদের জীবনে কিছুমাত্র কম জটিল নয়। এই খেলার সূক্ষ্ম থাঁচগুলোর সন্ধান সবই পাওয়া যাবে এই দুই খুনী আসামীর চিঠিগুলোতে।

মনে পড়ল যে যদিও কোর্টের বহুজনের নজর এই অভাজনের উপর পড়েছে, আসলে আমি এসেছি রেনোর সঙ্গে। তার সঙ্গেও একটু কথাবার্তা চালানো উচিত। ফিস ফিস করে বললাম—জানেন বোধ হয় যে, আমেরিকানরা ঠাট্টা করে বলে যে 'আমুর' অর্থাৎ প্রেম হচ্ছে ফরাসীদের ন্যাশন্যাল স্পোর্ট ! জাতীয় খেলা।

রেনো নিজেই স্পোর্ট। অর্থাৎ খেলোয়াড়ের উপযুক্ত মন আছে তার। এহেন একটা কথাতে মোটেই রাগ করলেন না। বরং জবাব দিলেন—নিয্যস ঠিক কথা। তবে আমরা নিজেরা খেলি না। গোটা দুনিয়াটাকেই খেলিয়ে ছাড়ি। দেখেন নি ফলি বারজেয়ারে? সেখানে মজতে যায় কারা?

প্রতিবাদ করলাম—বাঃ, আপনাদের গল্প-উপন্যাস পড়েই ত সবাই প্রেমের বিদ্যেতে হাত পাকায়। এত মনস্তত্ত্বের কাববার আর কোথায় পাবে লোকে? এই শুনুন আপনাদের প্রসেকিউটার কি বলছে।

পাবলিক প্রসেকিউটার ততক্ষণে জোরাল গলায় স্যাডিজ্‌ম্ কথাটা ব্যাখ্যা করছেন। স্যাড নামে একজন মারকুইস দেখিয়েছেন যে লোকে মনের আবেগে নিজেদের নানারকম শারীরিক যন্ত্রণা দিতে পারে। দিয়ে সে বেদনাকে বিলাস বলে মনে করে। তাতে আনন্দ পায়। কামনাকেও সেই বেদনার কোঠায় নিয়ে যায়। মারীকে মাতাল করে তুলেছে স্যাডিজ্‌মের নেশা। সেই মাতলামির ছবি ফুটে উঠেছে আজকের একজিস্টেনশিয়ালিজ্‌মে।

রেনো আমার কোটের হাতা ধরে একটু হাল্কা টান মারলেন। অর্থাৎ—দেখুন, কেমন ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছি। ফরাসী মনীষার নবতম অবদান সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছিলেন একেবারে তাই।

জজসাহেব ইতিমধ্যে মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। হেঁকে উঠলেন—লার্নেড কাউন্সেল, আমরা অর্থাৎ আমি প্রেসিডেণ্ট অব দি য়্যাসাইজ এবং এই পাঁচজন জুরী আর দু'জন য়্যাসেসার—আমাদের সময়ের দাম আছে। আমরা দর্শনতত্ত্ব শুনতে চাই না।

ফরাসীর মনে সব সময়ই দুধ জ্বাল দেওয়া চলতে থাকে। একেবারে উথলিয়ে উঠলেন কৌসুলী। টগবগ করতে করতে বললেন—কিন্তু ধর্মাবতার, আমি বলতে চাই যে এই দুই আসামীর প্রেম যত বেপরোয়া যত নিবিড় বলে প্রমাণ হবে, এদের পাপের দায়িত্বও তত গভীর বলে

কোর্ট মেনে নেবেন। সে জন্যই এত কথা পাড়তে বাধ্য হচ্ছি। এরা ফরাসী ইনটেলেকচ্যুয়ালিজ্‌ম্‌কে পাঁচনের মত গিলে গিলে সাবাড় করেছে। নেশা করেছে।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে সেই নেশায় মাতাল হয়ে যদি কেউ খুন করে তাহলে সে বেকসুর খালাস পেতে পারে ?

যেন আকাশ ভেঙে পড়ল কৌঁসুলীর মাথায়। য়্যাঁ, শেষ পর্যন্ত এত গুছিয়ে রসিয়ে প্রেমঘটিত ব্যাপারটা দাঁড় করিয়েছিলাম, আর শেষ পর্যন্ত কিনা জজসাহেব নিজেই আসামীর হয়ে ওকালতী করছেন ?

পিনালকোডখানা নিয়ে এককালে এ অভাজনকেও কিছু নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল। সে একখানা গোটা দুঃস্বপ্ন। এজলাসে বসে যে ফাঁসায় আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে ফেঁসে যায় দু'জনেরই কাছে। মনে মনে একবার দণ্ডবিধির ধারাগুলো ঝালাবার চেষ্টা করলাম।

এর মধ্যে কৌঁসুলী আবার প্রমাণ ঝাড়তে শুরু করেছেন। ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি।

একটাতে ভিক্ লিখেছে—"আমার ভালবাসাকে তুমি শুধু দেহের কামনা মনে করো না। এর মধ্যে আছে একটা বিরাট নতুন ফিলসফি। মা শেরী (প্রিয়া আমার), আজ সমস্ত ফরাসী যৌবনের প্রতীক হয়ে বলছি তোমায়, জানাচ্ছি তোমায় যে তোমার জন্য আমি একটা গানের সুর অনুভব করছি। আগের কালে দেহের সঙ্গীত বলত তাকে। কিন্তু আমি তাকে বলব দেহের জন্য দেহের অশ্রুমাখা, কাঁপনভরা আকর্ষণ।

রেনো আমায় এখানে একটা মোক্ষম কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন—আপনাদের ওই আমেরিকাতে…।

বাধা দিলাম—আমাদের আমেরিকা ? কবে থেকে আমাদের হয়ে গেল ?

রেনো কিন্তু শুনবার পাত্র নন। মোকা পেয়েছেন, ছাড়বেন কেন ?

বললেন—ওই যারই হোক গে। মোদ্দা কথা, আমেরিকাতে আজকাল লোকে মেয়েদের কমলা লেবু, বাতাবী লেবু এ সবের সঙ্গে তুলনা করে। আর দেখুন আমরা কি রকম জাতশিল্পীর চোখ দিয়ে অনুভব করি। আমাদের দেশে যৌবনের আবেদন মানুষকে পশু করে না। করে শিল্পী।

শিল্পীই বটে। মনে মনে হাসলাম। সাক্ষী প্রমাণে বেরিয়েছে যে, মারী আরো অনেকের সঙ্গে প্রেম করে বেড়িয়েছিল। তার ফলে একটা সন্তানও হয়েছিল। এই খুনের বেচারী সেই শিশু। তাকে পিতা করেনি স্বীকার। মাতা করেনি রক্ষা। এদিকে ভিক্ অন্য কোথাও দুটি সন্তানের জন্য দায়ী হয়ে আছে। অবশ্য জারজ সন্তান। কিন্তু তাতে তাব শিল্পীর স্টাইল আড়ষ্ট হয় নি।

সে মারীকে লিখেছিল—ইংরেজ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডের মত আমিও মনে করি যে, যে নারীর অতীত আছে আর যে পুরুষের আছে ভবিষ্যৎ তাবাই সব চেয়ে চমৎকার যুগল হতে পারে।

সে লিখেছিল—ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের ধরনে আমি তোমায় আমার উন্মাদনা উৎসর্গ করছি।

আসামীর চিঠি কোর্টে পড়ে শোনান হল—ভয় আর পাপ, অনিশ্চয়তা আর মৃত্যু আমাব সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। কোথায়?—না, আমার চারিদিকের শূন্যতার মধ্যে। আমি যে আঁধারে এগিয়ে চলেছি তার মধ্যে। কিন্তু আমার দর্শনতত্ত্বের সত্য প্রমাণ করতে হবে কাজ দিয়ে। শুধু কথা দিয়ে নয়। আমি যদি বিয়ারের লম্বা ট্যাংকার্ডে (গেলাসে) মুখ ডুবিয়ে ভাবি যে আমি মরতে চাই, তাহলে আমায় সত্যি সত্যি খেতে হবে বিষ। বিয়ার নয়। তাতেই ত প্রমাণ হবে আমি আমার নিজের প্রতি খাঁটি কি না। সেই বিষই তাহলে হবে অমৃত। ওগো প্রেয়সী আমার, তুমি ত বলবে তুমি আমায় ভালবাস; খুব ভালবাস। বেশ ভাল কথা।

কিন্তু তার প্রমাণ কই? আমার প্রেমের যোগ্য হতে হলে তোমায় যাতনা থেকে নব যাতনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

কৌঁসুলী চারদিকে তাকিয়ে বুঝে নিলেন যে মামলা বেশ জমে উঠেছে।

তিনি হাকিমকে উদ্দেশ করে বললেন—মি লর্ড, আসামী ভিক্ এইখানে ইটালিয়ান কবি ঔপন্যাসিক দান্নুনৎসিয়োর লেখা থেকে একটা বাণী তার চিঠিতে তুলে দিয়েছে। তাতে ছিল একজন হিংসুটে স্বামীর কীর্তি। তার স্ত্রী অন্যের একটি অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। সেই সন্তানকে স্বামী খুন করে খুশীতে গড়াগড়ি দিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল—বলত, এটা বেশ সুন্দর হল না?

মি লর্ড, এই পর্যন্ত মারী দানবী হয়ে ওঠেনি। মানবী হয়েই ছিল। সে প্রতিবাদ করে জানাল যে এ কাজে তার কোন অধিকার নেই। উত্তরে খুনীর চেয়ে বেশী সাংঘাতিক এই যুবক লিখল—সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। যাতে তোমার অধিকার নেই, আছে ভয়—আছে বিপদ—সেইটেই হাসিল করতে হবে। সেই কষ্টিপাথরে যাচাই হবে তোমার প্রেম।

মি লর্ড, ভিক্ লিখেছিল,—সংসারে শুধু দু'রকম নারী আছে। সাদামাঠা আর রঙচঙে। প্রথম দলের নজর বড় ছোট, বাধা আর বাঁধনে ভরা। যারা রঙচঙে তারাই তৈরি করে স্বপ্ন, এনে দেয় অসামান্যের আশ্বাস। দুঃসাহসী প্রেমের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নাও।

বলিহারী পুলিসকে। দেশে কখনো পুলিসকে এমন তন্ন তন্ন করে প্রমাণ বের করতে আর তৈরি করতে দেখিনি। তবে প্রেমের মামলা। সেই টানেই হয়ত এমন অসাধ্য সাধন করেছে। ফরাসী ত বটে। তা পুলিসই হোক আর প্রেমিকই হোক।

মারীর ঘরে একটা বই পাওয়া গিয়েছিল। হালের নভেল।

তাতে একটা পাতায় মারী মোটা করে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছিল। কৌঁসুলী আদালতে তা পড়ে শোনালেন, "আমার প্রণয়ীর গায়ে, গায়ের চামড়াতে এমন ভাবে নিজের নামের প্রথম অক্ষর আঁচড়িয়ে দেব যে কোনদিন সে ক্ষত শুকোবে না।"

আদালতভর্তি মেয়েরা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভিক্‌ও কম যায় না। সে আর একটা জায়গা চৌকো করে 'বক্স' করেছে। সেখানে লেখা আছে, "রূপ আর নিষ্ঠুরতা, বাসনা আর বেদনা সবই সমান ভাবে রমণীয়, মধুর"। বিবেচনা করে দেখুন, মি লর্ড, এই সব ভাবধারার সঙ্গে ওদের অপরাধ কেমন ভাবে খাপ খেয়ে গেছে। তাহলেই ওদের পক্ষে এই অপরাধ করা যে অস্বাভাবিক হয় নি তা প্রমাণ হয়ে যাবে।

কাজেই এই আসামী মায়ের পক্ষে ওই ছোট্ট সুন্দর নিরীহ আড়াই বছরের শিশুকে জানলা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সে খুনের চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টার প্রমাণ আমি দিয়েছি পাশের ফ্লাটের প্রতিবেশীর সাক্ষীতে। সেই সাক্ষী তখন জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে নীচে দুধের বোতল দিয়ে গেছে কিনা তা দেখছিল। সে দেখল দুধের বাছাকে তার মা জানলার কার্নিসের উপর দিয়ে প্রায় ফেলে দিচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে মারী চট করে বাচ্চাকে ভিতরে টেনে আনল। নিষ্পাপ শিশু মায়ের এই খেয়ালী খেলাতে হেসে কুটি কুটি হয়ে যাচ্ছিল। ভেবে দেখুন, মি লর্ড, সেই নারকীয় ছবিটা। উপরে সাদা ফেনার মত হাসি উপচে উঠছে। তার নীচে পাপের গভীর সাগরের ঢেউ। সাক্ষী এই ঘটনাটার বর্ণনা দিতে দিতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে, সে তখন কি পাপ কাজ করবার চেষ্টা হচ্ছিল তা বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলে হয়ত নিবারণ করতে পারত।

কিন্তু এই নারকীয় প্রণয়ী তাতে আরো ক্ষেপে গেল। মারী তখন

বাচ্চাকে খালের জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস একজন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে বাচ্চাকে টেনে তোলে। সে ঠিকই সন্দেহ করেছিল যে অবাঞ্ছিত সন্তানকে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চোখের জলের মিথ্যা দিয়ে মারী তাকে শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝিয়েছিল।

খুনের নেশা আসামী ভিক্‌কে এমন ভাবে পেয়ে বসেছিল যে, সে মারীকে নোটিশ দিল যে তাকে ছেড়ে যাবে। যে জীবনে সামান্য একটা ত্যাগ করতে পারছে না, এটুকু সাহস পাচ্ছে না, সে ভিকের অসামান্য প্রেমের যোগ্য নয়।

মারীর জীবনে অবশ্য প্রণয়ী পাওয়া এবং হারানো কোনোটাই নতুন নয়। ভিকেরও নয়। কিন্তু আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে, যখন অপরাধ কোন ধর্ম দর্শন বা সাহিত্যের রাংতায় মুড়ে পানের খিলির মত সাজিয়ে নেওয়া হয় তখন তা হয়ে ওঠে সর্বনাশা। সেই সর্বনাশা নেশা করেছিল এই অপরাধীরা। ওদের ভূতে-পাওয়া যুগল বলে মনে করলে প্রকৃত বিচার হবে না। যথাযোগ্য শাস্তিও দেওয়া হবে না। সব তত্ত্বকথায় যা হয় নি, এই মাটির সংসারের একটা ময়লা ভয় অর্থাৎ তোমায় ছেড়ে যাব এই হুমকীতে তা সম্ভব হল। শেষ পর্যন্ত মারী স্নানের ঘরে টবে নিজের শিশুর মাথাটা জলে ডুবিয়ে জোর করে ধরে রেখে তাকে খুন করল। ভেবে দেখুন, মি লর্ড, তার পরও তার স্নায়ু এত শক্ত ছিল যে, সে হেঁটে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে তার করে ভিককে সাফল্যের কথা জানায়। সে তার আমরা কোর্টে দাখিল করেছি। টেলিগ্রাম পেয়ে ভিক তার বন্ধুর কাছে মারীর সৎসাহসের উৎসাহভরা প্রশংসা করেছিল। তার সাক্ষীও দিয়েছি। আসামী আনন্দে টগবগ করতে করতে তার বন্ধুকে জানিয়েছিল— নিজের মেয়েকে মেরে ফেলতে সাহসের দরকার। যে বীর নারী সেই দুর্লভ সাহস দেখিয়েছে সে-ই আমার প্রেমের উপযুক্ত।

কিন্তু, মি লর্ড, এই সংসার, আমাদের এই সমাজ এই রকম প্রেম

আর মতবাদের যোগ্য নয়। কাজেই মৃত্যুদণ্ডই হচ্ছে একমাত্র শাস্তি। বিশ শতকের মানুষের মনে সংবেদনা জাগে সহজেই। সাহিত্যিকরাও দৃষ্টিভঙ্গির সহানুভূতির নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছেন। সেই সহানুভূতির মূলে আছে ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া নালিশ—এ সবই মানছি। সবই সত্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে জীবন, বেঁচে থাকা। আসামীদের সেই অপরাধ বেঁচে থাকার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সাহিত্যস্রষ্টার সহানুভূতির ব্যভিচার করেছে। অতএব…।

জজসাহেবের রায় দেওয়া শেষ হল। কিন্তু আসামীরা কি তাতে ভয় পেল? ফেলল চোখের জল? নিল মুখ ফিরিয়ে?

ভিকের মুখে এখনো একটা বেশ "সুপিরিয়র" অর্থাৎ উঁচুদরের হাসি খেলা করছিল। ছিল একটা নির্বিকার প্রশান্তি। মাথা তুলে সে বলল—কোন কোন পাপও পবিত্র। কারণ অনেক সময় পাপী আর পুণ্যবানের মধ্যে সেই একই গুণগুলি দেখা যায়।

একটু পরে ভিক আবার বলল,—এটা অবশ্য আমার নিজেরই একটা মতবাদ। তার জন্য প্রেরণা খুঁজে পেয়েছি সাহিত্যিকদের হরেক রকমের লেখা থেকে।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু ওদের অপরাধই যে নজরে পড়ল তা নয়। ভাবলাম—বিশ শতকের এই অশান্ত আত্মাকে শান্ত পরিণতি দেবে কে? প্রেম—প্রাণকে ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় যে প্রেম তাকে সুন্দরের বাঁধনে বাঁধব কি দিয়ে?

আধুনিকার রূপ

মডার্ন মিসের রূপের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের লাইন দুটি :

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী"

আমাদের এই পোড়া সংসারে মডার্ন মিসের সম্বন্ধে একেবারে হুবহু খেটে যায়।

বিশ্বাস না হয় আমার এই জানলায় এসে দাঁড়ান। নীচে পাথরে-বাঁধানো চত্বরের ওপাশে গ্রাণ্ডে ইটালিয়া কাফের ছড়ানো টেবিল-গুলোর উপর নজর রাখুন। জিনা লোলোব্রিজিডা আর সোফিয়া লোরেন অবশ্য ওখানে বসে আছেন কি না জানি না। কিন্তু রোমের আধুনিকারা রাতের মেলাটা আলো করে বসে আছেন।

ঘরটা আমার বন্ধু মার্টিনোর। কিন্তু জানলাটা আমার দখলে। অথচ আলোচনার বিষয়টা ওর এলাকায় পড়ে। মার্টিনো মডার্ন মিসদের সম্বন্ধে রিসার্চ করছেন। সোশিয়লজি সম্বন্ধে থিসিস লিখছেন। হাতে অবশ্য এখন কলম নেই। আছে কিয়াস্তি।

এই চমৎকার ইটালিয়ান মদের গেলাসটা নাচাতে নাচাতে উনি বলে উঠলেন যে, আধুনিকাকে তার বয়স দিয়ে মাপা যায় না।

স্বীকার করলাম—নিয্যস ঠিক কথা। বয়সটা সামান্য কথা। আসল হচ্ছে তার প্রকাশ। তার তাজা রঙ।

আরো কিয়াস্তি ঢালতে ঢালতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ রকম প্রকাশ আপনি বলতে চাচ্ছেন? কোন্ রঙটা আপনার চোখে তাজা?

কিয়ান্তির সুন্দর সবুজ রঙের মধ্যে আছে চিরনূতনের আভাস। তারি আভায় কাঁচের গ্লাসটা টলমল করছে। সে দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম—এই কিয়ান্তির মত চিরনূতনের রঙ। কিশোরীর মধ্যে আছে হরিণীর বেপরোয়া লাফ ঝাঁপ, হস্তিনীর গজগমন নয়। বনহরিণী যখন গজগামিনী হয় তখনি শুরু হয় সাজগোজ, হরেক রকম রঙ আর ঢঙ।

এ যেন একেবারে উপমা কালিদাসস্য নয়, দেবেশ দাশস্য। মার্টিনো খাস ভারতীয় ভঙ্গির তুলনা শুনে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

আশ্চর্য হয়ে একটু পরে বললেন : কিন্তু এ যে ইণ্ডিয়ার প্রাচীন কবিদের ট্র্যাডিশনের উল্টো কথা হয়ে গেল। আমি অবশ্য আপনার কথাতেই সায় দিই। আধুনিকার মেক-আপ হচ্ছে তার টলটলে গায়ের রঙে। আপেলের মুকুলের উপর রঙেব ছোপ লাগাবার ত দরকার নেই। অথবা প্যারিসের ফ্যাশনদুরস্ত গাউন আর রাত্রিবাস।

রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি তাই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম—ইয়োরোপের আধুনিকাদের কি কি টাইপ চরিত্র আপনি 'স্টাডি' করেছেন তাই আমায় বলুন।

মার্টিনো শুরু করলেন—সবার আগে বলি শিক্ষিতা আধুনিকার কথা। আগেকার দিনের নাক-উঁচু আর গাউনের ঝুল-নীচু মেয়ে আজ আর পাবেন না। এখনকার পড়ুয়া মেয়ে শুধু মাস্টারনী বা রিসার্চ ওয়ার্কার হবে না। সে পাল্লা দিচ্ছে সবার সঙ্গে, সব ক্ষেত্রে। পলিটিক্সও বাদ যায় না। আবার পলিটিক্স আর প্রেম দুটো ঘোড়াতেই সে এক সঙ্গে সওয়ার হয়ে চলেছে। পরনে জাম্পার আর হাঁটুর পাশ দিয়ে কাটা খাটো স্কার্ট। চরণে মোজা নেই; আছে খুরের মত খটখটে আওয়াজের জুতো। এলোমেলো চুল আর ঝলমলে মুখ নিয়ে পড়ছে যত বামগন্ধী ম্যাগাজিন। ভাবছে কেমন করে কলেজ

ইউনিয়নে লীডার বনা যায়। অন্ততপক্ষে ইউনিয়নের মিটিংগুলো ভণ্ডুল করবার মত ক্ষমতা তার আছে। এহেন দক্ষযজ্ঞ সৃষ্টি করার মধ্যে সে পায় বেমক্কা মজা। নিজের উপর বিশ্বাস যত কম, ভক্তদের উপর ভরসা তত বেশি।

—কিন্তু সেই ভক্ত জোটাবারই ইচ্ছা বা দরকার যদি হবে তাহলে পড়তে আসে কেন?

—বাঃ! আজকের আধুনিকা যে চৌকস মেয়ে। তার চোখে ভিনাস আর মিনার্ভায় কোন ঝগড়া নেই। পড়ুয়া মেয়ের চোখ আর শুধু পুঁথিতে আটকিয়ে থাকে না। পুঁথি থেকে পলিটিক্স, তা থেকে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া—এসব ত সহজ ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। হাতে হাত দিয়ে চলতে চলতে মুখে……

—থাক, থাক, স্বীকার করছি। এবার বলুন আধুনিকার অন্য রূপ-গুলির কথা।

বেশ রসালো হয়ে উঠত নিশ্চয়ই মার্টিনোর মুখে এই মুখে মুখ দিয়ে ইত্যাদির বর্ণনাটা। কিন্তু তাতে আধুনিকার খেই যেত হারিয়ে, সময়ও যেত ফুরিয়ে।

ভাগ্যিস মার্টিনো এই বাধা পেয়ে দমে গেলেন না। আবার শুরু করলেন—অন্য রূপ? রূপ হচ্ছে অনন্ত। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি। এই ধরুন আজকের দিনের সব কিশোরীই শিল্পী হতে চায়। আর্টের স্বপ্ন সবারই চোখে। এমন কি যে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম হবে সে-ও ছবি আঁকবে, না হয় গল্প লিখবে, নিদেন পক্ষে কোন আর্টিস্টের স্বপ্ন সেজে থাকতে চাইবে।

প্রশ্ন করলাম—কিন্তু স্বপ্ন সাজবার মত রূপ তার না থাকতে পারে। তাহলে?

পাল্টা প্রশ্ন করলেন মার্টিনো—কে মনে করে যে তার রূপ নেই? আমি কি মনে করি যে, যে কোন ফিল্মস্টারের মন মজাবার মত

রূপ আমার নেই? আর ধরুন, রূপ যদি না-ই-বা রইল, যৌবন ত আছে, সাধ ত আছে।

—অবশ্য, অবশ্য। তা ছাড়া রূপ হচ্ছে প্রণয়ীর উপহার।

—ছোঃ, আপনি কিচ্ছু জানেন না। যে কোন আধুনিকার মনের খবর নিয়ে দেখুন। সে বলবে রূপ হচ্ছে তার নিজের মনের বাসনা। তারি ইশারায় প্রেমিক দেয় সাড়া। বোধ হয় তারি জন্য মেয়েরা এত আর্টের পেছনে ঘোরে, আর্টিস্টের সঙ্গে ভাব করে। এমন কি বিনি পয়সায় মডেল পর্যন্ত সাজতে রাজী হয়। দিব্যি চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছি লণ্ডনের শিল্পী-পাড়া 'চেলসী'র সেই স্টুডিয়োটা। আমার দেশের মারিয়া সেখানে নীল রঙের 'জিন' খাটো আঁটসাঁট পাণ্টালুন পরে তার ত্রিভঙ্গ ধাঁচের পকেটে বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরো হাতা জাম্পারের ছুটো আস্তিন গুটোনো। কলেজের ছুটির দিনগুলো কাটায় সেই স্টুডিয়োতে। বোধহয় ভাবছে একদিন সে-ও মোনা লিসা হয়ে অমর হয়ে থাকবে।

—আর যে অত কিছু স্বপ্ন দেখে না সে কি করে?

—সে অন্তত ছুটির সময় সমুদ্রপারে ছুটি কাটাতে যায়। আর কিছু না করুক, এমন কি সমুদ্রের মধ্যে ভাসান প্রমোদ-কাননে গিয়ে না নাচুক, সে-ও সমুদ্রের ডাকে সাড়া দেবে।

—তার মানে অজানার হাতছানি?

—অতখানি ব্যাকুলতার দরকার নেই। ইটালিয়ানে আমরা বলি 'ডোলসি ফার নিয়েন্তে' অর্থাৎ কিছুই না করার মাধুর্য। শুধু তাতেই মশগুল হয়ে সোনালী বালুর চরে পড়ে আছে আধুনিকা। ছুধবরণ কন্যা হয়ে উঠেছে দিনে দিনে সোনার বরণ, তার পর সিঁছুরে, তারপর লালচে…

—তার পর পোড়া ইঁট।

—না, তার আগেই তার ছুটি যাবে ফুরিয়ে, হাতের টাকা যাবে

উড়ে। মুখে তত দিনে পড়েছে ফুটকি ফুটকি দাগ আর কান থেকে চোখ পর্যন্ত মুখের দু'পাশে রোদের চশমার ডাঁটির দাগ। সেই চশমা দিয়ে সে ঢেকেছে নিজের দৃষ্টি, কিন্তু টেনেছে অপরের নজর নিজের উপরে। আধুনিকারা জানে যে মুখের অনেক খুঁত ঢাকে কালো চশমা। এনে দেয় অনেকটা অদেখার মাধুরী।

—শুধু অদেখাই বা কেন? চোখের দেখাশোনা আর মনের জানাজানির জন্য সাগরপার খুব চমৎকার জায়গা বলেই ত জানি।

হাসলেন মার্টিনো। আরেক গ্লাস কিয়াস্তি ঢালতে ঢালতে আমার কফির পেয়ালার দিকে নজর দিলেন। তারপর বললেন,—সেই কথাতেই আমি আসতে যাচ্ছিলাম। ওই সাগরপারেই দেখেছি কত কিশোরীকে। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উচ্ছল পটভূমিকাতে। মুখ তার সমুদ্রের দিকে নয়; মাটির দিকে, পৃথিবীর দিকে। হু হু করে বইছে বাতাস। তার পরনের রেনকোটের কলারটা দুলিয়ে যাচ্ছে; এলিয়ে যাচ্ছে তার চুলের রাশি। দুটি রাঙা ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে ঝিকমিক করছে একটুখানি হাসি। হয়ত সে ভাবছে যে পৃথিবীটা উজ্জ্বল আলোতে রঙে ঝলমল হয়ে উঠেছে। তার চার পাশের খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিসগুলো পর্যন্ত চমক দিয়ে ঘেরা। হয়ত শুধু দুটি দিন, শুধু দুটি দিন স্মরণের মণিকোঠায় তোলা থাকবে। তার "ডিয়ার ডায়েরী" প্রিয় দিনপঞ্জীর বুকে সে দুটি দিনে শুধু এঁকে দেবে লাল ক্রশ।

—তারপর সে ক্রশ ঘিরে বৃত্ত রচনা হবে কি? গড়ে উঠবে কি ঘর?

মাথা নেড়ে মার্টিনো বললেন—না, আধুনিকারা সহজে ঘর গড়ার স্বপ্ন দেখে না। আর তাতে তাদের লোকসানই হত। নীড় বাঁধবার আগে খেলতে হবে অনেক লতাপাতার মধ্যে; সাজাতে হবে অনেক ফুল, অনেক খড়কুটো। দেখেননি আপনি পাখীদের আকাশে ওড়া?

ওদের নীড় রচনা? ওরা যদি সকাল থেকেই শুরু করত কুলায় ফিরে যেতে, হতেন কি আপনি খুশী? ভরে উঠত কি ওদের জীবন পূর্ণতায়, বৈচিত্র্যে।

আমিও মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ সায় দিলাম।

উৎসাহ পেয়ে মার্টিনো আরেক রকম আধুনিকার বর্ণনা শুরু করলেন—হ্যাঁ, তবে কেউ কেউ একটু আগেভাগেই স্বাধীন জীবনে ইতি দিতে চায় বৈকি। অনেকে নিজের দায়িত্ব নিজে বইতে গিয়ে সহজে হয়রান হয়ে পড়ে। কারো কারো ধাত এত যুগের পুরানো নির্ভরশীলতা থেকে ছাড়া পায় নি। কিন্তু সমান বা কাছাকাছি বয়সী পুরুষের উপর বিয়ের জন্য সহজে ভরসা করা যায় না। তাই তারা ভাব করে একটু বেশী বয়সীর সঙ্গে। লোকে ভাবে তারা হচ্ছে 'ভ্যাম্প'। পুরুষের মন ভুলিয়ে মজা মারা হচ্ছে তাদের কাছে ব্যবসার মত।

—না, না, বলুন মোহিনী। মেয়েদের 'ভ্যাম্প' বললে আমার মনে একটু ব্যথা লাগে।

বড় যেন নটবর ভঙ্গিতে হাসতে শুরু করলেন মার্টিনো। ওর চোখ ভরা দুষ্টুমিতে আর হাসি ভরা নষ্টামিতে।

বললেন—সি সিনিয়র, প্রন্তো প্রন্তো···হ্যাঁ মশায, বড় তড়ি ঘড়ি আপনি সহানুভূতিতে গলে যান আধুনিকাদের বেলা। বুঝেছি, ঠিক বুঝেছি, ঠিক বুঝেছি।

বলেই এক চুমুক কিয়াস্তি সাবাড় করে দুই ঠোঁট দিয়ে একটা চুমুর মত আওয়াজ করলেন। তারপর বললেন,—তবে শুনুন এই আধুনিকার কাহিনী। উনিশ বছরের এক জার্মান ফ্রলাইন (কুমারী)। মুখে এখনো দুধের গন্ধ বলা যায়। কিন্তু নাকে তার ঘরপোড়া বারুদের গন্ধ, কানে বাতাস-চেরা বোমার চিৎকার। সে গেল তার মাঝ-বয়সী প্রেমিকের সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে। অনেক সময় পার হয়ে গেল, অনেক

মনে মনে হিসাব-করা লগ্ন। পাশের খানাটেবিলে মুখ গুঁজে বসে মেয়েটি সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে চলেছে। টেবিলের ছাই-দানি ভরে যাচ্ছে ভস্ম হয়ে যাওয়া সিগারেটে। তা থেকে উড়ে যাচ্ছে ভস্ম-হয়ে-যাওয়া সিগারেটে। তা থেকে উড়ে যাচ্ছে পোড়া আশার ধোঁয়া। ওপাশে সোফায় বসে আছে প্রেমিক। উপরে কাঁচভাঙা দেওয়াল ঘড়িটা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে টিক টিক টিক। মাঝরাত গড়িয়ে গেল। যতগুলো রেকর্ড ছিল সব বাজানো শেষ। অনেক পরে অনেক ইতস্তত করে প্রেমিক তাকে কাছে এসে ডাকল—মাই ডিয়ার!

মেয়েটি উন্মুখ হয়ে উপরের দিকে চোখ মেলে তাকাল।

দু'জনের মাঝখানে রাশি রাশি ছাই। তা থেকে এখনো উঠছে ধোঁয়া, দেখা যাচ্ছে নিভন্ত আগুনের ফিনকি।

—মাই ডিয়ার, তোমায় দেখে আমার যৌবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আজ।

মেয়েটির মুখে ওই ছাইয়ের রঙ। মনের আগুনকে ওই ছাইয়ের জমাট স্তূপ ঢেকে দিচ্ছে। সে কোন রকমে বলল,—ওহ্, নোহ্; তুমি ত সত্যি সত্যি তেমন বয়স্ক নয়।...আর তাই যদি বল...আমি ছেলেছোকরাদের সইতে পারি না!...

আরো খানিক সময় চুপ করে থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় মেয়েটি বলল,—আর বিশ্বাস কর, ভাল চেহারার ছোকরারা আমায় 'বোর' করে তোলে; চোখে জল এনে দেয়।...

মার্টিনো খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও।

তার পর বললেন,—আচ্ছা, এই আধুনিকাটির কথা ভেবে দেখুন। এই হচ্ছে আজকের ইয়োরোপের একজন টিপিক্যাল মডার্ন মিস। না মিলল বর, না জুটল ঘর। না ঘটল জীবনে স্থায়ী একজন প্রিয়তমের আবির্ভাব।

শূন্য পেয়ালায় মিছেমিছি চামচ নাড়তে লাগলাম। আর কি-ই বা করতে পারি?

খানিক পরে আমিই কথা তুললাম—কিন্তু ইয়োরোপে প্রেমের কিশোর স্বপ্নের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে প্রজাপতি অফিস।

মার্টিনো স্বীকার করলেন,—সেটাও এই হতাশারই ফল। বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মেয়েরা ম্যারেজ ব্যুরোতে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে দরখাস্তের ছাপানো ফর্ম ভরে দেয়। পাকা চাকরি আর পোক্ত সংসার বাঁধবার ইচ্ছে আছে এমন যুবকদের খবর চায়। বছর ত্রিশের ছেলেরা এসে বলে,—স্যাব্রিনার মত তন্বুলতা আছে আর টেকসই স্বামীর সঙ্গে বাকী জীবনটা লতার মত জড়িয়ে কাটিয়ে দিতে চায় এমন তরুণীর সন্ধান দাও।

আজ ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা এত বেড়ে গেছে। নিজেদের খাই-খরচা নিজেরা চালায়, মেলামেশা করে, ক্লাবে যায়, নাচে, টেনিস খেলে। নিজের ব্যক্তিত্ব, লাবণ্য আর আকর্ষণ নিয়ে অহরহ দেয় অন্য পাঁচজনের সঙ্গে পাল্লা। তবু বিয়ের পাত্র পাত্রী পায় না। যুদ্ধোত্তর জীবনের ভঙ্গি সমাজে যে বিপ্লব এনে দিচ্ছে তার ফল।

আমি বললাম,—কিন্তু বোধহয় সেটাই একমাত্র কারণ নয়। আজকের দিনের তরুণ-তরুণী সব কিছুই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক এমন একটা প্রত্যাশা করে। চাকরি চাই ত যাব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। পরামর্শ চাই, ত যাব নাগরিকদের পরামর্শ ব্যুরোতে। তা ছাড়া ছেলেরা দেখছে যে ডিভোর্সের হার বেড়ে চলেছে। কাজেই চাইছে এমন বিয়ে, যা সংসারের ধোপে টেঁকে। মেয়েদেরও নানা ঝামেলা। কবে আসবে কোন্ বন্ধু বিয়ের প্রস্তাব করতে? কবে চাকরি পাকা হবে, কবে জমবে কিছু রেস্ত? এদিকে বয়স যাচ্ছে গড়িয়ে, স্বপ্ন যাচ্ছে হারিয়ে। বাপমারও এমন সঙ্গতি নেই যে যোগ্য ছেলে বা মেয়েদের খোঁজ করে এনে পার্টি দেবে, যাতে মন লেগে যায়

কারো সঙ্গে। কাজেই মেয়েরা রাতে নিজের ঘরে চুলের 'পার্ম' ঢেউয়ের পরিচর্যা করে ম্যাগাজিন নিয়ে শুয়ে পড়ে। ছেলেরা ক্লাবে বা 'পাবে' গিয়ে গেলাস নিয়ে বসে অন্য ছেলেদের সঙ্গে। জীবনের মধ্যে রূপকথার রাজপুত্র বা স্বপ্নকন্যা নেমে আসার পথ ত এ নয়।

মার্টিনো বললেন,—খুব ঠিক কথা। ইয়োরোপময় স্টাডি করলাম; কিন্তু মডার্ন মিসরা কি করে যে সুখী হবে তার অনুপান পাইনি। কি বলেন?

উঠে দাঁড়ালাম। রাত হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে বললাম,—সুখের অনুপান সন্ধান করে মেলে না। তা আছে শুধু আপন মনে। জীবনে আর স্বপনে কতখানি কি মেশাতে হবে তা নির্ভর করছে আপনারই উপর। এই ধরুন আমেরিকান আধুনিকাদের কথা।

আমেরিকার নামে মার্টিনোর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর দেশের সবাই সেই প্রমিস্‌ড্‌ ল্যাণ্ড ইহলোকের সুখের রাজ্যে যাবার স্বপ্নে বিভোর। উনি বললেন,—বলুন ওদের কথা।

আমি বললাম,—ওদের ত কত সম্পদ, কত স্বাধীনতা। মার্কিন আধুনিকাকে দেখে সর্বদাই মনে হয় যেন এইমাত্র স্নান সেরে এসেছে। এমনি তাজা, ছিমছাম, ফিটফাট। চটক আর চাকচিক্যে ভরপুর। ওদের ষোল কোটি লোকের মধ্যে আট কোটির আয় হচ্ছে বছরে বিশ হাজার। পাঁচ কোটি সংসারে আছে রিফ্রিজারেটার আর চার কোটি সংসারে ধোয়া-মোছার বিজলী মেশিন। তবুও ওদের আধুনিকাদের সমস্যার শেষ নেই। অন্তরজ্বালার নেই অন্ত।

দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে মার্টিনো শুধালেন,—কার আপনাদের?

জবাবটা দিতে একটু ভয় হল। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল যে আমাদের আধুনিকারাও কেউ কেউ এ লেখাটা পড়বেন।

তবু সাহস করে স্বীকার করে ফেললাম,—আমাদের আধুনিকাদেরও সমস্যার শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য দিতে হচ্ছে দাম, এসে

পড়ছে দায়। তবে আমাদের এরাও ভাগ্যের সেই চ্যালেঞ্জকে মেনে নিচ্ছেন।

দোহাই আপনাদের ; অভিমান করবেন না। রবীন্দ্রনাথও সেই বছর তিরিশ আগেই লিখেছিলেন ঃ

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা ?
যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী······

সহপাঠিনী

রূপে একেবারে চমক লাগিয়ে দিল। মনে মনে একটা ইংরেজী বর্ণনা আউড়ে গেলাম। পীচ ফল আর সরে মাখান বছর চল্লিশ। নধর হলুদরাঙা পীচ ফল, তার উপরে উজ্জ্বল সর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেলা গড়িয়ে এসেছে। যৌবনের অপরাহ্ণ বিলেতী পাকা পীচের রঙে রাঙান। তায় ননীর কমনীয়তা ভরা।

লিফ্‌ট দিয়ে নামতে নামতে নিজের মনে হাসলাম। উপমাটা একেবারে বিলেতী হয়ে গেল। যেন ইংরেজী ভাষায় স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু যে দেশে রয়েছি, যে দেশের লোকের সঙ্গে সব সময় উঠতে বসতে হাসতে কাশতে হচ্ছে তাদের ভাষায় না হয় একটু স্বপ্নই দেখলাম। মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

কিন্তু জেগে স্বপ্ন দেখার সময় হল না। লিফ্‌টের বোতাম টিপছেন সেই মহিলাটিই। অটোম্যাটিক চালু লিফ্‌ট থামিয়ে ওকে তুলে নিলাম। নির্জন পথে নয়, জ্যোৎস্না নিশীথেও নয়, কিন্তু আমরা দুজনে যাত্রী।

হোটেলের তের তলা থেকে নামছি। সারা পৃথিবীটাই এখন দূরে; অনেক দূরে।

পীচের দেহসৌরভ ভেসে আসতে লাগল। দেবর লক্ষ্মণের মত নয়নজোড়া একেবারে নত করে রাখলাম। কিন্তু সেখানেও একজোড়া চরণ-কমল নাইলনের টলটলে স্বচ্ছতা ভেদ করে ফুটে রয়েছে।

কাজেই সোজাসুজি চোখ তুলে ওর দিকে তাকালাম।

মামুলী সুপ্রভাত জানালাম। নেহাৎ ভদ্রতার বাঁধা বুলি। কিন্তু

—সত্যি কথাটা স্বীকার করতে দোষ নেই—শুধু ভদ্রতা নয়। ভদ্রমহিলার শোভন কান্তি মনে একটু ধাক্কা দিয়েছে। গুড্ মর্নিং কথা দুটো শুধু দুটো কথাই নয়। গলার স্বরে অনেকখানি স্বাভাবিক সহজ সুর ফুটে উঠল। সে সুর প্রথম যৌবনে, কলেজের দিনগুলোতে সহজ ছিল। সে সুর কাজ আর ভদ্রতার বেড়াজালে আটকিয়ে প্রায় ধামাচাপা পড়ে গেছে এতদিনে।

ওহ্, ইজ দ্যাট ইউ, ডক ?

ডক, ডক। ডক অর্থাৎ ডক্টর।

বছর বিশেকের পর্দা এক নিঃশ্বাসে ঝড়ো হাওয়াতে উড়ে গেল।

সামনে হাসিমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পেনী। পেনিলোপী, মার্কিন মেয়ে, কিংস কলেজের সহপাঠিনী। মাত্র এক পেনী, ব্যাড পেনী, হে পেনী (আধ পেনী) কত কিছুই না ওকে ডাকত সহপাঠীরা। ও যখন সব সহপাঠীদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় হারাতে আরম্ভ করল তখন সবাই বিরক্ত হয়ে সব ডাকনামই ছেড়ে দিল। ডাকনাম হচ্ছে আদর করে ডাকার নাম। যে মেয়ে সব ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে নীল জাম্পারের তলায় স্কার্টের পাশের বাঁধন জিপ ফাসেনারটা টানতে টানতে মেয়েদের আলাদা কমনরুমে চলে যায় তাকে আবার আদর করে ডাকব কেন ? সে যখন সহপাঠীদের এমন তুরুশ্চু করে তখন সে আর ব্যাড পেনীও নয়, হে-পেনীও নয়। শুধু সাদামাঠা পেনী। আর কিচ্ছু নয়। আমরা, সব ছেলেরা, এই ঘরের চারটে দেওয়াল আর এই মোমবাতির নীচে বিলেতী কায়দায় হলপ করে বলছি যে, ও মেয়ে শুধু পেনী ছাড়া আর কিছু নয়।

লণ্ডন, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের মত পুরানোপন্থী নয়। এখানে কলেজে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। মেয়েদের আলাদা কলেজও আছে। কিন্তু নিরুপায় না হলে সেখানে ছাত্রীরা যায় না। কলেজ-গুলিতে অবশ্য মেয়েদের আলাদা কমনরুম আছে, বিশ্রামের আড্ডার

জায়গা আছে। অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে ব্যবহারের কমনরুমও আছে। প্রথম কলেজে ঢুকে ছাত্রীরা মেয়েদের কমনরুমেই চলে যায়। তার পর আস্তে আস্তে কেমন করে না জানি নিজেরই অজান্তে পা চলে আসে অন্য কমনরুমটার দিকে। হয়ত সঙ্গে থাকে ক্লাশে নতুন পরিচয়-করা কোন ছাত্র। হয়ত মনে জাগে নতুন মানুষদের পরিচয় পাবার ঔৎসুক্য। মোট কথা কয়েক মাসের মধ্যেই ছাত্রদের ঘরটাই গুলজার হয়ে ওঠে। একে একে প্রায় সব ছাত্রীই এসে জোটে সেখানে। এল না শুধু পেনী। ব্যাড পেনী।

আস্তে আস্তে সব গা-সওয়া হয়ে গেল। পেনী অন্য জগতের, থুড়ি অন্য ঘরের লোক। সে নেহাৎ একমনে পড়াশোনা করে। এমন কি যে সময়টা কমনরুমে গা ঢিলে দিয়ে লোকে বিশ্রাম নেয়— তখনো। এহেন অন্যায্য সুবিধা যারা নেয়, যারা কলেজের মাইনে দিয়ে টাকায় আঠার আনা উশুল করে নেয় তারা মোটেই স্পোর্ট নয়। তাদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না। নেহাৎ পরীক্ষার সময় নামটা উপরের দিকে থাকে বলে সমঝে চলতে হয়। তবু ওর সুন্দর মুখখানা সবাই ভুলতে চেষ্টা করল।

বাগানের দেওয়ালের ওপারে আড়ালে ফুটে আছে যে ফুল তার জন্য ওদেশে কোন মাথাব্যথা হবার দরকার নেই।

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে দেশ; আনন্দের মাতাল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে অবারিত। নাচে গানে হাসির ঝঙ্কারে কারো মনকে আঁধার থাকতে দেবে না; চোখকে রাখবে না পিপাসিত।

পেনী আমাদের কমনরুমে আসে না বলে সহপাঠী বন্ধু 'সু' দুঃখ করছিল। হেসে সে কথা উড়িয়ে দিলাম। আমার মতবাদটা বললাম। কিন্তু সে একমত হল না। বরং সমালোচনা করল যে, আমি বিলেতের সব কিছুই উজ্জ্বল দেখি। এই আলো আমায় ধাঁধিয়ে রেখেছে।

আবার হেসে উঠলাম। বললাম,—দুঃখকে কেমন করে বুড়ো আঙুল দেখাতে হয় সে বিদ্যা এরা বেশ রপ্ত করে রেখেছে।

—বটে, সব খবরই রাখ দেখছি এদের।

—তা কিছু কিছু ত রাখি। এই দেখ না, এইমাত্র একজন ইটালিয়ান পাঁচালী কবির ছড়া পড়ছিলাম। বেশ দুঃখের সঙ্গে মজাও লাগে শোন একবার। ভেনোসার রাজপুত্র ডন কার্লো জেসুয়াল্‌ডো তিনশো বছর আগে গাইত:

একটা ছোট্ট মশা
আমার দুখ জাগানিয়ার
বক্ষে জাগায় হাহাকার
বেঁধে সেথায় বাসা;
দুঃসাহসী মশা।

সামনের চুল্লীতে গনগনে আগুন জ্বলছে। তবু তাতে আরো দুটো কয়লার চাঙড় ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর 'সু'র দিকে এগিয়ে এসে বললাম—বলি, ব্যাপার কি? পেনী এঘরে আসে না বলে এত আফসোস কেন? মশা কামড়াচ্ছে না কি?

—ধ্যেৎ, তুমি ভারী অসভ্য।

'সু'র পাকা ভারতীয় রঙে একটু বিলেতী আমেজ লাগল কি না তা নজর করতে পারার আগেই দুমদাম করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসছে। 'সু'র কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। এমন কি পেনী যখন এ ঘরে যাতায়াত সুরু করল তখন তার দিকে পর্যন্ত কেউ নজর দিল না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা। কাজের সময় কাজ। তা ছাড়া ততদিনে সহশিক্ষার চমকটাও চলে গেছে। পাশে বসে যে প্রফেসারের বক্তৃতা থেকে নোট টুকছে সে জন না জিন সে খবর আর কেউ নেয় না।

শুধু খবর নিয়েছিলাম যখন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় দেখলাম পেনী খারাপ করেছে। প্রফেসার অবাক হলেন; আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। কে যেন ফিসফিস করে চায়ের কাপের আড়ালে বলল যে, পেনী গভীর প্রেমে পড়েছিল। সেই জন্যেই ওর এই দুর্দশা। পেনী নাকি বলেছে যে, জীবনে আর কখনো সে ধাক্কা সামলাতে পারবে না।

সেই পেনী। রূপে, সমৃদ্ধিতে সাফল্যে ঝলমল করছে। প্রাণ যেন উছলিয়ে পড়ছে। কানায় কানায় ভরা একপাত্র প্রাণ। আজ বিশ বছর পরে বললাম তাকে সে কথা। সে কথায় তার জ্যোৎস্নার সাগরে বান ডাকল। পুরোনো কথার আর শেষ হয় না। দু-তিনদিন এক টেবিলে ব্রেকফাস্ট খেলাম। একদিন খানিকটা আলাপের পর সে-ই আহ্বান করল—চল, শনিবার বিকেলে কলেজে বেড়াতে যাওয়া যাক। উই শ্যাল ওয়াক ইন মেমোরিজ গার্ডেন। স্মরণের কাননে আমরা বিচরণ করব।

স্মরণের কাননেই বটে। যুগ যুগ ধরে কত মনীষীর স্বপ্ন আর স্মৃতিতে ঘেরা কলেজ। কিন্তু তাদের কথা যেন কত দূরের কথা। তার চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু অনেক কাছে হচ্ছে আমাদের কথা, এই সেদিনের আশাঘেরা অনিশ্চয়তা-ভরা ছাত্রজীবন। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে টেমস নদী। কলেজের বাগানটা ফুলে ফুলে ভরা, নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া। সেখানে আমরা বসলাম। বেঞ্চিতে নয়, ঘাসে। শুধু বসলাম না; আমি একটা টিউলিপ ফুলের ঝাড়ের পাশে শুয়েই পড়লাম।

কি? শুয়ে পড়লে যে। কবিতা লিখবে বলে ভয় দেখাচ্ছ মনে হচ্ছে।

পেনীর ঠাট্টায় বিচলিত হলাম না। যা উত্তর দিলাম সোজা কথায় তার মানে হচ্ছে এই যে—অয়ি মার্কিণ অভদ্রে, তোমার এই

ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা করলাম। তুমি জান না, এ হেন একটা ঠাট্টা করে তুমি বিশ্বকে একটা বড় প্রতিভার দান থেকে বঞ্চিত করলে।

বটে? বটে? জানতাম না যে এ যুগেও পুরোনো কলেজে এসে লোকে কবি হয়ে ওঠে। ইণ্ডিয়াতে সরকারী অফিসে লোকে যে নোট লেখে তা বুঝি গানের নোটেশন (স্বরলিপি)?

খুব গম্ভীরভাবে বললাম,—আমায় ঠাট্টা করতে পার। কিন্তু নিশ্চয়ই জান যে, যে গানটা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র সব চেয়ে বেশী হালফিল চালু হয়েছিল সেটা এমনিভাবে কলেজের মাঠে বসে লেখা? আর আমারি মত একজন ভূতপূর্ব ছাত্রের কীর্তি?

উৎসুক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল,—কোন্ গানটা?

চ্যালেঞ্জ করে বললাম,—তুমিই আন্দাজ করবার চেষ্টা কর।

গুনগুন করে অনেক গানের সুর সে ভাঁজল। ঠিক এমন একটা জিনিস আমাদের দেশে সহজে পারতাম না। কারণ এখানে গান হচ্ছে শুধু গাইয়ের সাধনা। শুনিয়ের মনে তান তুলতে পারে, কিন্তু তার গলায় গুনগুনানি এনে দেবে না। কয়েকটা গানের সুর ভাঁজা হবার পর বললাম,—আচ্ছা, একটু সঙ্কেত দিচ্ছি। সেই ছাত্রটি এই একটা গানের রেকর্ডের রয়্যালটি থেকে এ যাবৎ কামিয়েছে পনর লক্ষ টাকা। তোমাদের দেশের রচনা। পৃথিবীতে আর কোথায় এমন ভাবে বিরাটের সাধনা হয় বল?

সঙ্গে সঙ্গে পেনী সুরটা ধরে ফেলল। স্টার ডাস্ট। তারার গুঁড়ো। আমেরিকায় একটি কলেজের ছাত্র অনেকদিন পরে আমারি মত পুরোনো কলেজে বেড়াতে এসেছিল। বেড়াতে বেড়াতে সে কলেজের মাঠে শুয়ে পড়ে। গুনগুন করতে করতে মনের খুশিতে তার গলায় গান এসে গেল।

কাননে দেওয়াল পাশে
যেথায় উজলি' রহে তারা

তুমি বাঁধা বাহুপাশে,
রূপকথা গাহে পাপিয়ারা ;
স্বরগের গান ওঠে
যেথায় গোলাপ ফোটে,
বৃথা স্বপ্ন দেখি হায়,
নিতি রহ এ হিয়ায় ;
তারার গুঁড়ায় গান ভরে
প্রেমের স্মৃতির আখরে।

অনেকগুলি গানের কলি আর সুর পেনীর মনে ঝঙ্কার দিয়েছে এতক্ষণ ধরে। বন্যার স্রোতের মত তারা ঢেউ তুলে গেছে একটার পর একটা। আমাদের গরম দেশে নরম মনে তার প্রতিঘাত হয়ত কিছু নাড়া দিয়ে যেত। ফাল্গুনের আগুন-ভরা রাতে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে হয়ত একটা তোলপাড়ও উঠতে পারত। কিন্তু এই ঠাণ্ডা দেশের হিসাবদুরস্ত আবহাওয়াতে নারী আর পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সমাজে আগুন আর ঘিয়ের উপমা অত সহজে খাটে না। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের বন্ধুত্ব চট করে প্রেমে জমে ওঠে না। তায় আবার পেনী হচ্ছে মার্কিনী মুলুকের মেয়ে। সে দেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ হচ্ছে নাকি অত্যন্ত যাকে বলে বৈষয়িক, অর্থাৎ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট। তার উপর মিসেস পেনিলোপী আর্মস্ট্রং নিজেই প্রকাণ্ড 'ফারে'র ব্যবসা চালায়। সেই ব্যবসার আমদানী-রপ্তানীর জন্যই সে ইংলণ্ডে এসেছে। 'ফারে'র দামী সৌন্দর্যে যারা প্রিয়াকে সাজাতে চায় তেমন পুরুষ, আর যারা তাই পরে সবার প্রশংসার দৃষ্টি কুড়োতে চায় তেমন নারীর সঙ্গেই ওর কারবার। অতএব গোটা কয়েক মায়ায় ভরা সুরের পরশে ওর মনে ভাপে-ভরা ফানুস জ্বলে ওঠার কোন ভয় নেই।

কিন্তু হঠাৎ পেনী চুপ করে আছে কেন? কি হল ওর? ওর

চোখে কি বিকেলের রোদে টেমস নদীর বুকের ঝলমলে আলোর ছায়া? না, কনে-দেখা আলোতে মার্কিন ম্যাক্স ফ্যাক্টরের প্রসাধন আই-শ্যাডো অর্থাৎ চোখের ছায়ার মায়া?

একটু ভাবনায় পড়লাম। পেনী যদি কোন কারণে বেসামাল হয়ে থাকে? এখন আমার একটু রাশ টানাই বোধ হয় ভাল। একটু ফর্মাল ভাবে চলতে হবে। গেল দু-তিনটে দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গল্প-গুজব একটু বেশীই বোধ হয় করা হয়েছিল।

যেন ও-পাশের ঘর থেকে আলগোছে আমায় ডাকল,—ডক!

লেপাপোছা গলায় সাড়া দিলাম,—ইয়েস মিসেস আর্মস্ট্রংগ, য়্যাট য়োর সার্ভিস।

এ হেন উত্তরের ভঙ্গির জন্য সে তৈরী ছিল না। আমিও না। হঠাৎ এ কি করে বসলাম। পেনী কিন্তু চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সহজ হয়ে বসল।

তারপর মুখটা একটু কঠিন করে সে বলল,—আমায় তুমি ঠাট্টা করছ, ডক?

গম্ভীরভাবে বললাম—যাক, তবু বাইশ বছর পরে সেটা বুঝতে পারলে।

আরো কঠিন হয়ে সে বলল—ইউ সিলি ডক। তবে তোমায় দোষ দেব না। ইংলণ্ডের বসন্তকালে বিকেলের আলোয় লোকে বোধ হয় বোকাই হয়ে ওঠে।

এবার গাম্ভীর্যের মুখোস খসিয়ে ফেলে জবাব দিলাম,—ঠিকই বলেছ। আমরা তোমায় তখন প্রায়ই এই বিকেলী আলোতেই কলেজ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখতাম।

যেন দড়াম করে ধাক্কা খেয়ে সে উঠে পড়ল।

সুর কেটে গেল। বোকার মত আমিও উঠে পড়লাম। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ-পথে টিউব ট্রেনে যেতে যেতে অবশ্য কোন লোক কিছু

বুঝতে পারল না। ওদেশের সভ্যতার গুণই এই। মুখ দেখাচ্ছি, না মুখোশ দেখাচ্ছি তাতে বাইরের লোকের দরকার কি ?

মনের আগল না হয় বন্ধই হল, মুখে তালা পড়বে কেন ?

রাতে ডিনারের সময় ওর টেবিলের দিকে লক্ষ্য রাখলাম। অবশ্য খাবার ঘরে ঢুকেই নিয়ম মাফিক হেসে শুভ-সম্ভাষণ করে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেশী কথা কইতে সাহস হয়নি। আমার মনে ছিল অনুতাপ। কে জানে, ওর মনে কোন্ তাপ ?

ওর উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলাম। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে তুয়েকটা কথা কইতে কইতে হাজির হলাম টেলিভিসন ঘরের দরজায়। হঠাৎ দরজাটা খুলে একটু মাথা হেলিয়ে আহ্বান জানাতেই সে খুব খুশি হয়ে উঠল। ধন্যবাদ দিয়ে ঘরে ঢুকল। কেউ নেই সে ঘরে। 'টি, ভি'র চাবী টিপে দিতেই সেদিনকার ফুটবল খেলার ছবি দেখান সুরু হল। বাঁচলাম। ফুটবলটার মার্কিন দেশে কদর নেই।

তাই দিয়ে কথা সুরু করলাম। আস্তে আস্তে তুজনের মাঝখানের বরফ গলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত খুব তুঃখ জানিয়ে বিকেলের ব্যবহারের জন্য মাপ চাইলাম। বললাম যে, কোন মার্কিন মহিলা এইটুকু ঠাট্টায় যে আঘাত পাবে তা কখনো বুঝতে পারিনি। সত্যি বড়ই, বড়ই তুঃখিত আমি।

আমার তুঃখ দেখে ওর হাসি এল। বলল—আচ্ছা ডক, এই নিয়ে আজ বোধ হয় পনেবার শুনলাম যে আমি আমেরিকান। কিন্তু বলত, হোয়াট্‌স্ আমেরিকান য়্যাবাউট আমেরিকা ? আমেরিকার মধ্যে মার্কিনত্বটা কি ?

সুবিধা হয়ে গেল। এমন একটা বিষয় এসে গেল যা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলা যাবে। আস্তে আস্তে ওর মনের ব্যথাটা ধুয়ে যাবে। তখন আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যাব।

বেশ জমিয়ে বসে স্থুরু করলাম।

আমেরিকানত্ব যে ঠিক কি তা বলা বড় শক্ত। এই দেখ না, সবাই তোমাদের বলে ঘোর বস্তুতন্ত্রবাদী, অথচ এক একটা আদর্শের জন্য আমেরিকা কি না করল। এমন ভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে অন্য দেশের অন্য বর্ণের নিগ্রোদের দাসত্ব উঠিয়ে দিতে আর যে কারা পারত, জানি না। এদিকে দেখ, ওদের আইন-মতে সব অধিকার দিয়েও সমাজ-হিসাবে বঞ্চিত করে রেখেছ।

ও একটু উসখুস করতে লাগল। তাই বিষয়টা বদলে ফেললাম।

সবাই বলে তোমরা নিজেদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ব্যস্ত, অথচ মার্কিনে মার্কিনে ধূল পরিমাণ; এমনি তোমরা দল বাঁধতে পার। গুরুজনকে তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আন না, অথচ "মম" অর্থাৎ মা-মণি বলতে অজ্ঞান।

হেসে উঠল পেনী.—বাঃ, বেশ ত দেখছি কলেজের রচনা তৈরী করে যাচ্ছ। "এসে" লিখেছিলে বোধ হয় এ বিষয়ে?

—প্রায় সেই রকমই। তবে তোমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে কি কি জান? নিউইয়র্কের আকাশের রেখা, মোটর গাড়ী, জ্যাজ বাজনা আর চিউইং গাম।

—চিউইং গাম? অবাক করলে।

—শোনই না ছাই। আগে আমায় মুখ চালাতে দাও, পরে চিবোবার জিনিসে আসা যাবে।

চুপ করে পেনী ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখা লিপস্টিক প্রভৃতির দিকে নজর দিল। নারী, একেবারে আশার অতীত ভাবে নারী। হোক না কলেজের পড়ুয়া, হোক না স্বাধীনা ব্যবসায়ী।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাইজের দেশগুলির অন্যতম। ভারতবর্ষের তিনগুণ সাইজ। কিন্তু আমেরিকা তেড়ে ফুঁড়ে আকাশের দিকে ধাওয়া করেছে। মনের বা রুচির দিক দিয়ে ওই আকাশ-আঁচড়া

ইমারৎগুলোর কোন মানে হয় না। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই উঁচু উঁচু বাড়ীগুলো পাগলামীর চিহ্ন সেজে বসে আছে। কিন্তু সব শুদ্ধ মিলিয়ে কি খাসা দৃশ্যই না হয়েছে। গতি, আরো বেশী গতি, আরো উঁচুতে গতিবেগ দেওয়ার মন্ত্রে ওরা বিভোর। সংসারাতীত ওপরওয়ালার খবরে মন না থাকতে পারে; সংসারের উপরের দিকে সর্বদাই ধাওয়া করছে।

হেসে বাধা দিল পেনী,—তোমার চিবুনে রবারেও সেই গতির মন্ত্র আছে নাকি?

—রসিকে, রসো একটু। আমার বক্তব্যটা জমতে দাও। মোটরের কথা না হয় বাদই দিলাম। জ্যাজ বাজনাটার কথাটা বলি। পশ্চিম ইয়োরোপেব সঙ্গীতের সঙ্গে জ্যাজের চেহারার পর্যন্ত মিল নেই। মাতোয়ালা ছন্দ তার, কিন্তু কখন কোথায় যে মনগড়া পরিবর্তন হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। শুধু গতিবেগটুকুই আছে তার ঠিক। এ বাজনার ক্লাইম্যাক্স নেই, আছে অবসান। ঠিক তোমাদের স্কাই-স্ক্রেপারগুলোর মত।

—ওঃ ডক, তোমার কথাগুলোও স্কাই-স্ক্রেপারের মত মাথা ফুঁড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

কথাগুলো আমার নয়। অন্যেরাও একথা বলে। স্থাপত্য শিল্প হচ্ছে জমাটবাঁধা সঙ্গীত। আর এ যুগের সবচেয়ে বড় স্থপতি লে কর্বুসিয়ে বলেছেন যে, আমেরিকার ইমারৎগুলো হচ্ছে লোহা আর পাথরের গরমাগরম জ্যাজ।

'সত্যি সত্যি ওর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চিউইং গাম বের করে মুখে দিল। দিয়ে বলল,—এবার বল চিউইং গামের কথা।

—ওই যে চিবিয়ে চলেছ এটাও একটা গতি। মুখ চালিয়ে চল অন্তত, আর যদি কিছু না চলে। ও পদার্থটি তুমি খেয়ে ফুরিয়ে ফেলবে না, গিলে শেষ করবে না। শুধু অর্থহীনভাবে নৈর্ব্যা[illegible] চিবুতে

থাকবে। মুখের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে এই চিবুনে বস্তু, ঠিক যেরকম—

ঠিক কি রকম বলতে পারছিলাম না। বলার তোড়ের সঙ্গে ভাবার গতি তাল সামলাতে পারেনি। চট্‌ করে বলে ফেললাম—

—ঠিক তোমাদের মেট্রোপলিটন অপেরার সেই প্রিয় সোপ অপেরার (সাবানের ফেনার মত হালকা চটকের গীতিনাট্য) গানটার রেশের মত :

কবে দেব তোমা' মোর প্রেম ?
শুধু জানি, তাহা ত জানি না।
হয়ত দেব না কভু প্রেম :
হয়ত কালই দেব, জানি না।

এই গানটা আউড়ে যাবার সময় কিছু ভাবিনি। কিন্তু হঠাৎ মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। গানটার মধ্যে একটা বড় রকম সম্ভাবনা আছে। দেব নাকি একটা ডেপথ চার্জ ?

বিকেলে অমন করে ওর চোখের তারা কি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল শুধু শুধু ?

যেন কোন লুকোনো মানে নেই আমার প্রশ্নে। নেই কোন ইসারা। এমনি একটা ভাব দেখিয়ে খুব সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের দেশে এত ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেমের গান রচনা হচ্ছে। কি করে সেটা সম্ভব ? এটা ত আমেরিকান পদার্থ নয়।

চোখ বড় বড় করে সে বল্লল,—নয় ? তুমি কি করে জানলে ?

খুব নিরীহের মত মুখ করে শুধোলাম—সেই জন্যেই ত জিজ্ঞেস করছি। তুমি প্রেমের কথা কি জান ?

পেনী, আমাদের কলেজের সেই ব্যাড পেনী হঠাৎ বলে বসল,— তুমি সারা জীবনে যতটা জানতে পারবে তার চেয়েও বেশী কথা আমি ভুলে গেছি।

এরি মধ্যে।...

টেলিভিসনের প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। তার পর্দাটায় ছবি আর আওয়াজও শেষ হয়ে গেছে। শুধু বিজলী আলোর একটা প্রতিফলন, ইস্পাতের রঙের প্রতিফলন আঁকাবাঁকা রেখা এঁকে যাচ্ছে পর্দার বুকে।

উঠে গিয়ে যে স্যুইচটা বন্ধ করে দেব তাও মন চাইছে না। পেনী এমন নিস্তব্ধতার সাগরে ডুব দিয়েছে যে তার ধ্যান ভঙ্গ হবে। আমিও ভাবতে লাগলাম।

জানি যে পশ্চিম জগতে কেউ ব্যথার ভারে নুয়ে বসে থাকে না সারা জীবন। শুধু মন ভাঙ্গা নয়, ঘর ভাঙ্গা, ইহকালের বাসা ভাঙ্গা পর্যন্ত ওদের দমিয়ে রাখতে পারে না বেশীদিন। যে মন থেকে বিচ্ছেদ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না সে-ও গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে ঠিকই।

"জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই"

কিন্তু নৌকোরও ত অভাব নেই। ঘাটে ঘাটে বাঁধা তরণী। তীরে, না হয় নীরে—সব ঠাঁই পাবে তুমি হৃদয়হরণী। যদি সে সম্পদ তুমি কাউকে দিতে চাও।

উইলিয়াম জেমসের লেখা মনে পড়ল। অত্যন্ত আমেরিকান এই দার্শনিক জেমস। তিনি তাঁর বোনকে বোঝাচ্ছিলেন যে তাঁর বাড়ীটা সবচেয়ে আরামের বাড়ী। 'কারণ এর চোদ্দটা দরজা; আর সবগুলোই বাইরের দিকে খোলে। আমেরিকানদের মন ও সেই রকম বাইরের দিকে খোলা।

এ যুগে যার মতবাদ লোকের মনে সবচেয়ে বেশী নাড়া জাগাচ্ছে সেই জ্যাঁ পল সার্তরের কথা মনে পড়ল। নিউইয়র্ক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, এর সব রাস্তাই এত লম্বা আর সোজা যে মানুষের বসবাসের খাঁচাগুলোকে বন্ধ বলে মনেই হয় না। একটা অসীমতায় তারা ধাওয়া করে চলেছে। অশেষতার আস্বাদ আছে তাতে।

সত্যিই ত। সত্যিকারের আমেরিকার মধ্যে আছে এই ধেয়ে চলা, এই অশেষের পানে পরিণতি। আমাদের পেনীর মনেও আছে তারি ছোঁয়া, তারি আশ্বাস।

কিন্তু পুরোপুরি তা না-ও হতে পারে। ওরা আজ প্রণয়ী—এবং তার চেয়ে বড় কথা, বিয়ের জুড়ী ঠিক করতে আরম্ভ করেছে যন্ত্র দিয়ে।

বিশ্বাস হচ্ছে না? অবিশ্বাসের কথাই বটে। আমেরিকান টেলিভিশনে কিছুদিন আগে বিজলী আলোর চকমকি ঠুকতে ঠুকতে, অনেক সংখ্যা হিসাবের কারবার, অনেক গানের সুর শোনানর মধ্যে বিরাট একটা ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক দেখান হল। বত্রিশ দফা প্রশ্ন লোকদের কাছে পাঠান হয়েছিল। তাতে জাতি ধর্ম রাজনীতি প্রিয় নেশা, এমন কি একজনের মাপের বিছানা পছন্দ, না দুজনের মাপের এমন সব দরকারী প্রশ্ন তাতে ছিল। যে কোন ছেলে আর মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে এ সব প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দিতে পারে। সে সব উত্তর যাচাই করে দেখে এই কল কনে আর বর বাছাই করে দেবে।

চুপচাপ করে এই সব কথা ভাবছিলাম।

ততক্ষণে পেনী আবার নিজেকে সামলে নিয়েছে। নিজের ধাতে ফিরে এসেছে। হেসে বলল,—কি, খুব ঘাবড়ে গেছ নাকি কথাটা শুনে।

তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখালাম। যেন ওর এমন করে বেফাঁস ভাবে নিজেকে খুলে দেখানতে মোটেই চিন্তায় পড়িনি। বললাম,—না, না। আমি ভাবছিলাম তোমাদের দেশের কলের পুষ্পধনু সাহেবের কথা।

ওর খুব কৌতূহল হল। ব্যাপারটা বললাম। শুনেই বুঝতে পারল,—ও, তুমি সেই রেমিংটন রাণ্ডের মেশিনটার কথা বলছ? ওটা টেলিভিশনে আমিও দেখেছি। তবে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার

কথা নয়। আমাদের দেশে নিঃসঙ্গ-হৃদয়দের ক্লাব আছে, তা জান বোধ হয়? লোন্‌লী হার্টস্‌ ক্লাব।

উত্তর দিলাম—না জানলেও মানতে রাজী আছি। তবে নিঃসঙ্গ-হৃদয় হবে কেন? সাথীর অভাব অনেকেই ওখানে সাকী দিয়ে পূর্ণ করে।

প্রতিবাদ করল সে,—না, অত সহজে মন ভরে না। আমাদের ষোল সতের কোটি লোকের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি লোক এই সব ক্লাবের মেম্বার।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। সে আরো বলল,—কলের কিউপিড শুনে তুমি হাসছ। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমাদের দেশে সম্পূর্ণ অজানা ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়। হয়ত বাপ-মা বেছে দিয়েছে, হয়ত বা কয়েক দিন দেখা-শোনাও হয়েছে। আমাদের দেশে অনেক দিন জানা-শোনা হয় বটে। তবুও প্রথম থেকে সুরু হয় অজানা রুচি, অভ্যাস, মতিগতি এসবের ঝুক্কি নিয়ে। এ সব ব্যাপারে মিল হতে পারে এমন সব খোঁজ-খবর কাগজে কলমে জেনে নিয়ে সুরু করলে, তার পরের বিয়েটা মোটমাট টেকসই হবার আশা থাকে বলেই ত মনে হয়। অন্ততঃ এই ভরসাতেই সেদিন একটি মেয়ে তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে কলের বাছাই করা প্রণয়ীকে পছন্দ করে নিয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বেশ খাতির করে বললাম,—কিন্তু পেনী, তুমি নিশ্চয়ই আমেরিকান হতে পারনি। তুমি ত এই য়্যাটলান্টিকের এপারেই লেখাপড়া শিখেছ।

একটু থেমে যোগ করে দিলাম,—এবং প্রথম যৌবন কাটিয়েছ।

পেনীও উঠে পড়ল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ক্লান্ত স্বরে বলল,—এবং এখানে যে ধাক্কা খেয়েছি, সেটাই সবচেয়ে বড় ধাক্কা। তুমি ঠিকই বলেছ; আমেরিকানিজম হচ্ছে একটা চলমান প্রক্রিয়া। শুধু চলে চলে চালু থাকে। তার ছোঁপ পেয়েছিলাম বলেই এত

সবের সত্ত্বেও নিজেকে হারাইনি। তা না হলে চল্লিশ পাতা চিঠির ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে পারতাম না।

আচ্ছা, শুভরাত্রি, ডক।

শুভরাত্রি, শুভরাত্রি, পেনী। এবং সুখস্বপ্ন।

মিলে গেল, মিলে গেল কাহিনীটা। সেই বাইশ বছর আগে 'সু'ও এই চিঠিটার ধাক্কা সামলাতে পারেনি। যাকে ভালবেসেছিল, সেই বিদেশিনী সহপাঠিনীকে যেন সে বিয়ে না করে এহেন কাতর কান্না-ভরা চল্লিশ পাতার চিঠি সে দেশ থেকে পেয়েছিল। তাতে অনুরোধ ছিল যেন চিঠিখানা সেই বিদেশিনী তরুণীকেও দেখান হয়।

কে যে সেই বিদেশিনী এতদিন জানতাম না।

প্রেমের গল্প লিখে থাকি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে। সত্যের এক ফোঁটার সঙ্গে মিথ্যার এক বোতল, আর বাকীটা সব কল্পনা। এই ত মামুলী অনুপান। একজনের প্রেমের সত্য ঘটনাবলী না হয় নাইবা জানলাম।

রোম্যান্সের রাস্তায়

রোমান্সের রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলেছি।

এটুকু জেনেই আপনি আমার সঙ্গ নিতে চাইবেন। আমিও তাই চাই। নেমে পড়ুন আমার সঙ্গে ইটালীর ছোট রাস্তায়, গলি ঘুচিতে, পায়ে হেঁটে। পদে পদে রোম্যান্স।

রোমের রোমিওদের কথা আগে থেকেই শুনে এসেছি। প্রায় পঁচিশ বছর আগে থেকে। ইংলণ্ডে তখন ইয়ুথ হোস্টেল এসোসিয়েশন তৈরী হয়েছে। জার্মাণীর তরুণ-তরুণী ওয়াণ্ডারফগেলদের মত ইংলণ্ডেও পায়ে হেঁটে দেশ দেখে বেড়ানর সংঘ তৈরী হয়েছে। আমি আর দুজন বন্ধু এই ইয়ুথ হোস্টেল সংঘের প্রথম ভারতীয় সভ্য হলাম।

কয়েকটি ইংরেজ মেয়ে তখন ইটালীতে যাচ্ছিল। তাদের সাবধান করে দেওয়া হল যেন ওদেশে ওরা একলা কারো মোটরে 'লিফ্‌ট' না নেয়। ওদেশে অনেকেই নাকি উড়কো প্রেম করে নেবার জন্য পা বাড়িয়ে থাকে। পায়ে হেঁটে বিদেশিনী তরুণী দেশ দেখে বেড়াচ্ছে। সে যদি খানিকটা পথ কারো মোটরে চড়ে সেরে নিতে চায়, তার সে পথটা ওরা একটু স্বপ্নে ভরে দিতে চায়। বলে—আমি ত তারই দিনের মধ্যে শুধু একটু মধু মিশিয়ে দিচ্ছি। ফাক তালে আমার যদি কিছু লাভ হয়ে যায় তাতে আপনার চোখ টাটায় কেন?

এই হচ্ছে রোমিওদের মনের কথা।

শুনে আমাদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ সভ্য খুব হেসেছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করে বলেছিল,—রোমিওদের খবর ত শুনলাম। ইটালীর জুলিয়েটদের খবরটাও জানতে চাই।

যুব হোস্টেল সংঘের প্রবীণা ইংরেজ সেক্রেটারী চশমাটা নাকের প্রান্তে নামিয়ে আনলেন। হেসে বললেন,—ইংলণ্ডের নওজোয়ানরা বিদেশী জুলিয়েটের সন্ধানে ইংলিশ চ্যানেল পার হয় না।

শুনে মনে মনে ভেবেছিলাম,—সাবাস। ঠিক জনবুলের মত কথাই বটে।

তারপর শুনলাম তিনি গুরু গম্ভীরভাবে বাণী দিচ্ছেন,—আমাদের এসোসিয়েশনের সভ্যরা ব্রিটেনের পতাকা সব সময় উঁচু রাখে। বিদেশে গিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে অশোভন কোন কিছু করে না।

মনে মনে টুকে নিলাম,—একেবারে পুরোপুরি জন বুল। বিদেশে গেলেও ইংরেজরা সে দেশের লোকদেরই বিদেশী মনে করে। এদের পেট এতই আত্মম্ভরিতায় ভরা।

শুনেছি যুদ্ধের পর ইটালীতে রোমিওদের রাজত্ব আরও বেড়েছে। এমনিতেই ল্যাটিন জাতের বিশেষত্বই হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা। ওদের মনের কেটলিতে যখন ভাবের জল টগবগ করে ফুটে ওঠে সেই টগবগানি ঢাকনা খুলে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। আর সেই ভাবের চা পরিণত হয় পাচনে।

সেই পাচনের গাঢ় রঙ আর তীব্র ঝাঁঝ দেখেছিলাম একটা ছায়া-ছবিতে। ইটালিয়ানে যাকে বলে রিয়েলিস্‌মো অর্থাৎ বাস্তবতা একেবারে তাতে ভরা। নেপলসের সরু অন্ধকার গলিপথ পর্যন্ত সেই রিয়েলিস্‌মো পৌঁছে গেছে দেখলাম। সদরের চওড়া ঝকঝকে রাজপথ থেকে আরম্ভ করে অন্দর-মহল পর্যন্ত। ছোকরাদের চুলগুলো এলোমেলো করে সামনের দিকে ঝোলানো। মেয়েদেরও তাই। এদিক সেদিক ছিটের ব্লাউজে স্কার্টে যত্ন করে কেটে বানানো ফুটো ফাটা উঁকি ঝুঁকি মারছে। যুদ্ধের পরের অভাবের বাজারে পোশাকের সংক্ষিপ্ত ছাটটা ছিল দরকার। রিয়েলিস্‌মোর কল্যাণে যেটা ছিল দরকার সেটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাহার।

রাতের 'শো'র পর হেঁটে ফিরে যাচ্ছি। না হাঁটলে যে সব কিছু দেখা যায় না। যায় না বোঝা। কিন্তু দুটো চোখ আর মোটে একটা মন দিয়ে সবকিছু অনুভব আর উপভোগ করি কি করে? এই ত আমার রাস্তার রোম্যান্স।

ভাবতে সময় পেলাম না। একটা প্রকাণ্ড লম্বা আলফা-রোমিয়ো মোটর ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল আমার প্রায় গায়ের উপর। চারদিকে দেখেই রাস্তা পার হচ্ছিলাম। কোথাও কিছু ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দামী গাড়ীর অন্যতম এই গাড়ীর চলন যেমন ঝড়ের মত, তার ইটালীয়ান ড্রাইভারের চালও তেমনি উনপঞ্চাশী। কি সব কথার তোড়ে সে পাগলাঝোরার মত আমায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল। শুধু এটুকু বুঝলাম যে সে আমায় শাসিয়ে গেল যে, যে বিদেশী রাতে পায়ে হেঁটে বেড়ায় আলফা-রোমিয়ো মোটরের তলায় পড়ে মরবার যোগ্যতা তার নেই।

না থাক। অমন ভাগ্যে আমার কাজ নেই। তার চেয়ে পাশের ছোট রাস্তাগুলোয় হাঁটা যাক। হয়ত সেখানে হঠাৎ জুটে যাবে গাইয়ে তরুণ-তরুণী দল। একতারার মত যন্ত্র বাজিয়ে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে তারা গাইবে 'স্টর্ণেল্লি' গান। ইটালীর পথঘাটের গান। ওরা হয়ত গাইবে :—

"ওগো কাঁটায় ঘেরা ফুল,
পিরীত যদি শুকিয়ে গেল
আর সবি যে ভুল।"

ওদের গানের আখর শুনতে শুনতে আত্মহারা হয়ে আমিও হয়ত তালে তাল দিয়ে উঠব :—

ওগো, গোলাপ কুঁড়ির সাকী,
খুশীর বানে ভাসি যদি
রইবে তুমি বাকী?

এ ত শুধু দুটো নিরেমিশ্রি নমুনা। 'স্টর্ণেল্লি' গান গেয়ে ইটালীর ছেলে-মেয়েরা ঝাঁট-না-দেওয়া রাস্তাগুলোকেও উজ্জ্বল করে তোলে হাসিতে খুশীতে।

আর কী সে গানের মালমশলা। বাস্তবতায় এমন করে ঝাল-নুন-টক-মেশানো যে, কথাগুলো প্রায় অস্পষ্ট হয়ে যায়। সুরটাই থাকে শুধু পরিষ্কার হয়ে। যেন মাংসের ঝোলে মাংস গেছে গলে; শুধু গরম মশলা-মাখান ঝোলটুকু আছে বাকী। তার ভাঁপ তার তাপ যদি এখন আস্বাদ করতে পারি, আমার আঁধার রাতে একা হেঁটে বেড়ান সার্থক হয়ে যাবে।

অন্ধকারে দেখলাম একজন নাবিক সেই চড়া গন্ধ আর কড়া আওয়াজে ভরা পুরোনো বন্দরের দিক থেকে টলতে টলতে আসছে। বিদেশী জাহাজের নাবিক নিশ্চয়ই। পেছনে পেছনে আসছে একটা বছর দশেকের ছোকরা। সুর করে বলছে,—তোমার মেয়ে চাই, মিস্টার? মেয়ে? আমার বোন আছে। সস্তা, খুব সস্তা।

ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে দাঁড়ালাম। আর এগোন ঠিক নয়। এই সব বদমায়েস বখা ছোকরাদের নাম বিদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। আগে এদের বলত র‍্যাগাৎসিনি। এখন বলে স্কুগনিৎসি অর্থাৎ ঘুরতাই লাট্টু। শুধু চুরি ছ্যাচড়ামি নয়, কালো বাজারের দালালি, চোরাই মালের পাচার অনেক কিছুই ওরা করে। খুব ছোট যারা তারা পোড়া সিগারেটের বাকী টুকরোগুলো কুড়োয়। সাত আট টাকা সেরে বিকোবে।

পুলিশ ওদের ধরে বটে। কিন্তু শোধরাতে পারে না। রিফর্মেটারীতে চরিত্র শোধরাবার জন্য হয়ত রেখে দেবে ছমাস। বাপ-মার কাছে হয়ত পৌঁছে দেবে সাবধানে দেখে রাখবার জন্য। তার পরই আবার ওরা রাতের রাস্তায় ফিরে আসবে। সমাজ করতে পারে না ওদের শাসন, রাষ্ট্র করতে পারে না ব্যবস্থা। অভাব নষ্ট করেছে ওদের স্বভাব।

দূর থেকে দেখলাম লস্কর বেচারার অবস্থা। হাত বাড়িয়ে ধাক্কা মেরে লাট্টুকে সরিয়ে দেবার দুর্বল চেষ্টা করল। কিন্তু ইঁদুরের মত চটপটে বাচ্ছার সঙ্গে পেরে উঠল না। সে ওর বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। মতলবটা খুব পরিষ্কার। লস্কর আবার ধাক্কা দিয়ে ওকে হটিয়ে দিল। তখন লাট্টু বো করে দিল ছুট। বোধ হয় বড় ছোকরাদের খবর দিতে গেল। মার ধোর করে কাপড় চোপড় জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়া যায় এমন লোকের শুধু খবরটুকু ওদের পৌঁছে দিলেই এখানে নাকি পাঁচশ থেকে হাজার লিরা বকশিষ মেলে।

দৌড়ে এগিয়ে গেলাম। এই বেলা বেচারী বিদেশীকে সমঝিয়ে দিয়ে আসি কি বিপদের মুখে ও এসে পড়েছে। সম্ভব হলে ওকে হাত ধরে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেব। কিন্তু অতদূর এগোতে হল না। সামনে কোথা থেকে হাজির হল এক বয়স্ক বখা। হাঁক দিল "তুমি কে বট হে? মতলবটা কি?"

মতলব যে খারাপ নয় তা বোঝাবার জন্য হাত দুটো পকেটে গুজে শান্তভাবে দাঁড়ালাম।

ওর গলার আওয়াজ শুনে এবার ভয় হল। ভীষণ স্বরে বলল,—পকেট থেকে হাত দুটো বের করে আন চটপট।

শান্তভাবেই জিজ্ঞেস করলাম,—কেন?

ও আর সময় নষ্ট করল না। সোজা একটা ক্ষুর নিয়ে তেড়ে এল। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল। এই নিশুতি রাতে দূর বিদেশে কোন লাট্টুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করা বা তার হাতে মান বা জান খোয়ানর দরকার হল না। আরেকজন লোক পাশের রাস্তা দিয়ে খটাখট বুটের আওয়াজ করে আসছিলেন। সে আওয়াজে দুঃস্বপ্ন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। জিজ্ঞেস করলাম, আমার হাত দুটো পকেটে ঢোকানতে ছোকরা তেড়ে আক্রমণ করতে
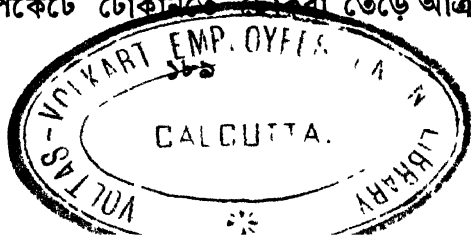
এল কেন। তিনি হেসে বললেন,—আপনি দেখছি নেহাৎ অনভিজ্ঞ এসব বিষয়ে। লুকোনো হাত মানেই লুকোনো হাতিয়ার।

আমিও হাসলাম—আর মাথার উপরে হাত মানেই বুক পকেটে হাত। অবশ্য বুকে নয় অর্থাৎ হৃদয়ে নয়।

খুশী হয়ে গেলেন ভদ্রলোক,—বাঃ, আপনি ত দেখছি বেশ রসিক। এত বিপদে পড়েও রসিকতাটুকু ছাড়েন নি। বিদেশ এসেছেন কি দেশ দেখতে, না শেষ হতে? ধনে, না হয় জীবনে।

উত্তরে জানালাম,—কোনটাই নয়। ইটালী দেখে গেছি তন্ন তন্ন করে। নিজের দেশের চেয়েও বোধ হয় ভাল করে। তবু দেশ শুধু দেখা নয়, তলিয়ে দেখার আশা এখনো মেটেনি। এই নোংরা নিঃঝুম গলিকেও তাই মনে হচ্ছে রোম্যান্সের রাস্তা।

উনি হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন,—যার সত্যিকারের দৃষ্টি আছে তার সে আশা বোধ হয় কোনদিনও মেটে না। সৃষ্টি হচ্ছে অনন্ত। দৃষ্টিও তাই অশেষ।

কথাগুলি যেন কেমন কেমন মনে হল। ভদ্রলোকের পরনে মামুলী পাৎলুন, পুরো হাতা সোয়েটার আর তোবড়ানো একটা ক্যাপ। কিন্তু মুখখানার সঙ্গে এ পোশাক তেমন খাপ খাচ্ছে না। কথাবার্তার সঙ্গে ত নয়ই।

একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।

ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করে বসলাম। পশ্চিমে আবার নাম ধাম পেশা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা চলে না। শিক্ষিত সমাজে অচল। তাই একটু বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলাম,—এই নিশুতি রাতে একা আপনি আসছিলেন এ হেন রাস্তা বেয়ে। আপনি কি সাংবাদিক?

উনি হেসে বললেন,—ঠিক তা নয়। যদিও খবরাখবরের জন্যই বেরিয়েছি। কিন্তু সত্যি করে বলুন ত? বিদেশী হয়েও একা এ হেন এলাকায় এসেছেন কেন?

কি পরিচয় দিই? যে কাজে এদেশে এসেছি, দেশে যে কাজ করি তার কথা এই পরিবেশে হয়ত বেমানান হবে। অন্ততঃপক্ষে আরো দুটো প্রশ্ন হতে পারে। বলে ফেললাম—আমি, আমি হচ্ছি একজন বিদেশী সাহিত্যিক।

মাথা হেলিয়ে সসম্মানে নমস্কার করে উনি বললেন,—দেখুন, আপনি তাহলে আমার নমস্কারের পাত্র। সাংবাদিক হচ্ছে সাময়িক আর সাহিত্যিক হচ্ছেন সময়াতীত।

বাধা দিলাম,—কিন্তু সৃষ্টির রস থাকলেই সাংবাদিক হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক। আপনার মনে আছে সেই রস। এখন বলুন ত কিসের খবরাখবর আপনি নিয়ে বেড়াচ্ছেন এই রাস্তায়? এই রাতে?

উনি আমায় কাছাকাছি একটা পড়ো বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বললেন—এইটে হচ্ছে আমার রাতের আস্তানা।

অচেনা লোক, অজানা জায়গা। চকিতে চোখ চালিয়ে দেখলাম দেওয়ালে ঝুলছে কালো পোশাক। রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রীর পোশাক আর সুন্দর একটি ক্রুশ।

বললাম—উহুঃ, আপনার দিনের আশ্রয় কিন্তু অন্যত্র। আপনি ধর্মযাজক। কথা আর কাজ দুয়েতেই।

উনি অস্বীকার করলেন না। হেসে বললেন,—আপনি ধরেছেন ঠিক। যাদের হাতে এখনি পড়তে যাচ্ছিলেন, তাদেরই আমি যাচ্ছিলাম ধরতে।

—কিন্তু পোশাক বদলালেন কেন?

—তার কারণ ওই 'স্কুগনিৎসি'রা সভ্য সমাজকে এড়িয়ে চলে। ওদের চোখে সব 'অর্ডারই' সমান—কিবা পুলিশ, কিবা পাদ্রী।

—এই রাতে যদি বা ওরা পাদ্রীর পোশাককে ক্ষমা করত, সাধারণ লোক হিসাবে আপনি রেহাই পেতেন কি করে?

—রেহাই ত চাই না, ভাই। হতে চাই সহায়। তাই ওদেরই

মত সাজে ওদেরই মত পথে হাঁটি। ওদের সঙ্গে চলি ফিরি, মিশে যাই। কখনো বিপদে পড়লে বিপথ থেকে ওদের আমার পথে এই আস্তানায় নিয়ে আসি। আস্তানা তখন হয়ে ওঠে আশ্রয়। আস্তে আস্তে ওদের লেখা-পড়ার, কাজ শেখানর বন্দোবস্ত করা হয়।

বলতে বলতে ভদ্রলোকের গলা একটু ভারী হয়ে উঠল।

—প্রশ্ন করলাম,—সে আশ্রয় ওদের ধরে রাখতে পারে কি? না, আবার পথে ভেসে যায়?

উজ্জ্বল দুটি চোখ সন্ধ্যাতারার মত সেই ম্লান আলোতে ফুটে রইল। একটু পরে মৃদু হেসে জানালেন,—সবাই ভেসে যায় না; যখন যায় তখন বুঝি যে এখনো আমি ওদের যোগ্য হয়ে উঠিনি। পরের দিন ভগবানের কাছে আরো প্রার্থনা করি যেন ওদের যোগ্য হতে পারি। যেন ওদের তাঁর পথে নিয়ে যেতে পারি।

মাথা নীচু করে বললাম—প্রার্থনা করি, এই রাস্তায় আপনি অন্তত সুখের সন্ধান পাবেন।

হেসে উনি উত্তর দিলেন—সন্ধান ত পেয়েইছি। এই হচ্ছে আমারো রোম্যান্সের রাস্তা।

যৌবন সরসী নীরে

রাতের ইয়োরোপের একটা নতুন নিবিড় পরিচয়ের ছবি।

না। না। আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। অনেক টুরিস্ট ইয়োরোপে গিয়ে রাতের যে ছবি দেখে আসেন, তা নয়। টমাস কুক বা অন্য কোন কোম্পানি দল বেঁধে তাদের বাসে চড়িয়ে রাতের কীর্তি দেখিয়ে দেয়। নাইট-ক্লাবের ক্যাবারে, নোংরা মেছোবাজারের নকল গুণ্ডা, ছোরা-বন্দুক নিয়ে ডুয়েল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সাজানো অভিনয়—এসব নগদ দক্ষিণা দিলেই দেখে আসা যায়। কিন্তু আমি বলছি অন্য কথা। অন্য জগতের কথা।

আপনার অঢেল টাকা থাকলে সবচেয়ে দামী হোটেল বা নামী নাইট-ক্লাবে ফ্লোর শো অর্থাৎ সেখানে যে জাঁকজমকে ভরা নাচ-গান হয়, তা দেখে আসতে পারেন। হয়ত কোন কোন জায়গায় শুধু টাকা দিয়েই টিকিট কেনা যাবে না। কোন সভ্য ইনট্রডিয়ুস না করিয়ে দিলে তার দরজা খুলবে না। তবু রুপোই হচ্ছে সেখানে আলিবাবার ওপেন সিসেম। পয়সায় কেনা সে সব রাতের কাহিনীও বলছি না।

তাছাড়া নাইট-ক্লাবের দিন, থুড়ি রাত, সাবাড় হতে চলেছে। অন্তত এই বলে দুঃখ করে সে-সব জায়গার কর্তারা। নিউ ইয়র্কের মণিকোঠা হচ্ছে মানহাট্টান। তার সেরা নাইট-ক্লাব ভ্যান গার্ড পর্যন্ত মিইয়ে যাচ্ছে। কথার উপর ট্যাক্স বসেনি; কিন্তু গানের উপর বসেছে; অনেক দেশে। কারণ গান-বাজনা হচ্ছে মজা, অ্যামিউজমেণ্ট। অথচ শুধু বাজনা হলে রেহাই আছে। তাই মানহাট্টান জাঁকিয়ে

বসেছে কাফে বোহেমিয়া, রেড কার্পেট। চলুন না সেখানে আর পাঁচ জনের মত।—থিয়েটার সিনেমা যখন শেষ হবে তার আমেজটুকু একটু বেশীক্ষণ চালিয়ে নিতে পারবেন! অথবা আসুন, কিছু কম দামের কিন্তু বেশী ফ্যাশনের হালের চালু মিউজিক রুমে।

আজকাল অনেকেই যায়। লণ্ডনে কোন দামী হোটেলে সিনেমা থিয়েটার ফেরৎ সাপার খাবার জন্য টেবিল রিজার্ভ করতে গেলে পাঁচ ছ' মাসের আগাম নোটিস চাই। একদিন অনেক রাতে দেখি যে, মেফেয়ার হোটেলের ম্যানেজার তাঁর চকচকে কালো রেশমের 'ফেসিং' দেওয়া খানার পোশাক পরে খুব হাসিখুশী হয়ে গোঁফ মোচড়াচ্ছেন। এত রাতেও এত তাজা খুশীভাবের কারণটা কি?

জিজ্ঞেস করতেই তিনি হেসে শুভ-সন্ধ্যা জানালেন। অবশ্য সুপ্রভাত জানালেই ঠিক হত। বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই ত রাত বারটা বেজে গিয়েছিল। তবু আমিও শুভ-সন্ধ্যাই জানালাম। জানতে চাইলাম, অত খুশীর বিশেষ কারণটা কি।

আহ্লাদে উপচিয়ে উঠে উনি একটা খবরের কাগজ আমার হাতে তুলে দিলেন। লাল পেন্সিলে একটা জায়গা বেশ মোটা করে চিহ্ন করা আছে। ব্যাপারটা বুঝলাম।

ক'দিন আগে নিউ স্টেটস্‌ম্যান অ্যাণ্ড নেশন নামে খুব ভাল নামী সাপ্তাহিকে একটা লেখা পড়েছিলাম। হালের সমৃদ্ধি আর সুখের স্রোতের বিরুদ্ধে এই মধ্যবিত্ত চিন্তাশীলদের মুখপত্র কলম নিয়েছে। লিখেছে যে পঁচিশ বছরের মধ্যে ওদের দেশে এত বেপরোয়া বেলেল্লা ফুর্তির বান কখনো ডাকেনি। এত বাজে শ্যাম্পেনের স্রোত আর ভেজাল ক্যাভিয়ারের (রাশিয়ার শৌখিন মাছের ডিম) স্তূপ দেখা যায় নি। লক্কা পায়রারা মাতাল পায়ের নীচে ভাঙা মদের গ্লাসের কাঁচ গুঁড়িয়ে ফেলছে—নাচতে নাচতে। সোসাইটি আবার টলতে টলতে পায়ে ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে

জনতাকে কলা দেখাচ্ছে। মুখ ভেংচিয়ে বলছে,—ইল্লি, বক দেখেছিস, মাইরি?

ম্যানেজারের হাতের কাগজে তারই জবাব বেরিয়েছে। তাতে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে যে, ওই জনগণের তথাকথিত মুখপত্রটিও নেহাৎ কম যায় না। বটে? তোমরা, ধর্মপুত্তুররা, তোমাদের সিলভার জুবিলীর সময় কি কাণ্ডখানা করেছিলে বলত, বাপধন? তোমরাও ত গায়ে গায়ে লেপটে-থাকা হল্লা-মাচানো বামপন্থী পলিটিশিয়ান আর পলিটিক্স-পন্থী মেয়েদের বালতি বালতি শ্যাম্পেন পরিবেশন করেছিলে? না, করনি? অবশ্য সমাজের সবচেয়ে উপর তলার লোক তারা নয় বটে। কিন্তু, মশাই, শুধোতে পারি কি যে এই গলাকাটা ট্যাক্সের বাজারে উপর তলাটা আর উপর তলা রইল কোথায়?

কোটের বুকের ফুটোয় গুছিয়ে গোঁজা কার্নেশন ফুলটাতে মরমী ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে ম্যানেজার বললেন,—ওঃ, কি দিনই দেখেছি আমার যৌবনকালে। আপনিও তখন এদেশে ছিলেন নিশ্চয়ই। অবশ্য বেচারী ছাত্ররা আর কতটুকু দেখতে পায়। এই মেফেয়ার পাড়াকে পাড়া আলোর আগুনে যেন লাল হয়ে উঠত। মন-ভোলান সুরভিতে বাতাস হয়ে উঠত ভারী। আর বসন্ত-কালের নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেঙে দিত শুধু শ্যাম্পেনের বোতল খোলার আওয়াজ। ছিপি ত নয়, যেন ঝাঁঝে-ভরা বুলেট গুলি। আহা, কি সুদিনই না ছিল!

হেসে বললাম—সে সুদিন ত আবার ফিরে এসেছে। এই ত এই মাত্র টেলিভিসনের বিশেষ প্রোগ্রামে দেখলাম 'পিগালে' ক্যাবারের পিঙ্ক শ্যাম্পেন।

তারিফের সঙ্গে একটা মুরুব্বিয়ানা ভাব ফুটিয়ে তুললেন ম্যানেজার তাঁর গোঁফ-জোড়াতে।—ওহো, আপনি 'পিগালে'র ফ্লোর শো দেখেছেন

টি-ভি-তে (টেলিভিসনে)? চলুন, কাল রাতে সশরীরে দেখে আসবেন।

পিকাডিলিকে ফরাসীতে বলে পিগাল। পিকাডিলির বুকের ওপর এই পিগাল প্রমোদ-ভবনে যা নাচ-গান-ক্যাবারে হচ্ছে তার নাম হচ্ছে পিঙ্ক শ্যাম্পেন। শুধু শ্যাম্পেন নয়। সুখের পর সুখে এমন নেশা চড়ে গেছে যে সিঁদুরে শ্যাম্পেন না হলে আর শানায় না।

সারা ইয়োরোপ থেকে সুখের পায়রারা জমা হচ্ছে লণ্ডনে। ভদ্রতার আটসাঁট পোশাক পরা রক্ষণশীল ইংরেজের দেশেই নাকি আজকাল ইয়োরোপের সেরা রূপসী আর লক্কা পায়রারা হাজির হচ্ছে।

কিন্তু সে তো হচ্ছে ব্যবসাদারী ব্যাপার। শুধু রেস্তওয়ালা গণ্ডির মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। তবু জনতার মনের খোরাক জোগাবার জন্য সে ব্যাপারের ছবি টেলিভিসনের মাধ্যমে বাইরে দেখান হয়। যা সবাই দেখছে পাইকারী ভাবে, এমন কি ঘরে বসেই দেখছে, তা দেখে কিন্তু কেমন যেন পুরো আশ মেটে না।

হায়, এই নিদারুণ বৈশ্যযুগে সবই ত ব্যবসার ছাঁচে ঢালা। এই যে সেদিন মোনাকোর প্রিন্সের বিয়ে হল, তা তো সারা ইয়োরোপের লোক নিজেদের ঘরে বসে দেখেছে। হলিউডের চিত্র-তারকার সঙ্গে বনেদী রাজপুত্রের বিয়ে। তার ছবি দেখবার জন্য, তাদের দু'জনের অন্তরঙ্গ রঙ্গরস জানবার জন্য সবাই পাগল। মোকা পেয়ে ব্যবসাদার টি. ভি. বিশ্বজনকে তার সরেজমিনে তোলা সবাক ছবি দেখিয়ে দিল। রাজপুত্রও কিছু রূপকথার রাজপুত্তুর নন যে ছায়াপথের তারার মাথায় শুধু মুকুট পরিয়েই তৃপ্ত হবেন। সওদাগরপুত্র তার মনেও বাসা বেঁধেছে। অতএব টি. ভি. কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা দক্ষিণা আদায় করে নিলেন।

কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি জল-জ্যান্ত মানুষকে। তার রাতের আনন্দ, ফুর্তির ফোয়ারা কোথায় তা হাতে হাতে দেখতে চাই। পয়সা

দিয়ে কেনা নয়, হৃদয় নিংড়ে আনা সুখের খবরটুকু চাই। ওদের সামাজিক পার্টি, বড়দিনের সপরিবারে মিলন, ছুটিতে অবসর কাটানো—সে সব তো হল নিজেদের মধ্যেকার ঘরোয়া সুখ। কিন্তু আটপৌরে কারবারের বাইরেও তো একটা জগৎ আছে। সংসারের বাইরের বিহার।

তার খবর বিদেশীর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। সুলুক-সন্ধান মিলতে পাবে; কিন্তু তার মধ্যে সেঁধানোর পথ নেই। এমনিতেই লণ্ডন হচ্ছে আলাদা আলাদা দ্বীপের মত কামরা অর্থাৎ অ্যাপার্টমেণ্টে ভরা শহর। তার কোন কেন্দ্র নেই, নেই পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ। ধনী আর বিলাসীব মেফেয়ার আর শিল্পী-সাহিত্যিকের চেলসী, ব্যবসাদারের সিটি আর নোঙবছেঁড়া পাঁচমিশেলীদের সোহো একেবারে আলাদা জগৎ। যে যার নিজের দল খুঁজে সেখানে ভিড়ে যায়। একবার বোমে একটা পার্টিতে দেখলাম মেঝের কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক। একটি চিত্রকর আর একটি মেয়ে কবির সঙ্গে তুমুল আলোচনা চালাচ্ছেন। আমিও যোগ দিলাম। কিন্তু একটু পরেই জানতে পারলাম যে, এই মাটিতে পা ছড়িয়ে সাধারণ আমাদের সঙ্গে বসে তর্কে মজে যাওয়া লোকটি আর কেউ নন, স্বয়ং একজন খাঁটি নীলরক্তওলা ডিউক। এই ছোট্ট পার্টির বাইরে কোটিপতির মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে তিনি মাটিতে বসে জমিয়ে তুলছেন আসর—চরণমাঝি সম্বল লোকদের সঙ্গে।

লণ্ডনে এটা ভাবা যায় না। ডিউক শুধু ডিউকদের খুঁজবে আড্ডার জন্য। আর দেবুতাঁতদের খুঁজবে নাচের জন্য। চড়া মদ আর চড়াতর খরচে ডুবে থাকলে সমাজে হবে নাম। যুদ্ধের চাপে আর ট্যাক্সের তাড়ায় ওদের স্বভাব কতটুকু আর বদলিয়েছে?

* * *

তা কিছু বদলিয়েছে বই কি! বহুদিনের পুরোনো বন্ধু 'ই' নেমন্তন্ন করলেন। সেই বছর পঁচিশ আগে ইটন স্কুল থেকে এসে ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়তে বসেছিলেন। বিলেতের সবচেয়ে অভিজাত স্কুল হচ্ছে ইটন আর হ্যারো। ওদের সবচেয়ে সফল নেতা আর নামকরা লোকরা ইটন আর হ্যারো থেকে তৈরি হয়েছে। কথাতেই বলে যে, ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জেতা হয়েছিল ইটনের খেলার মাঠে।

সেই ইটনিয়ান বন্ধুর নামটা না-হয় নাই করলাম। শুধু 'ই' বলেই তাকে ডাকি। সে দিচ্ছে একটা নিশুতি রাতের পার্টি। নীল রক্তের ছোঁয়াচে ভরা ওয়েস্ট এণ্ডে নয়। গরীব জনতার পাড়া ইস্ট এণ্ডে। অবশ্য কলকাতার মত গরীব বা নোংরা মোটেই নয়। তবু ওদের তুলনায় জমিন-আশমান ফারাক।

'ই' বললেন,—চল, তোমায় আমাদের একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে যাব। গেট আণ্ডার আওয়ার স্কিন। আমাদের গায়ের চামড়ার নীচে সেঁধিয়ে সব দেখতে পারবে। আর মজা হচ্ছে যে, একটা আফ্রিকান ঢাক-বাজানোর দল ভাড়া করেছি। পূব পাড়ার দোতালায় একটা ফ্ল্যাট। কোন আসবাবপত্র নেই। নেই ফর্মালিটি। যে যার নিজের বোতল নিয়ে আসতে হবে।

আহ্লাদে নেচে ওঠার অবস্থা। 'ই'-কে শুধু ধন্যবাদ দিলেই হবে না। মনের খুশীতে ওকে একটা বকুল গন্ধের সেণ্টের শিশি দিলাম। এই পার্টিতে যারা আসবে তাদের আমার দেশের বকুল সেণ্ট মাখিয়ে দিয়ো। সুরার বদলে নিয়ে এলাম সুরভি।

'ই' বললেন যে, তাঁর ইচ্ছা আছে যে এটাকে একটা পাকা-পোক্ত ক্লাব হিসাবে দাঁড় করাতে হবে। ব্রেকফাস্ট ক্লাব। মাঝরাতে এসে আমোদ-আহ্লাদ করে সকালের নাস্তা পর্যন্ত থাকবে সবাই। তারপর

ভোরে যখন নেশা যাবে ছুটে আর ছুটি যাবে ফুরিয়ে, তখন সবাই ফিরবে যে যার ঘরে বা কাজে। কিন্তু সব কিছু চাই নিজেদের চেনা জগৎ থেকে পৃথক। যত অজানা ততই মন-টানা। নূতনের অভিসারে নবীনের অভিষেক।

'ই'র মোটর এসে থামল একটা সারি সারি ফ্ল্যাটওলা পুরোনো বাড়িতে। তার উঠোন থেকে ঘোরান লোহার সিঁড়ি দিয়ে পাক খেয়ে দোতালায় উঠলাম। 'ই' সবাইকে বারণ করে দিলেন যেন খুব জোরে নাচা না হয়। কাঠের মেঝেটায় পালিশ দিয়ে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে বটে, কিন্তু ওটা এত পুরোনো যে বেশী ধুম ধাড়াক্কা করলে ভেঙে নীচে পড়ে যেতে পারে।

সবার সঙ্গে পরিচয় করা শুরু হল। ওদের বেশ গুটিকয়েক একেবারে নীলরক্ত-ওলা লর্ড, লেডীর আর লর্ডদের মেয়ে ছিলেন। আর ছিলেন একটি মেয়ে, মহিলাই বলা যাক, যার বাবার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। আর এসেছিলেন নতুন বড়লোকদের মেয়েরা। সমাজে তাঁরা নতুন ঢুকছেন। রূপ আর রূপো এই দুই পাসপোর্ট নিয়ে। রাণীর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে কুর্নিশ করলে তাঁদের জীবনের স্বপ্নের সিংহদ্বার পার হয়ে আসতে পারবেন। তার আগে পর্যন্ত হাত পাকাতে হবে এই সব নীল নেশার বৈঠকে।

একজন বিখ্যাত বনেদী লর্ডের মেয়ে বকুল গন্ধে আকুল হয়ে উঠলেন। মুখে মুখে কবিতা রচনা শুরু হয়ে গেল। ঠিক কবিতা নয়, গীতি-কবিতা। আফ্রিকান ব্যাণ্ড-পার্টির একজন এতে মজা পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার গীটারে তুলল সুরঝঙ্কার। গীতি-কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। তার তালে তালে নাচতে শুরু করল সবাই। হ্যাঁ, সবাই। কবিতার কথাগুলো হয়ত কেউ কেউ ঠিকমত শোনেইনি। মনে নেই কারো। কিন্তু খেই ধরিয়ে দিয়েছে গীটার। ওই খেইটুকুই ওদের কাছে যথেষ্ট। সুরভিই তো সৃষ্টি করেছে তার সুর।

সেই মেয়েটির পরনে খুব মামুলি পোশাক। দূরের কথা ইভনিং গাউন; স্কার্ট পর্যন্ত পরেনি। শুধু সে কেন, প্রায় সব মেয়েরই পরনে পাৎলুন আর সোয়েটার। ছেলেরা পরেছে গোড়ালীর উপর পর্যন্ত খাটো পাৎলুন আর জেলেদের জার্সি। একজন যুবকের গায়ে মোটর-সাইকেল-আরোহীদের মত চামড়ার জার্কিন। কিন্তু তার কলারে লাগানো আছে লোম অর্থাৎ ফার। তাই নিয়ে তাকে কি ঠাট্টাই না করল। বেচারার গায়ের চামড়ার নীচে নীল রক্ত আছে। কিন্তু উপরে লাল রঙ লজ্জায় টস টস করতে লাগল।

নাম বটে ব্রেকফাস্ট ক্লাব। কিন্তু নাস্তাব চেহারা দেখা গেল না। শুধু গলা ভিজিয়ে আর মন রাঙিয়ে অতক্ষণ নাচা চলে না। শেষ পর্যন্ত একটা চাকায় চড়ানো টেবিল ঠেলে উঠোনের মধ্যে নিয়ে আসা হল। কিন্তু খাবার কই? কই ফ্রেঞ্চ ককটেল, সসেজ আর রাশিয়ান ক্যাভিয়ার? এ যে শুধু মামুলী রুটি আর হট ডগ। তারি সামনে লম্বা লাইন লেগে গেল।

মোটে ত দুটি ছোট্ট ঘর। আর ছেলেমেয়েতে গিসগিস করছে। তাদের দাপাদাপিতে মেঝেটা ক্যাঁচকোঁচ করে গোঙাতে লাগল।

সামনে একফালি বারান্দা। একেবারে রাস্তার উপর ঝুল-বারান্দা। সেখানে কয়েকজন এসে ঠাণ্ডা বাতাস খেতে লাগল। কয়েকজনের তাতেও কুলোল না। রেলিং আর পাইপ বেয়ে ন্যাড়া ছাদের উপর চড়াও হল।

এদিকে ততক্ষণে অন্য অন্য ফ্ল্যাটের লোকরা এসে জড় হয়েছে। গরীব লোক। ওদের দেশের হিসাবে অবশ্য। সামান্য কাজ করে, হয়ত করে দিন-মজুরী। কিন্তু ওদেরও জীবন-যাপনের মান কতখানি নীচে নামতে দেওয়া হবে তার হিসাব বাঁধা আছে। আর সে হিসাবটা খুব নীচু নয়। ওরাও ভিড়ে গেল এই নাচে। না-হয় ক্লাবের সভ্য নয়। কিন্তু অসভ্য তো নয়। আর আনন্দের ডাকে সাড়া দেবার

সময় থাকে না ভেদাভেদ। বারোয়ারী তলার সাম্যবাদের পশ্চিমী চেহারা।

কিন্তু এত হৈ-হুল্লোড় পাড়ার কারো কারো ধাতে সইল না। ওরা নিজেদের বাড়ির জানলা খুলে আপত্তি করতে লাগল। 'ই' তাড়াতাড়ি সবাইকে ফুর্তির মাত্রা একটু কমাতে বললেন। কে একজন হঠাৎ একটা প্রস্তাব করল যে, যারা চেঁচিয়ে আপত্তি করছে তাদের জানিয়ে দেওয়া হোক যে আমরা একজন বিদেশী অতিথিকে সম্মান দেখাবার জন্য জড়ো হয়েছি। তাহলে ওদের আর আপত্তি থাকবে না। ওরা বুঝে নেবে যে এই পার্টিটার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

'ই' অবশ্য অত কাঁচা ছেলে নন। চোখ টিপে আমার দিকে ইশারা করলেন। আমিও বুঝলাম। তারপর বললেন যে, তাদের সম্মানিত অতিথি হয়রান হয়ে পড়েছে। রাতও হয়েছে অনেক। ভোর হবার আগেই আসর ভাঙলে ব্রেকফাস্ট ক্লাবের মানরক্ষা হবে। কারণ, কোন ব্রেকফাস্টেরই জোগাড় হয় নি আজ।

ভোরের পাখীর মত কলকাকলী করতে করতে দেবুতাঁত মেয়েরা আর ছেলেরা ক্লাবের সামনের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা মোটর বের করে নেওয়া মহা মুশকিল। সারা রাত ঠাণ্ডায় এঞ্জিনগুলো বরফ মেরে গেছে। কোন রকমে তাদের গরম করে চালু করবার সময় আরো মুশকিল। পোড়া পেট্রলের গন্ধে আর ধোঁয়ায় গোটা পাড়া অস্থির। ধোঁয়ার আড়ালে মোটরগুলো গজরাতে গজরাতে মিলিয়ে যেতে লাগল। ঠিক যেমন করে পাড়া-পড়শীদের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তাদের চড়া রাগ ঠোঁটে এসেও মুখে মিলিয়ে গিয়েছিল। শুধু মিহি আপত্তি করেই ওরা ক্ষান্ত হয়েছিল।

পরের দিন ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেখলাম লণ্ডনের একটা খুব বড় কাগজে মোটা হরফে এই ব্যাপারটা ফাঁস করে দেওয়া

হয়েছে—"দেবুতাঁতস্ অ্যামং দি ডাস্টবিন্‌স্"। নোংরার টুকরিগুলোর মাঝখানে সমাজের নবীনা তরুণীরা।

আমি কিন্তু সে কথা মানি না। ওরা যখন আমার পরিচয় চেয়েছিল, শুধু নামটুকু ছাড়া আর কোন কিছু জানাইনি। তবু জানতে চেয়েছিল। 'ই'র ভারতীয় বন্ধু নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কাজে এদেশে এসেছে। তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কিন্তু আমার একটা বাধা ছিল। মানুষেব পোশাকী পরিচয় দিলেই হয়ে যায় চারপাশে সীমারেখা টানা। যত অজানা, তত অসীম।

তাই হেসে সে সব প্রশ্ন এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আউড়ে গিয়েছিলাম। তার ইংরেজী তর্জমাও করে দিলাম মুখে মুখে।

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
কী তোমার নাম
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়
হাসিতে তোমার পরিচয়।

হাসির মধ্যে পরিচয় হল ওদের সঙ্গে। আমার আবৃত্তি, বকুল গন্ধ ওদের কাছে অজানার পরশ এনে দিল। তাতেই ওরা খুশী। ফুলের মতই নির্মল খুশীতে ওরা দোলাল মাথা, গাইল গান, মাতল নাচে। ওরা কি কখনো নোংরার টুকরির কাছে আসতে পারে সেই পরিবেশে? সেই আনন্দের অম্লান লগ্নে?

ভোর বেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি। আমি নিজেও একদিন ওই-বয়সী ছিলাম। সেই বয়সের হাসির উচ্ছ্বাস দিগন্তকে এখনো

ক্ষণে ক্ষণে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। সারা পশ্চিমের তারুণ্য পয়লা মে বসন্ত-উৎসবে মেতে উঠবে। আমেরিকা আর ক্যানাডাতেও। এই ভোরবেলাই শুরু হবে সেই উৎসব।

স্মৃতির ঢেউয়ে ঢেউয়ে উজান বেয়ে কোথায় চলে এলাম। যৌবন সাগর থেকে জোয়ার আসছে প্রাণগঙ্গায়। এ তো টেম্‌স্‌ অর্থাৎ তমসা নদী নয়, গঙ্গা। আমার কৈশোর জীবনের সুরধুনী গঙ্গা।

আজ অবশ্য সে গ্রামখানার নামও মনে নেই। উত্তর ইংলণ্ডে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে ছুটি কাটাচ্ছি। ছেলেমেয়েরা রাশি রাশি তাজা সবুজ লতাপাতা, নানা রঙের ফুল জড় করছে ভোর থেকে। ভিলেজ কমন অর্থাৎ গাঁয়ের বারোয়ারী ময়দানে একটা গাছ পোঁতা হয়েছে। ইংরেজীতে বলে মে-পোল। কিন্তু তাকে বাংলায় কি নাম দেব? বসন্তের ধ্বজা? তার চারপাশে বাঁধা হয়েছে রঙীন কাগজের ফিতে, শিকলি। পরস্পরের উল্টো দিক থেকে দুটো বৃত্ত টানা হয়েছে ফিতে দিয়ে। তাতে বেশ বাহারের নানারকম নক্সা তৈরি হয়ে গেল। মালা টাঙানো হল গাছে, পরানো হল নিজেদের গলায়। এবার ওরা ফুল আর মালা নিয়ে গাইতে গাইতে সবার বাড়িতে যাবে। সবাইকে দেবে বসন্তের আগমনীর বাণী। এই উৎসবের খরচের জন্য কিছু কিছু চাঁদা পাবে। গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়ে চাঁদা নেবে।

আমার 'ইন্‌' অর্থাৎ সরাইখানার দোতালার ঘরের মধ্যে এর পরে আর কি করে নিজেকে আটকিয়ে রাখি? সোজা নেমে এলাম ওদের মাঝখানে।

ওদের হৃদয়ের মাঝখানে। সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে মে-কুইন করা হয়েছে। তার মাথায় ফুলের মুকুট, কণ্ঠে রুপোলী সুরের ঝর্ণা। তার সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে সবাই গাইছে। আমি গাইতে পারি না। তবু গলায় সুর নেই দেখলে ওরা ভাববে যে মন খুলে ওদের সঙ্গে মিশতে পারছি না।

এস মে-পোল পাশে
নব মুকুল হাসে ;
নাচো খুশীতে নাচো,
বাঁচো জীবনে বাঁচো।

সামনের পরীক্ষাটার কথা ভুলতে পেরে বেঁচে গেলাম।

'মরিস' নাচ হচ্ছিল মে-পোলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে। দূরে একটি তরুণ শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে মনে হল। ভাবলাম বেচারা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঘুমোনোর সময় তো পরে অনেক পাবে। এখন ওকে তুলে দিই। ওর দিকে যাচ্ছি এমন সময় আরেক জন বাধা দিল। না, না, ওকে জাগাবেন না। ও হচ্ছে ফরাসী। এই গাঁয়ের একটি মেয়েকে ও ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু মেয়েটির দিক থেকে কোন সাড়া নেই। ফরাসী মে উৎসবের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, প্রণয়ীরা এরকম অবস্থায় ঘুমের ভান করে মাঠে শুয়ে থাকে। যদি মেয়েটি সত্যি ভালবাসে তাহলে ওকে চুমু দিয়ে ঘুম ভাঙাবে।

—যদি ঘুম ভাঙায় তাহলে সংসারের চোখে কি ওরা জুড়ে যাবে ?

—হঁ্যা। পুরোনো নিয়মে তাই বলে। তাহলে ওরা ওই সরাইখানায় একসঙ্গে যাবে। তার পর মে-পোলের তলায় এসে নাচের নেতা হয়ে যাবে। নাচতে নাচতে নিজেদের বিয়ের সম্বন্ধ ঘোষণা করবে।

হাসতে হাসতে মন্তব্য করলাম,—তাহলে এই বিয়েতে বেস্ট ম্যান হবার একটা আশা আমার রইল মনে হচ্ছে।

সে-ও হাসিতে যোগ দিল। আরো সবাই হেসে উঠল কথাটা শুনে। একটি মেয়ে বলে উঠল,—আগেকার দিনে তো মে-ব্রাইডগ্রুম অর্থাৎ মে উৎসবের বর সাজানো হত একজনকে। দাও না সবাই মিলে আমাদের নতুন-চেনা বন্ধুকে বসন্তের বর বানিয়ে। আপত্তি আছে আপনার ?

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। কে কনে হবে জানতে চাইলাম। বললাম,—বর সাজা নির্ভর করছে বসন্তের কনে কে হবে তার উপর।

চট করে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে একজনকে টেনে বের করে আনল,—এই মেয়েটি; এই লুসী আজ ভোরে সূর্য উঠবার আগে মে মাসের শিশিরে নিজের মুখ ধুয়েছে। তাতে ওর রঙ খুব সুন্দর তাজা থাকবে সারা বছর, আর ভাগ্য খুলে যাবে। এই লুসী, এদিকে আয়।

হঠাৎ মনে হল প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মানস-কন্যা লীলাচঞ্চলা সেই লুসী গ্রে নাকি? হাল্কা পায়ে নাচতে নাচতে লুসী মে-পোলের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। জড়িয়ে ধরল মে-পোলটাকে। হাসতে হাসতে আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই আনন্দের ছবিটি। ভোরের শিশিরে ধোয়া শিউলি। তার শুভ্র হাসি দিয়ে একটা পরিহাসকে শুভ্রতর করে তুলল।

আজ এই মেফেয়ার পাড়াতেও মে উৎসব হচ্ছে। হচ্ছে ইউনিভার্সিটির পাড়া ব্লুমসব্যারিতে। আর হচ্ছে শেফার্ডস মার্কেটে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে উৎসব হবে তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে। তার চেয়ে বরং শৌখিন আর বনেদী পাড়ার উৎসবের বেশটা দেখে আসি জনতার বাটে রাখালিয়া হাটে যা হবে তার রূপ। সারাদিন কাজের পর একটুখানি সন্ধ্যায় তার চেয়ে বেশী সময় নেই! এই ছুটো উৎসব দেখতেই রাত হয়ে যাবে।

মরশুমের প্রথম বড় চ্যারিটির জন্য হচ্ছে মেফেয়ারের উৎসব। দেবুতাঁতদের ড্রেস শো। মেয়েরা বসন্ত আর মধুর গরম ঋতুর নতুন ফ্যাশনের পোশাক পরে সবার সামনে আসছে। লোকে ঠাসাঠাসি একেবারে। চ্যারিটিতে দান করা হবে জানলেই এদেশে ভিড় জমে

যায়। তার উপর দেশের সব চেয়ে বড় বড় ঘরের সবসে সেরা সেরা সুন্দরী মেয়ে। যারা এবার নতুন সমাজে বেরোবে তারাই এই পোশাক পরে দাঁড়াবে। তার উপর যে উৎসব। হাসিতে খুশীতে বেশেতে ভূষাতে ঋতুরাণী এসে উদয় হবেন। ধরাতলে রূপসী কে সকলের চেয়ে? সেই প্রশ্নটির যদি উত্তর চান ত লেডি ক্যাডোগানের মজলিসে আসুন। অবশ্য দক্ষিণাটা অপব্যয় হবে না। চ্যারিটিতে যাবে।

সুঠাম তনুলতাগুলি যেন এক একটি রজনীগন্ধা। মোটে বারটি মেয়েকে নামান হয়েছে—দেশের বাছাই-করা ধনীঘরের রূপসী মেয়ে। রূপ আর রুপোর জয়-জয়কার।

টুক টুক করে পরীর মত লঘু চরণক্ষেপে একটি করে মেয়ে সামনে আসতে লাগল। শিল্পীর স্টুডিয়ো বা পোশাকের দোকানে যারা মডেল হয়, তারাও বোধহয় এমন সুন্দর ভাবন নিয়ে উদয় হতে পারে না। বন্ধু, ভক্ত, আত্মীয়স্বজনরা খুশী হয়ে হাততালি দিচ্ছে। লোকের নজরে প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। চারদিক থেকে কাগজের ছবিওলারা বিজলী বাতির চমক জাগিয়ে ছবি তুলে নিচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েদের মুখের ভাবে চাল-চলনে এতটুকু খুঁত নেই। নেই এতটুকু সহবতের ব্যতিক্রম। প্রথম মেয়েটি এল—দু'হাতে দস্তানা; মাথায় খাটো ছাতা আর গলায় ফুলের কুঁড়ির মালা। দাঁড়াল একটা ফুলন্ত চেরীগাছের তলায়। বাসন্তী রঙের ছাতাটি সরাবার সময় বাঁ হাতের দস্তানাটা খোলা বোধ হয় নিয়ম ছিল। সেটা সে খুলতে ভুলে গেল। আমার পাশে দাঁড়ান একজন কন্টিনেন্টাল ভদ্রলোক বললেন— এই ভুলটাই হয়েছে ভাল।

জবাব দিলাম—নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে। দাঁড়াব ফুলে ফুলে ভরা মুকুল গন্ধে ধৈর্যহারা চেরীর তলায়। চেরীর হাসির মাঝখানে। সে হাসি যদি আমায় ভাসিয়ে নিয়ে না গেল, ভুলিয়ে না দিল আদব-কায়দা, তাহলে চলবে কেন? এমন সময়ে ভুলটাই ঠিক।

এক রকমের কথা আমিও ভাবছি দেখে তিনি খুব উৎসাহ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—গিয়েছেন আপনি কখনো কোন কণ্টিনেণ্টাল মে উৎসবে?

জানালাম যে গিয়েছিলাম। তবে সম্প্রতি নয়। বছর তেইশ-চব্বিশ আগে। তখন চোখে ছিল রঙীন চশমা। তাই রঙীনকে আরো বেশী রঙীন হয়ত মনে হয়েছিল। তবু যা দেখেছি, তার কথা ভুলব না।

দেশে থাকতে অমর জার্মান কবি গ্যেটের রচনা পড়ে মজেছিলাম। ভেবেছিলাম যে 'ফস্টাস' পড়ে মুগ্ধ হলেই চলবে না। সেই নাটক-খানার পটভূমিকা যেখানে সেখানকার হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে হবে। তাই গিয়েছিলাম হার্জ পর্বতমালার অঞ্চলে। মে উৎসবের বর-বধূর অভিনয় আর পল্লীনৃত্য ছাড়াও দেখেছিলাম দেবদেবী আর পরী-অপ্সরীদের পোশাকী নাচ আর খুশীতে-ফেটে-পড়া নকল লড়াই। কে যে কত খুশী, তার প্রমাণ দিতে হবে হৈ-হল্লা করে। তাই হচ্ছে সে সময়কার ব্যাটল-ক্রাই—যুদ্ধের রব। শীতকে হারিয়ে "আওল ঋতুরাজ বসন্ত"।

কণ্টিনেণ্টাল বললেন,—যাই বলুন, এরা ইংরেজরা আমাদের কণ্টিনেণ্টালদের মত উল্লাসে মাততে পারে না। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে না।

আমি কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

আমি ততক্ষণে তন্ময় হয়ে দেখছি আরেকটি শোভাযাত্রা। সরকারী কনফারেন্সের দৌলতে আমার নতুন পরিচিত এক শিল্পপতির মেয়ে আসছেন বধূ সেজে। সাদা সাটিনের বধূবেশ, মাথায় সাদা হর্থন ফুলের মুকুট। তার পোশাকের বিরাট লম্বা আঁচল সামলাতে সামলাতে রাজহংসীর মত আসছেন একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। মেয়েটির মুখের হাসি ও বুকের আশা চিরকাল অম্লান থাকুক।

*   *   *   *

এদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়ায় রাখালিয়া হাটে ততক্ষণে আসর জমজমাট। একেবারে রাস্তার ফুটপাথের উপর টেবিল-চেয়ার সাজান। তাতে বসে দুনিয়ার শিল্পী, রসিক আর সমজদারের দল। কিন্তু কেমনতর পোশাক পরে এসেছে এই উৎসবের কুশীলবরা? বুঝলাম, ঘড়ির কাঁটা দুশো বছর পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে খুব মজাদার অধ্যায় ছিল রেস্টোরেশন পিরিয়ড। ক্রমওয়েলের নীতিবাগীশ শাসনে লোকের প্রাণ আই-ঢাই করছিল। তার পর রাজা এলেন সিংহাসনে আর নীতিবাগীশের সংযমের বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল ফুর্তির জোয়ার। সেই সময়কার ছবি।

মেলার মধ্যে মেয়েদের ভিড় বেশী। অভিনয়ে তাদেরই বেশী পার্ট দেওয়া হয়েছে। চারদিকে ল্যাভেণ্ডার ফুলওয়ালী, কমলাওয়ালী প্রভৃতি সেজে বেড়াচ্ছে মেয়েরা। আমার ফুল লেবে গো। চাই প্যান্সি, পোসী, কার্নেশন ফুল।

আমি একটা মিষ্টি দেখে ল্যাভেণ্ডার কিনলাম। যে মেয়েটি বিক্রী করল সে দুঃখ করল,—যখনি কারো টেবিলে গিয়ে বলি, মিঠে খসবুইয়ের ল্যাভেণ্ডার লেবে গো, লোকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। যেন শুনতেই পায় নি। কিন্তু খরচ না করলে মেলা চলবে কি করে? আমরা যে কাজকর্ম ছেড়ে সবাইকে একটু আনন্দ দিতে এসেছি, আমাদেরই বা মন ওঠে কেমন করে?

ঠিকই ত। দুঃখ হল বেচারীর জন্য। আমারই মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে এরা। এদের ব্যথা বুকে বেশী করে বাজে বৈকি! পারলে ওর পুরো ডালাটাই কিনে নিতাম।

যে মেয়েটি রেস্টোরেশন যুগের সাজে সেজে আপেলের টুকরি নিয়ে ঘুরছিল, সে অভিযোগ করল,—দেখুন তো এত সুন্দর সুন্দর আপেল, মরশুমের নতুন ফল। এর সঙ্গে একটা নতুন গান যদি বেঁধে দিত কেউ, তাহলে চমৎকার হত। দেবেন আপনি একটা লিখে? ভারতীয়রা কবি হয়। ট্যাগোর…।

রাস্তার ওই ফুটপাথে একদল মার্কিন টুরিস্ট ক্যামরা নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি যুগল। তারা রেস্টোরেশন যুগের রাজা দ্বিতীয় চার্লস আর তার রক্ষিতা সুন্দরী নেল গুইন সেজে বসে আছে। দোকানদার, কাফের মালিক, চ্যারিটির কর্মকর্তারা—সবাই হৈ-চৈ করে মেলা জাঁকিয়ে তুলেছে। সে সময়কার পোশাক পরে আঁটসাঁট সাজে নরনারীর দল তরজা আর হাফ-আখড়াই গোছের গান গাইছে। খুশীতে লুটিয়ে পড়ছে। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে আমার কানে বাজতে লাগল—"ভারতীয়রা কবি হয়। ট্যাগোর…।"

নাঃ! এখন সোজা নিজের ঘরে ফিরে যাব। অজানার টানে এসেছিলাম। অচেনাদের মাঝে। সেখানে একজন মনকে টেনে আনল ঘরের দিকে। যার রচনায় আপন ঘরেই বিশ্ব নিখিলকে পেয়েছি তাকে মনে করিয়ে দিল। সেই আনন্দের রেশটুকু মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করছে। নিরালায় নিজের ঘরে তা উপভোগ করতে চাই। ভরা মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

রাতের খবরের কাগজটা সামনেই পড়েছিল। বড় বড় হেডলাইন ছাপা রয়েছে। সেদিক থেকে চোখ ফেরান অসম্ভব। মে দিবস। মে ফেয়ার নয়। ভল্গা থেকে ইয়াংসিকিয়াং, সীন থেকে রিভার প্লেট পর্যন্ত দেশে দেশে মজদুর জাগরণ হয়েছে। তাদের লম্বা মিছিল, সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ, নেতাদের গরম হাঁকডাক আর বিশ্বকে শোনান বাণী আজকের মে ফেয়ারকে ঢেকে দিচ্ছে। মানুষের আর মে উৎসব করার সময় নেই। দাবি দিবস তার ঠাঁই নিয়েছে।

সাধারণ মানুষের হয়েছে নবজন্ম। নূতন জাগরণ। তার দাবি আজ মানতেই হবে। তার দাম এখন বাড়াতেই হবে। হাতির দাঁতের তৈরি মিনারে বসে শুধু যদি আকাশের দিকে, ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকি—সে মিনার যাবে ধ্বসে। নতুন জাগা মানুষের আগুন-ভরা নিশ্বাসেই যাবে ছাই হয়ে।

সব জানি। সব মানি। তবু একটু ক্ষণের জন্য খবরের কাগজ থেকে নজর সরিয়ে নিলাম। ভারতীয়রা কবি হয়। ট্যাগোর…

সঙ্গীত, সুরা আর স্মৃতি

প্রেয়সীকে মনে মনে বারতা পাঠাচ্ছি।

লিখলাম—তোমার সঙ্গে যখন দশ বছর একসঙ্গে থাকি, মনে হয় মোটে দশ ঘণ্টা। আর তোমা বিহনে দশ ঘণ্টাকেই মনে হয় যেন দশ দশটা বছর।

ভি-র ফ্ল্যাটে শেষ সন্ধ্যা এক সঙ্গে কাটাচ্ছিলাম। তিনিই প্রশ্ন করেছিলেন, বেশ ইতস্তত করে সংকোচের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আবার ইয়োরোপ ছেড়ে যেতে কেমন লাগছে।

উত্তরে এই কথাগুলি শুধু বলেছিলাম। প্রেয়সীকে মনে মনে বারতা পাঠাচ্ছি।

ভি গম্ভীরভাবে এই উত্তরটা যাচিয়ে দেখলেন। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। পরে বললেন,—কিন্তু একথা ত তুমি পূব আর পশ্চিম দুটি পৃথিবীকেই বলছ।

—হ্যাঁ, দুটিকেই বলছি। কারণ, দু'জনকেই ভালবাসি দু'জনেরই মুখে দেখতে চাই হাসি। একজনের হাসির উৎসের সন্ধান আরেকজনকে দিতে চাই।

ভি-র ফ্ল্যাটের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রায় ঠিক নীচ দিয়েই একটা বাগানের ওপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে টেম্‌স্ নদী। তার আলো-ঝলমল বুকে সারা দুনিয়ার সম্পদের ছায়া।

ভি বললেন—তুমি গতবার এসেছিলে আমাদের দেশের সঙ্গে বিমান-চলাচল চুক্তি করবার জন্য তোমার দেশের প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে। এবার এসেছ সমুদ্রের তলা দিয়ে সারা পৃথিবীময়

টেলি-কমিউনিকেশন তারের লাইন বসাবার জন্য কনফারেন্সে ভারতীয় নেতা হয়ে। আকাশ আর পাতাল এই দুইয়ের মাঝখানে মাটির উপরেই কিন্তু তোমার পা পেতে রেখেছ।

উত্তর দিলাম—ঠিক সেইটুকুই আমার মনের কথা। ছাত্রজীবনে আকাশে উড়ত আমার মন। তাই ইয়োরোপের মনীষা আর সংস্কৃতির ছবি দেখাতে চেয়েছিলাম আমার বই 'ইয়োরোপা'তে। আজ মাটির উপর দাঁড়িয়ে ইয়োরোপের এই হাসি, আলো, সমৃদ্ধি আর জীবনী-শক্তির পরিচয় আমি নিয়ে যেতে চাই আমার দেশের জন্য। আমার পশ্চিমের জানলায় তাই এখন নতুন ছবি ফুটে উঠেছে। নতুন ভারতবর্ষের জন্য।

ভি বাধা দিলেন—কিন্তু ভেবে দেখ যে আমাদের এই সমৃদ্ধি শুধু সম্পদই নয়। অধ্যাত্মশক্তির অভাবে এই সম্পদই বিপদের কারণ হয়ে উঠছে। দেখছ না, কত গরম হাওয়া আর ঠাণ্ডা লড়াই চলছে সারা পশ্চিম জুড়ে।

প্রতিবাদ করলাম—কিন্তু এত জীবনের উচ্ছ্বাস, এমন কি ভোগ-বিলাসের মধ্যেও তোমরা যা পাচ্ছ, তা মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে কত সাহায্য করে তা ভেবে দেখ। ইংলণ্ডে প্রত্যেক হাজার জনের মধ্যে আটশো জন খবরের কাগজ পড়ে। প্রত্যেক রবিবার শতকরা তিরানব্বই জন লোক খবরের কাগজ পড়ে। এমনকি লুক্সেমবুর্গের মত গণ্ডগ্রাম দেশও কম যায় না। তোমাদের দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা আধজনও নয়। এদিকে অর্ধেকটা পৃথিবী অশিক্ষিত। স্বাধীন দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে সে-কথা ভুলব কি করে? সেই জন্যেই ত ইয়োরোপে এলে আমার মনে অশান্তি হয়।

ভি স্বীকার করলেন সে-কথা। বললেন—কিন্তু তোমাদের দেশ যে এরই মধ্যে কতখানি এগিয়ে গেছে তা আমরা সবাই জানি। সমস্ত পশ্চিম পৃথিবী আজ তোমাদের এগিয়ে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে

আছে। পেছিয়ে-থাকা দেশগুলির সঙ্গে বাকী পৃথিবীর সমন্বয়ের ভরসা ভারতবর্ষ।

ঠাট্টা নয়। ভি খুব গভীর ভাবে বলে চললেন—আরো বেশী তাড়াতাড়ি তোমরা বদলাতে পারতে। অন্তত অনেক অসহিষ্ণু লোক সে-কথা বলছে। কিন্তু তাতে দেশের শুধু চেহারা নয়, চরিত্রও বদলিয়ে যেত। দূর থেকে দেখে মনে হয় যে, তাতে তোমাদের লোকসানই বোধহয় বেশী হত। আজ ত তোমার দেশ শুধু ইণ্ডিয়া নয়। তার চেয়ে অনেক বড়, পুরানো সভ্যতার ভিত্তিতে নতুন দেশ।

অধীর হয়ে বাধা দিলাম—কিন্তু মন যে মানতে চায় না। মনে হয় যে এত শতাব্দী ধরে যারা ঘুমোচ্ছিল তারা এখন জেগে উঠেছে। কাজেই তাদের শুধু হাঁটলে চলবে না। দৌড়তে হবে, পাল্লা দিতে হবে ঝড়ের সঙ্গে। তুমি বুঝছ না ভাই, আমরা কেন এত অধীর। আজ ত আমি শুধু ছাত্র নই যে শুধু দেখে যাব, শিখে যাব। আজ আমি তুলে নিয়ে যেতে চাই এই সমৃদ্ধি, এই প্রাণশক্তি, এই আনন্দে-গড়া, ভোগে-ভরা জীবনকে ভারতবর্ষের জন্য।

ভি হাসলেন—ডক, ওই ঝড় কথাটাতেই তুমি নিজেকে দিয়েছ ধরা। জান ত, ঝড় ভাল নয় কোন দেশের পক্ষেই। যা ঝড়ের মত আসে তা ঝরা পাতার মত উড়ে যায়। আর যায় ঝড়ের মুখেই। দেখনি হিটলারের জার্মানীর অবস্থা?

দেখেছি। চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে পদ্মার বান ডেকেছিল জার্মানীর বুকে। সর্বনাশা সেই বান সারা পৃথিবী ভাসিয়ে নিতে চেয়েছিল। অনেক পাড় ভাঙল, ডুবে গেল অনেক আশা, অনেক অনেক স্বপ্ন। আর বছর দশেকের মধ্যেই সেই বানের জায়গায় পড়ে রইল শুধু ওলট-পালট হয়ে শেষ-হয়ে-যাওয়া বালির স্তূপ। প্রায় সমস্তটা জার্মানী সেই ভাঙা বালির স্তূপ হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ফলে।

দেখেছি। সেই বালুর চরে আবার গড়ে উঠছে নতুন প্রাসাদ,

নতুন স্বপ্ন। পায়ে হেঁটে হেঁটে দেখেছি। দেখেছি নতুন-গড়ে-ওঠা জার্মানীর সমগ্র ছবি। বার্লিনের সবচেয়ে অভিজাত পাড়ায় বোমায়-ভাঙা ঐতিহাসিক গীর্জার চূড়োটা মাথা নীচু করে রয়েছে। কিন্তু তার পাশে পাশেই মাথা উঁচু করে উঠেছে নতুন নতুন প্রাসাদ। তার পরিকল্পনা করবার জন্য জার্মানরা পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা আর্কিটেক্ট স্থপতিদের কাজে লাগিয়েছিল। যুদ্ধে বার্লিনের ধ্বংস হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। বুদ্ধিমান জার্মানরা সেজন্য বার্লিনেই এমন একখানা গৃহ প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করেছে যা পৃথিবীর সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে। প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাবে। সারা দুনিয়ার দর্শক যে যার দেশে যাবে ফিরে। এদিকে মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়ে যাবে। আর বিনা খরচার পাকা মুনফা হবে ওই সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে সাজানো নতুন বার্লিনের পাড়া।

—এখন আলোচনা করতে করতে মনে পড়ল জার্মানী-ভ্রমণের কথা। খুব উৎসাহ করে একজন জার্মান আমায় সব দেখাচ্ছিলেন। নতুন করে গড়ে-ওঠা নিজের দেশ বিদেশীকে দেখানতে মজা আছে। আছে গৌরববোধ। আর সেই বিদেশীও দেশ সম্বন্ধে, তার লোকদের সম্বন্ধে, কত ভাল ধারণা নিয়ে ফিরে যাবে।

তিনি বলছিলেন এই প্রাসাদটা বানাচ্ছেন আমেরিকার গ্রোপিয়াস, এইটে ব্রাজিলের নিমেয়ার। জানেন ত ল্যাটিন আমেবিকা কি রকম এগিয়ে গেছে এই স্থপতি শিল্পে। মেক্সিকোতে ওরা একখানা বিশ্ববিদ্যালয় শহর বানিয়েছে। তা হচ্ছে শহুরে শিল্পের সবচেয়ে চটকদার উদাহরণ। কোটিপতিদের পাড়াও অত সুন্দর আর সুবিধার হয় না। ভেনেজুয়েলার ইউনিভার্সিটি সিটি নাকি কারুকার্যের দিক দিয়ে তাকেও ছাপিয়ে যাবে।

শুনতে শুনতে কিছুতেই আমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভুলতে পারিনি।

আমায় অন্যমনস্ক দেখে জার্মান বলেছিলেন—কিন্তু স্যার, শুধু ডিজাইন আর চেহারা দেখে ভুলবেন না। ভেবে দেখুন, উপরের এই সৌন্দর্যের নীচে মজবুত ভিত গড়া হয়েছে কত ত্যাগ আর পরিশ্রমে।

জার্মান আবার শুনিয়েছিলেন—সুন্দরের সাধনার পিছনে আছে আমাদের সমস্ত জাতের প্রশ্নহীন পরিশ্রম। মালিক আর মজুর দু'পক্ষই খাটছে দেশের জন্য। তাই শুধু নিজের বা দলের জন্য দাবি-দাওয়া আমরা করতে পারি না।

ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কিন্তু এত ধ্বংসের পর আপনারা এত তাড়াতাড়ি গড়লেন কি করে?

উনি হেসে বলেছিলেন—সেটা আমাদের গোটা জাতের সাধনা। জানেন নিশ্চয়ই আমাদের অমর গান—ড্যয়টশল্যাণ্ড উবার অলেস—পিতৃভূমি সবার উপরে। তার জন্য কোন দুঃখ, কোন ত্যাগই খুব বেশী নয়। এই ধরুন, আমি পৃথিবীর মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বড় লোহার কারখানা ক্রুপসে সিনিয়ার ফোরম্যান। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন খুব জোরদার। কিন্তু আমরা কখনো স্ট্রাইক করিনি। ভাবতেও পারি না। অথচ আমাদেরও মাইনে বেড়ে যাচ্ছে।

তুলনায় নিজের দেশের কথা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই কথা পাল্টাতে চেয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম—আর এই প্রাসাদটা কার পরিকল্পনা?

—পৃথিবীর সেরা স্থপতি কর্বুসিয়ের।

খুব খুশী ভাব দেখিয়ে বলেছিলাম—কর্বুসিয়ে? হ্যাঁ, কর্বুসিয়েকে দিয়ে আমাদের দেশের একটা রাজধানী চণ্ডীগড় আমরাও পরিকল্পনা করিয়েছি। ক্রুপসকে দিয়ে তৈরি করাচ্ছি রুরকেলাতে বিরাট লোহার কারখানা।

চুপচাপ করে ভি এতক্ষণ আমার একনাগাড়ে কথা শুনছিলেন। এখন বললেন—তবে দেখ, তোমরাও পেছিয়ে নেই। ঠিক পথেই চলেছ।

সায় দিলাম—হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে চাই আরো বেশী গতিবেগ। আর তা যে কত চাই তা বুঝতে পারি পশ্চিমে এসে। ঠিক যেমন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন আমরা দেখতে শিখেছিলাম পশ্চিমে এসে। গত সাত আট বছরে ইয়োরোপে তোমরা কল-কারখানায় জিনিস তৈরির হার বাড়িয়ে নিয়েছ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। নরওয়েতে দশ বছরে ওরা নিজেদের তৈরি জাহাজে মাল বইছে দ্বিগুণ বেশী। ফ্রান্সে দেখলাম সবাই বলছে আক্রাগণ্ডার বাজার; কিন্তু লোকে ভর্তি সব হোটেল, বেড়াবার জায়গা, সিনেমা থিয়েটার। মোটে হাজার আশী লোক নাকি সেখানে বেকার হয়ে আছে। এমন কি যুদ্ধে-হেরে-যাওয়া গরীব ইটালীর কথা ভেবে দেখ। যারা হপ্তায় একদিন মাংস খেতে পেত তারা এখন রোজ মাংস খায়। জার্মানীতে মজুররাও এক সিলিণ্ডারের কিন্তু চারজন বসবার মত ক্লিনটস্ ওয়াগন মোটর কিনে সপরিবারে ছুটিতে ছুটিতে দেশে-বিদেশে সফরে বেরোচ্ছে। পশ্চিম জার্মানী থেকে বছরে পঞ্চাশ ষাট লাখ জার্মান পরিবার বিদেশে মোটর সফরে বেড়াতে যাচ্ছে। তোমাদের এই মাতাল-করা বসন্ত, মন ভোলান জীবনের মরশুমের ছবি আমি দু' হাতে তুলে আমাদের দেশে নিয়ে যেতে চাই।

ভি আরো কাছে সরে এলেন। আমার চোখে টেম্‌স্ নদীর জলের ওপরের আলোর প্রতিচ্ছবি এসে পড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে ভি খুব মরমী ভাবে শুধালেন—আরো অনেক কিছুই ত তুমি নিয়ে যেতে চাও।

—হ্যাঁ, তোমাদের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আমার দেশে তুলে নিয়ে যেতে চাই। শুধু লেখাপড়া নয়, ভাত-কাপড়েরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওদের যত এঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র আছে তার চেয়ে হাজার দুই বেশী চাকরি অক্সফোর্ডের সামনেই বসে অপেক্ষা করছে। আমাদের লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েট বেকারদের সম্বন্ধে সেদিন খোঁজ নিতে

গেলাম। ওরা আকাশ থেকে পড়ল। ওখানে অ্যাপএণ্টমেণ্ট বোর্ডের সন্ধানে চাকরি আছে তের হাজার, আর তার জন্য এক হাজার গ্র্যাজুয়েটও মজুত নেই। ইয়োরোপের অনেক জায়গার চেয়ে তোমাদের দেশে মাইনে কম, খরচও কম। তোমাদের চাকরি দেবার কর্তারা হিসাব করেছেন যে তবু এক জন ইংরেজ গ্র্যাজুয়েট সারা জীবন গড়পড়তা সাত লাখ টাকা মাইনে কামাবে। ভাবছি দেশে ফিরে গিয়ে এ কথা সবাইকে বলতে হবে। লোকের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বিপ্লব হয়ে যাবে।

—সে বিপ্লব ত খুব প্রবল ভাবে ঘটে যাচ্ছে তোমার দেশে। রক্তপাতের মধ্যে নয়, শান্তির পথে। তোমরা নিজেরাও হয়ত পুরোপুরি টের পাচ্ছ না।

—হ্যাঁ, তা জানি। আর পুরোপুরি টের পাচ্ছে না বলেই বোধহয় লোকে একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

—এদিকে আমিও যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি তা ভুললে চলবে না—পেছন থেকে হাসতে হাসতে ঘোষণা করলেন ভিনী।

লজ্জায় পড়লাম। সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। বন্ধুর সঙ্গে শেষ রাত্রিটিতে অনর্থক তর্কে মেতে রইলাম। বন্ধু-পত্নীর প্রতি এ হেন অবহেলা ক্ষমা করা যায় না।

তিনিও ক্ষমা করলেন না। বললেন—তোমাদের কফি ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। ডক, এবার তোমার পালা নতুন কফি বানাবার। এই হচ্ছে তোমার শাস্তি। আর ডার্লিং, তোমার সাজা হচ্ছে পেয়ালা-পিরিচ ধুয়ে আনা।

খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি এমন ভাব দেখিয়ে করজোড়ে বললাম,—শাস্তি ত মাথা পেতে নিচ্ছি মহারাণী—

মহারাজাদের দৌলতে মহারাণী কথাটার মানে পশ্চিমে খুব ভাল করেই জানা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য ভিনীকে এ হেন একটা নামে ডাকার ফল পেলাম হাতে হাতে। তিনি খুশী হয়ে আমার সাজাটা

নাকচ করে দিলেন—না, না ডক, আমার 'মুড' আবার ফিরে এসেছে। তোমার শাস্তি বদল হয়ে গেল। এই ইংলিশ আপেলটা তোমায় খেতে হবে।

ভি একটু জেলাসীর ভাব দেখালেন—হুঁঃ, আমি অবশ্য ওরকম নজরাণা দেবার ভাষা রপ্ত করতে পারিনি। মিডল টেম্পলে শুধু 'মি লর্ড'দের সমঝাতে শেখায়। 'মি লেডী'দের খুশী করাটা ডক শিখেছে অন্য কোন টেম্পলে।

ভিনীকে সালিশ মানলাম। বন্ধু নেহাৎ অন্যায়-মত আমার বাহাদুরিটা খেলো করে দেবার মতলবে আছেন।

কিন্তু ভিনী অভয় দিলেন—ওই রেকর্ডটা বাজিয়ে দাও, দেখবে তোমার বন্ধু একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে।

রেকর্ডটার নাম দেখলাম মিউজিক, মার্টিনিজ অ্যাণ্ড মেমরিজ: সঙ্গীত, সুরা আর স্মৃতি।

ঘরটা সুরেব মায়ায় ভরে গেল।

শেষ হতেই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলাম—বাঃ, এ যে একেবারে নতুন রকম আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল।

ভিনী হাসলেন—হ্যাঁ, আজকাল মুড মিউজিক খুব চলছে। অনেক আমেরিকান কোম্পানি যতরকম মেজাজ হতে পারে তার সঙ্গে তাল রেখে বাজনার রেকর্ড তৈরি করছে। ঘুম পাচ্ছে না ত এই রেকর্ডগুলো বাজাও। রাত জাগতে চাও ত ওইগুলো। খাবার, রান্না করবার, এমন কি বাসন মাজবার সময়কার মেজাজ পর্যন্ত রেকর্ডের ব্যবসাদাররা ভোলে নি।

খুব আশ্বস্ত হয়েছি এমন একটা ভাব দেখলাম—ভারি ভাল করেছ তুমি এ খবরটা জানিয়ে। এই ফ্ল্যাটটির কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য একটা মেজাজের বাজনার রেকর্ড আমি নিয়ে যাব। সঙ্গীত, স্মৃতি আর সুরা। সুরা নয়, জীবন-সার্থক-করা সুধা।

করতে চেয়েছিলাম ঠাট্টা। কিন্তু অন্তরের বেদনাটা বাইরে ধরা পড়ে গেল। ওরা ছু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

আমিও।

অনেক অনেকক্ষণ পরে ওরা আমায় বিদায় দেবার সময় বললেন—শুভরাত্রি বলব না, তার চেয়ে বলি সুপ্রভাত। তাহলে সারাদিন ধরে, সারা জীবন ধরে আবার দেখা হবার প্রত্যাশা থাকবে। আর সুপ্রভাত জানাচ্ছি দেবেশ, তোমাদের পুরানো দেশের নতুন অরুণোদয়কে।

পঁচিশ বছর ধরে কলেজে সহপাঠীদের দেওয়া ডাকনাম 'ডক' ওর মনের আন্তরিকতাকে যেন আজ পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারল না। তাই বিদায় মুহূর্তে 'ডকে'র বদলে ডাকল দেবেশ বলে।

সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। আবার সুপ্রভাত।

পর্দা সরিয়ে রেখেছি

অরুণোদয় হল এরোপ্লেনের পূর্বযাত্রার পথে। আমরা আকাশের খুব উপর দিয়ে যাচ্ছি না। তাই ইয়োরোপের গ্রাম শহর কারখানা অনেক কিছুই অনেক জায়গায় নজরে পড়ছে। নীচে চওড়া রাস্তা দিয়ে অগুণতি মোটর গাড়ি, ক্যারাভান, স্টেশন ওয়াগন চলেছে। আজ যে রবিবার। সবাই এই দিনটি পুরোপুরি উপভোগ করবে। ইয়োরোপে অনেক দেশেই শনি রবি দুদিনই ছুটি হচ্ছে। কিন্তু সপ্তাহের বাকী দিনগুলি বেশী খেটে সে ছুট পুষিয়ে দেয়। পিঁপড়ের সারির মত গাড়ি। পেছনে সামনে অন্য গাড়ির সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায় আর কি। পশ্চিম জার্মানী যুদ্ধে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে প্রায় অক্ষত আমার দেশের চেয়ে অনেক বেশী দারিদ্র্য আর হতাশা জার্মানীর আকাশে ঘন হয়ে নেমেছিল। কাজেই জার্মানীর কথা বলব। এই দশ-বারো বছরের মধ্যেই প্রায় লাখ পঁয়ত্রিশ পশ্চিম জার্মানীর লোক মোটর গাড়ি কিনেছে। তার মধ্যে শতকরা কুড়ি জন হচ্ছে দিনমজুর। প্রতি তিনটি জার্মাণ পরিবারের মধ্যে একটি নিজের ঘরবাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। বড় বড় পৃথিবীখ্যাত কোম্পানির শেয়ারের প্রায় তিনভাগের একভাগ নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিতে পেরেছে সে সব কোম্পানিরই মজুর কারিগররা। অথচ শিল্পপতিরাও যথেষ্ট লাভ করছে।

কাজেই এক পশ্চিম জার্মানী থেকেই যে বছরে পঞ্চাশ লাখ লোক বিদেশে বেড়াতে বেরিয়েছে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

এরোপ্লেনে বসে মনে মনে ওদের মুখের হাসি দেখছি। ভাবছি কি কি জিনিস ওদের সঙ্গে থাকবে। রুটি দিয়ে সহজে বানানো

স্যাণ্ডুইচ থাকবে নিশ্চয়ই। আর ফল মাংস। দোকান থেকে কেনা স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের টুকরি। ভেজালের ভয় নেই। ফ্লাস্কে থাকবে কফি, বোতলে হাল্কা মদ। হয়ত থাকবে তাঁবু পেতে বিজন বনে ক্ষণকাল বসে থাকবার সাজ-সরঞ্জাম। মোটরেই লাগানো আছে ছোট্ট একটি রেডিও। অথবা পকেটে ক্যামেরার চেয়ে ছোট ট্রান্সিস্টর রেডিও।

নাচে গানে হাসিতে আলোতে ভরে উঠবে ছুটির দিন। ঠিক যেমন করে কাজে আর দায়িত্বে বাকী সপ্তাহটা ভরে ছিল।

দূরবীন লাগিয়ে মানুষ চিনবার চেষ্টা করছি। আগে হলে পোশাক দেখেই কোন্ দেশের লোক তা চিনতে পারতাম। অস্ট্রিয়ান লোকের মাথায় থাকত আল্পসের পাহাড়ী টুপি। ইংরেজ বুকে চড়াত টুইডের ডবল ব্রেস্ট ভেস্ট। আর ফরাসী ফিটফাট কালো স্যুটে সাজত। আজ কিন্তু সবাই প্রায় এক ধাঁচের পোশাক পরছে। একই ধরনে চলছে। একই ধারণায় ভাবছে। দুনিয়া এসেছে ছোট হয়ে। মানুষ এসেছে কাছাকাছি। মনে মনে হচ্ছে মাখামাখি।

এই ত মাস দুই আগে এমনি একটা মাখামাখির সাগর-সঙ্গমে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। আবার সেই ইয়ুথ হোস্টেল। সেই আপনা-ঝরানো পুরোনো প্রেম। সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্নের হোটেল বেলভিউ প্যালেসের মার্বেলে-মোড়া প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এসে মাইল বিশেক দূরের একটা ইয়ুথ হোস্টেলে নিজেকে ফিরে পেলাম। সঙ্গে রইল শুধু সেই সঙ্ঘের ব্যাজের পরিচয়, আর একটি হারিয়ে-যাওয়া কিন্তু ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়ে-পাওয়া প্রাণ।

গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো টুলে বসে আমরা অচেনা অজানারা খুব আপনার জন হয়ে এসেছি। গাইছি সমস্বরে 'পেতি ফ্ল্যুর' অর্থাৎ ছোট্ট ফুলটি : এ বছরের সবচেয়ে চালু গান। গানটা রচনা করেছিল মার্কিন দেশের একজন, রেকর্ড করেছিল ইংরেজ ব্যাণ্ড পার্টি, কাটতি

হল সবচেয়ে বেশী জার্মানীতে। আর গাইছি আমরা সবাই সব দেশের সব বয়সীরা মিলে।

এই উইক-এণ্ড টুকুর পরে যে যার কাজে, পরিবারে বা কলেজে ফিরে যাবে। কিন্তু আজ রাতের মায়ায় সে সব পিছুটান মিলিয়ে গেছে। এক কোণায় বসে দু'জন তরুণ তাদের সুইডেনে ঘটিত প্রেমকাহিনী স্মরণ করতে করতে উপছিয়ে উঠছে। আরেক কোণায় কয়েকজন মিলে স্পেনে বিকিনি অর্থাৎ প্রায় অনাবরণ পোশাক পরে বিস্ট্রো অর্থাৎ সস্তা সরাইয়ে কেমন করে ছুটি কাটিয়েছিল তার বর্ণনায় মশগুল। আমার পাশে বসে একজন ডেনমার্কের লোক ফিস ফিস করে বললেন—আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি কি সত্যিই শুধু ডেনমার্কের লোক অর্থাৎ দিনেমার, না আর কিছু ?

হেসে উত্তর দিলাম—আপনি মানুষ ; শুধু ডেনমার্কের বাসিন্দা এই যা।

একটি জার্মান তরুণ কথায় যোগ দিল। বলল—আমার বাবা-মা আমায় ডাকেন 'আমাদের আমেরিকান খোকা' বলে। কিন্তু আমার দোষ কি বলুন ত ? ইয়োরোপের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা গোটা মহাদেশটাকেই খেলার মাঠ, চরে বেড়াবার জায়গা হিসাবে পাচ্ছি। ঠিক আমেরিকানদের মত। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত পরীক্ষায় পার হবার পরে।

জেনিভা ইউনিভার্সিটির একটি ছাত্রী যোগ দিল—আমার ইউনি-ভার্সিটিতে অর্ধেকের বেশী ছাত্রছাত্রী ভিন্‌দেশী। কিন্তু কই, কাউকে ত বিদেশী মনে হয় নি। আমাদের চলা-ফেরায় জীবনে এমন কিছু তফাৎ ত দেখি না। চট করে আবিষ্কার করে ফেলি, যে, যে-দেশ থেকেই আসে না কেন একই ড্রিংক, একই ড্যান্স, একই খেলাধুলো আমাদের পছন্দ। সহজেই হয়ে যায় মনের মিল।

বলেই মেয়েটি আমায় সালিশ মেনে বসল। বলল—আপনিই

বলুন, এত হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসেছেন। তবু একই বেশভূষা, একই ভাষা আর ভাব আপনার মধ্যে দেখছি। আপনার মধ্যেও পাচ্ছি ইয়োরোপীয়ান পার্সোনালিটি।

মৃদু হেসে বললাম,—হয়ত আপনারা তা পাচ্ছেন। তবু ভেতরের কাঠামো আমার নিজের দেশের। আপনাদের সবারই সেরকম। স্বদেশ আজকাল স্বজাতির চেয়ে আলাদা বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি কিনা আপনারা প্রত্যেকেই ভেবে দেখুন।

নাঃ। বড্ড ভারী হয়ে যাচ্ছে এই মধুর সন্ধ্যাটা। এই সোনালী-রোদে-পোড়া তরুণ আর সোনালী-স্বপ্নে-বিভোর তরুণীদের মধ্যে এত ভারী কথা এনে ফেললে অন্যায় হবে। হাসিতে, বাঁশিতে মধুর ভাষেতে ভরে থাক ওদের মন, ওদের জীবন। আর আমি যেন তাতে একটু সুর ধরিয়ে যেতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ফরাসী তরুণকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি নিশ্চয়ই ফ্রান্সের গভর্নমেণ্টের সমালোচনা সহ্য করতে রাজী আছেন; কিন্তু ফরাসী ওয়াইনের নিন্দা সইবেন না।

তরুণ খুশী হয়ে ফরাসী লাল ওয়াইনের জয়ধ্বনি তুলল।

একটি হিস্পানী তরুণকে পাকড়াও করলাম। শুধোলাম—আপনি ত বেশ সবার সঙ্গে রসিয়ে জমিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আপনার স্বদেশে এখনো মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় বাধো বাধো ভাব আছে। তার খোলাখুলি নিন্দা নিশ্চয়ই প্রাণে সইবে না।

হো হো করে সবাই হেসে উঠল। একটা অনেক পুরোনো গানের কলি গেয়ে উঠল কয়েক জনে মিলে—

> "মধুর মুচাচা, ওগো হিস্পানী বালা,
> দেবে না দেখা কি আর?
> তোমা বিনে সব কিছু লাগে যে নিরালা।"

মুচাচা অর্থাৎ কিশোরী।

সবার মনে আবার রঙ ধরে গেল। আমিও খুশি হয়ে ওদের গানের তালে তালে মাথা দোলাতে লাগলাম।

গানে শেষে হিস্পানী তরুণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটি প্রায় নামিয়ে এনে নমস্কার করল। বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন, ভারতীয় বন্ধু। আমার ইয়োরোপীয় হৃদয়ের গীর্জায় স্পেনের জন্য একটি মোমবাতি সদাই জ্বালিয়ে রেখেছি।

জার্মান তরুণ কিন্তু সে কথাতে শেষ পর্যন্ত সায় দিল না। সে বলল—কিন্তু তোমার সেই গীর্জায় আরো অনেক মোমবাতিই জ্বালান দেখছি আমরা। সেই বাতির আলোতে পড়লাম যে তোমার হৃদয়ে লেখা আছে যে সংসারে নারীকে দিতে হবে ভালবাসা; ভাল সুরাতে পেতে হবে জীবনের সুর। আর ভাল বাসাতে কাটাতে হবে সারা জীবন। মোট কথা বাঁচতে হবে। বাঁচার চেয়ে বড় কথা আর নেই সংসারে।

সত্যি, সেই শাশ্বত কথাটুকু আজ আকাশে উড়তে উড়তে ধরণীতে চরে বেড়ান মানুষকে দেখে বার বার মনে হচ্ছে। বাঁচতে হবে। আমার দেশের লোককেও আনন্দে, স্বাচ্ছন্দ্যে এমনি করে বাঁচতে হবে। পশ্চিমের জানলায় সেই বাঁচার ছবি দেখে সে নিজেকে আবিষ্কার করুক।

এরোপ্লেনে বসে চুপচাপ ভাবতে লাগলাম।

এরই মধ্যে এয়ার হোস্টেস দিয়ে গেল একটা কণ্টিনেণ্টাল ছবিতে-ভরা পত্রিকা। একটা ছবি নজরে পড়ল। চমকিয়ে উঠলাম। যেন সেই ফরাসী গায়িকা জুলিয়েট গ্রোকোর একেবারে হুবহু প্রতিচ্ছবি এই জাপানী গায়িকা। মিচিকোর একটা রেকর্ড ব্যানানা বোট সং

কলার নৌকার গান নাকি এক লাখ বিক্রী হয়ে গেছে অল্প সময়ের মধ্যে। সে যখন গান করে, মুগ্ধ ভক্তরা আত্মহারা হয়ে সীট ছেড়ে উঠে পড়ে। খুশী হয়ে চিৎকার করে ঘর ফাটিয়ে দেয়। জাপানের ইনটেলেকচ্যুয়ালরা নাকি ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তিন চার জন জাপানী সহযাত্রী চলেছেন। আমার হাতে একজন জাপানী শিল্পীর ছবি খোলা দেখে ওঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এলেন। ওঁরা সবাই মিচিকোর গান শুনেছেন। কোমর পর্যন্ত নেমে-আসা কালো চুল, আলোয় ভরা বিড়াল চোখ আর ধরা-ছোঁয়ার হিসাবের বাইরে চতুর হাসি দেখে ওঁরাও মুগ্ধ হয়েছেন।

তবু জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু আপনারা কি মনে করেন না যে এর হাবভাব শিল্পকলা সবই পশ্চিমের কণ্টিনেণ্টাল ছাঁচে ঢালা। এমন কি তার অনুকরণে তৈরি।

একজন জাপানী একটু গরম হয়ে উঠলেন—জানি যে সবাই বলে এশিয়ার মধ্যে আমরাই নাকি পশ্চিমকে সব চেয়ে বেশী নকল করেছি। কিন্তু আমি সে কথা মানি না। আমরা যা নিই, তা আপন করে নিই। নিজেদের দরকার মত, আর নিজেদের ছাঁচে ঢেলে।

মাথা নাড়লাম নীরবে। অর্থাৎ যা খুশী মানে ধরে নাও। তাতে উৎসাহ পেয়ে আরেকজন জাপানী বললেন—মিচিকোর গানের মধ্যে একটা অনাদি আদিম ভাব আছে। আজকের দিনের জীবনের জটিলতা থেকে সব মানুষই রেহাই পেতে চায়। কিবা পূবে, কিবা পশ্চিমে। আমাদের রসিকেরা যে ওই আদিম ভাবের মধ্যে নিষ্কৃতি পাচ্ছে তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা নিজেদের পথেই তা খুঁজে পেয়েছি।

আরো একজন জাপানী বললেন—সেই আদিম ভাবটাও কিন্তু মেজে ঘষে 'রিফাইন' করে নেওয়া হয়েছে। মিচিকো তার শিল্পে সমাজের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহকে রূপ দিয়েছে।

এতক্ষণে আমার মন্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেলাম—তার মানে আপনাদের সমাজে এই নারী-বিদ্রোহকে আপনারা মেনে নিয়েছেন। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে পুরুষদের মনে?

ওঁদের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি ঘাড় ঝাঁকানি দিলেন—উঁহু, তা আমি অতটা স্বীকার করতে পারি না। আমাদের পুরুষরা এখনো নরম-সরম নারীই পছন্দ করে। পোষ-না-মানা সিংহীকে আমরা বড় ডরাই।

কাব্য করে আরেকজন বললেন—সূর্য ওঠার দেশ কিনা আমাদের। কাঠের বাড়িঘরে অগ্নিশিখাকে ভয় করা স্বাভাবিক।

সব বুঝলাম। অতটা রূপকের প্রয়োজন ছিল না।

তবু ত পূব দেশে আমরা বদলাচ্ছি। চেহারা আর চরিত্র দুইয়েতেই। উনিশ শতকে তুর্কি দেশকে ইয়োরোপে প্রাচ্যের জরাগ্রস্ত বুড়ো বলা হত। সে দেশ আজ দুয়েতেই পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। যে সব মধ্যপ্রাচ্য দেশে বিরাট বিপ্লব হয়নি, সেখানেও পরিবর্তনের অন্ত নেই। প্রাচীন বাইবেলের দেশে ঢুকতে হয় লেবাননের পথে। তার রাজধানী বেরুট বাইবেল থেকে দূরে সরে এসে মার্কিন মুলুক সেজে বসেছে।

এই পর্যন্ত ভেবে নিজের মনে মাথা নাড়লাম। সত্যিই কি বেরুট মার্কিন শহর হয়ে গেছে? না, সারা দেহটাকে অযত্নে অবহেলায় রেখে শুধু মুখটুকুকে ম্যাক্স ফ্যাক্টরের মেক-আপ দিয়ে সাজিয়েছে?

একজন মিশরী যুবক আমার কাছেই বসে ছিল। প্যারিস থেকে কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরছে। সে আমায় জোর গলায় বলল—মানুষ ত সবার আগে মুখখানাকেই সাজায়। তারপর ক্রমে ক্রমে

দেহের অন্যান্য অংশগুলি। কাজেই মধ্যপ্রাচ্য আধুনিকতা শুরু করছে মুখের প্রসাধন দিয়ে। আপনি কি সেটা অন্যায় বা অস্বাভাবিক মনে করেন ?

উত্তর দিলাম—অস্বাভাবিক নিশ্চয়ই নয়। অন্যায় কি না তা নির্ভর করছে বাকী দেহের অবস্থার উপর।

তরুণ মিশরী নিজের দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটতে দেখছে। সে একটু গরম হয়ে উঠল—শুধু মুখের প্রসাধন নয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহেই পরিবর্তন করা হচ্ছে। অথচ পুরোনোর মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবার মত, মনে রাখবার যা কিছু তাকেও সযত্নে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এই দেখুন না! বেরুটে রয়েছে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর; তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিক হোটেল, খেলাধুলো, স্কী-খেলা আর সাগরস্নান। কিন্তু বাইবেলের আর সলোমনের স্মৃতিতে জড়ানো জায়গাগুলোও সমান আদরে দেখা-শোনা করা হয়। আমরা ওগুলিও ঠিক করে বাঁচিয়ে রেখেছি।

শান্তভাবে বললাম—বাঁচিয়ে রাখুন। তার সঙ্গে কিন্তু বাঁধা পড়বেন না যেন। আমার ভয় যে যদি আমরা তাল সামলাতে না পারি তাহলে কি হবে

—কেন পারব না ?

—নিশ্চয়ই পারব, এ আশা আমার আছে। তবুও যখন দেখি যে আকাশ-ছোঁয়া আমেরিকান ধাঁচের হোটেলের ছায়াতেই টাঙানো রয়েছে ছেঁড়া আরবী তাঁবু, তখন মনে একটা ধাক্কা লাগে বৈকি। ফরাসী ঢঙের ইউনিফর্ম পরা পুলিশ রাস্তায় যাতায়াতের ভীড় সামলাচ্ছে। কিন্তু সে ভীড়ে পাশাপাশি চলেছে হালের মোটরকার আর চুলোহীন গাধার গাড়ি। টুকটুকে রাঙা মার্কিন কোকাকোলা ফেরি করছে লম্বা ছেঁড়া ঝোলা-পরা এমন সব লোক, যাদের হাত থেকে কিছুই খাওয়া ঠিক নয়।

দিয়েছে। এবং এই সাম্যের পিছনে ছিল না কোন মারামারি বা মতভেদ। ওরা নীরবে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে চলেছে আর সেই সম্পদ দেশের সবার মধ্যে দিয়েছে ছড়িয়ে। কাউকে নামিয়ে না এনে, সবাইকে সমৃদ্ধ করে টেনে উপরে তুললে তবেই সুখ হবে, সাম্য হবে। ঐশ্বর্য সৃষ্টি করার আগে সবার মধ্যে সমান ভাবে শুধু দারিদ্র্যটুকুই বিতরণ করবার কথা ওঠেই নি ওসব দেশে। সেখানে "স্লাম" নামে নাগরিক নরক নেই। নেই ভিক্ষা বা অসহায়তা। সবার সঙ্গে সুখ সুবিধা ভাগ করে নিলেই যে সবাই আসলে সুখী হবে, মানবিকতার এই সহজ তথ্যটুকু ওরা বুঝেছে মর্মে মর্মে।

আমরা এখনো সমৃদ্ধি তৈরি করার পথে বেশী এগোতে পারিনি। তবু ত এগিয়েই যাচ্ছি। সারা পৃথিবীর সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে এগোতে চাই। দশ বছর আগে আমেরিকায় জেট প্লেন শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে উড়ে গিয়েছে। আমরা কি করে প্রাণ ধরে এখনো কাদা-ভরা ভাঙা হাটুরে বাট ভেঙে চলব গরুর গাড়িতে? না। কখনো না। পশ্চিমের জীবনের সুর আমার মনে জাগিয়েছে সঙ্গীত; তারি স্মৃতি আমায় দিচ্ছে গতি, দিচ্ছে আশা।

অন্য দেশের তৈরি এরোপ্লেনে বিহার করছি। মেঘ ফুঁড়ে বাজ আর বিদ্যুতের আওতা এড়িয়ে শূন্যে এগিয়ে চলেছি। একেবারে নিশ্চিন্ত নিস্পন্দ আরামে। এমন গতিতে প্লেন যাবে যে বিজ্ঞানের হিসাব অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি নিশ্বাস তার আধ মাইল পিছনে পড়ে থাকবে। নীচে মাটির পৃথিবী থাকবে একখানা কার্পেটের মত অলস ভাবে বিছানো। প্লেনের বাইরে শূন্য ডিগ্রির চেয়েও পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচের ঠাণ্ডা থাকবে। তবু ভিতরে পাব ফাল্গুনের আমেজী পরশ। আকাশের চন্দ্র সূর্য তারাদলের সঙ্গে তাদের মৌন মহিমার অংশীদার হয়ে যাব।

বিজ্ঞানের অভিযানের নেই শেষ। এগিয়ে যাওয়ারও নেই অন্ত।